কেউ ভোলে না কেউ ভোলে

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৩৬৭
আগস্ট, ১৯৬০

শোভাকে

প্রকাশক :
জে. এন. সিংহ রায়
নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ
২২, ক্যানিং স্ট্রীট
কলিকাতা-১
প্রচ্ছদপট :
অজিত গুপ্ত
মুদ্রক :
রণজিৎ কুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩, লোয়ার সারকুলার রোড
কলিকাতা-১৪

সাড়ে চার টাকা

উৎসর্গ

আমার সৌভাগ্য, আমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পেয়েছিলাম এমন একটি মানুষকে—ঠিক যেরকম মানুষ সচরাচর চোখে পড়ে না। কবি নজরুল ইসলাম সেই বিরলসংখ্যক মানুষের মধ্যে একজন। অনেকের চেয়ে স্বতন্ত্র। অজস্র প্রাণপ্রাচুর্য, অবিশ্রান্ত রকম হৃদয়ের উদারতা, বিদ্বেষ কালিমামুক্ত, অপাপবিদ্ধ একটি পবিত্র মন, আর নিরাসক্ত সন্ন্যাসীর মত একটি আপনভোলা প্রকৃতি। আমার সৌভাগ্য, আমিই তার একমাত্র বন্ধু যার কাছে তার জীবনের গোপনতম কথাটি পর্যন্ত সে অকপটে প্রকাশ করেছে।

আমার দুর্ভাগ্য, আমার সেই পরমতম বন্ধুর জীবনের মধ্যাহ্নবেলায় ভাগ্যের নিষ্ঠুর একটি মসীকৃষ্ণ যবনিকা নেমে এলো তার মানসলোকে।

আমার এ দুর্ভাগ্যের দুঃখ কেউ যদি বোঝে তো বুঝবে মাত্র একজন—যার দুঃখ-দুর্ভাগ্যের কোনও সীমা-পরিসীমা নেই।

সেই পরম সৌভাগ্যবতী এবং চরম অভাগিনী

কবি-প্রিয়া শ্রীমতী প্রমীলার

হাতে এই বইখানি তুলে দিলাম

প্রথম কথা—

এই লেখাটি যখন 'দেশে' প্রকাশিত হচ্ছিল, নিয়মিত বেরুচ্ছে না বলে অনেকে অনেক অনুযোগ করেছেন। আর আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান সাগরময় (দেশ-সম্পাদক) করেছে সশ্রদ্ধ তিরস্কার

লেখাটি অনেকের ভাল লেগেছে। অনেকের কাছ থেকে অনেক চিঠিও পেয়েছি। 'দেশ'-আপিস থেকে অনেক চিঠি আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার বাড়ির ঠিকানায় এসেছে খান-তিরিশেক। এত চিঠি, এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা—গত পাঁচ বছরের ভেতর অন্য কোনও লেখার জন্য আমি পাইনি। তাঁদের প্রত্যেককে জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আজ তাঁদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নজরুলের একখানি ডকুমেণ্টারী ছবি করতে চেয়েছিলেন। তারই জন্য সর্বপ্রথম এটি লিখতে শুরু করেছিলাম। তাই এর আরম্ভটা যেন কেমন-কেমন। দু'চার পাতা লিখেই আর লিখতে ইচ্ছে করেনি। যাকে নিয়ে ছবি করবো, সে কোথায়? তার এখনকার এই অসহায় রূপটি লোকের চোখের সামনে টেনে বের করতে মন চায়নি। তাই সে ছবি আমি করিনি।

ছবি করার চেয়ে লেখা ভাল। তাই যখন মন চেয়েছে, একটু একটু করে লিখে গেছি।

ভেবেছিলাম, নিজের কথা কিছু লিখব না। নিজে থাকবো অন্তরালে। কিন্তু তা সম্ভব হলো না। নিজের কথা কিছু কিছু লিখতে হলো।

অনেকের সত্যিকারের নাম গোপন করে আমি অন্য নাম দিয়েছি। এখন ভাবছি না দিলেই যেন ভাল হতো।

বলা এখনও আমার শেষ হলো না। আরও অনেককিছু আছে বলবার। প্রকাশকের অনুরোধে প্রথম পর্ব এইখানেই শেষ করলাম। দ্বিতীয় পর্ব লিখবার ইচ্ছা রইলো।

ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
টালা পার্ক, কলিকাতা-২
শ্রাবণ, ১৩৬৭

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কেউ ভোলে
না
কেউ ভোলে

KEU BHOLEY NA KEU BHOLEY

by

Sailajananda Mukhopadhyaya

Price Rs. 4·50 nP. only

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায়—অণ্ডাল থেকে গৌরাণ্ডি পর্যন্ত যে ব্রাঞ্চ রেললাইনটি চলে গেছে, তারই শেষ প্রান্তে ছোট্ট একটি স্টেশন—চুরুলিয়া।

উত্তরে অজয় নদের সুবিস্তীর্ণ বালু-বিস্তার। কাশগুচ্ছসমাচ্ছন্ন সৈকতভূমি। অদূরে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসকালে পঞ্চপাণ্ডবনির্মিত পাণ্ডবেশ্বর মহাদেবের পাঁচটি মন্দির।

পরপারে—বীরভূম। কবি জয়দেবের লীলাভূমি সুপবিত্র কেন্দুবিল্ব। গীত-গোবিন্দ রচয়িতা সাধক-কবি জয়দেব।

দক্ষিণে কয়লাখনি আর লৌহ-ইস্পাতের কল-কারখানা-সমাস্তীর্ণ জনবহুল সুবিস্তৃত শিল্পাঞ্চল রাণীগঞ্জ আর আসানসোল।

পশ্চিমে স্বাধীন ভারতের অন্যতম কীর্তি দুর্দান্ত দামোদরের দুরন্ত বন্যা-প্রতিরোধ 'মাইথন'। সুবিস্তীর্ণ জলাধার আর জল বিদ্যুৎকেন্দ্র। অদূরে সুপ্রাচীন কল্যাণেশ্বরী-মন্দির। 'মায়ের স্থান' অপভ্রংশে 'মায়ের থান্' তাই থেকে হয়েছে 'মাইথন্।'

পূর্বে পলাশরাঙা প্রান্তরের পাশে শাল-তাল-তমাল আর হরীতকীর বন।

এরই মাঝখানে ছোট একটি গ্রাম চুরুলিয়া।

গ্রামের পশ্চিমে দরিদ্র কয়েক ঘর চাষী মুসলমানের বাস।

রাজা নরোত্তম সিংহের গড় আর পীরপুকুরের পাশে ওই যে মাটির প্রাচীর-ঘেরা ঘরখানি দেখা যাচ্ছে ওই ঘরেই—

বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাংলার গৌরব, অপরূপ সুরস্রষ্টা অভিনব গীতিকার জনগণ-চিত্তরঞ্জন বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলাম।

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে

নিরানন্দ পরিম্লান দরিদ্রের সংসার। কিন্তু জন্মলগ্নে বিধাতা যার ললাটে এঁকেছেন কবিত্বের জয়টিকা, মন তার ছুটে চলে—ছন্দোবদ্ধ সুরলোকে—আনন্দের সন্ধানে।

তাই যেখানে গান, যেখানে সুর, কবি, যাত্রা, লটো, ঝুমুর—বালক নজরুল ঘুরে বেড়ায় সেইখানে। গান গায়, বাজনা বাজায়, গীত রচনা করে।

কিন্তু চির-চঞ্চল শিল্পীমন কোথাও স্থির থাকতে পারে না। অশান্ত চঞ্চল মন তার ছুটে বেড়ায় যেখানে-সেখানে।

কখনও রুটির দোকানে খানসামা

কখনও গার্ড-সাহেবের বাবুর্চি

কখনও মক্তবের শিক্ষক!

সবাই বলে, আহা, ছেলেটা ভাল, লেখাপড়া শিখলে মানুষ হতে পারে।

তাই সে মানুষ হতে গিয়েছিল একবার ময়মনসিংহে, একবার মাথরুণে, শেষে বাড়ির কাছে শিয়াড়শোলে।

ব্যবস্থা হলো, শিয়াড়শোল রাজার ইস্কুলে মাইনে লাগবে না, সেইখানেই পড়বে। থাকবে রায়-সাহেবের ফুল-বাগানের পাশে মাটির একটি ছোট্ট ঘরে। খড় দিয়ে ছাওয়া এই ছোট্ট ঘরখানির নাম—'মহমডেন্-বোর্ডিং'। পাঁচটি মুসলমানের ছেলে বাস করে এখানে।

সেই পাঁচটি ছেলের ভেতর একটি হলো—দুখু মিঞা। ভাল নাম—কাজি নজরুল ইসলাম।

একদিকের একটি জানলার পাশে ছোট একটি খাটিয়া। খাটিয়ার ওপর পরিষ্কার একটি বিছানা পাতা। বিছানার ওপর ছোট ছোট দুটি বালিশ আর বই-খাতার ছড়াছড়ি। দেখলেই চেনা যায়—অগোছালো কোন্ এক ছন্নছাড়া ছেলের আস্তানা।

এই ঘরের ভিতর ছিল আরও তিনটি দড়ির খাটিয়া। সেই তিনটি খাটিয়ায় থাকতো আরও চারজন ছাত্র। কি তারা পড়তো, কোথায় তাদের বাড়ি কিছুই জানি না। তবে তাদের মধ্যে একজনের কথা আমার আজও মনে আছে। তার ভাল নাম আমার জানা নেই। ডাক-নাম ছিল ছিনু। স্বাস্থ্যবান সুন্দর

ছেলে। প্রথম যেদিন তাকে দেখলাম—দেখলাম, ঝাঁটা হাতে নিয়ে ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। সে আজ কতদিনের কথা, তবু আজও মনে আছে, তার কথা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়তাম আমরা। সামান্য কথা কিন্তু বলবার ভঙ্গী তার এমনিই যে, না হেসে কেউ থাকতে পারতো না।

তার কথাগুলো এখন আর আমার মনে নেই। থাকবার কথাও নয়।

তবে এইটুকু শুধু মনে আছে—নজরুলকে সে খুব ভালবাসতো।

নজরুলের বিছানার চাদর কাচতো, জামায় কাপড়ে সাবান দিয়ে দিতো।

ইস্কুলের ছুটির পর বইখাতা বাড়িতে রেখে কিছু খেয়েই ছুটতাম ওদের বোর্ডিং-হাউসে। আমাকে দেখবামাত্র খেজুর পাতার একটা চাটাই নিয়ে ছিনু ছুটে আসতো। বলতো, দাঁড়াও, এইটে আগে পেতে দিই।

এই বলে খাটিয়ার ওপর থেকে বই-টই সরিয়ে সেই চাটাইটা বিছিয়ে দিয়ে বলতো, নাও এইবার শোও, বোসো, যা খুশি তাই কর।

বিছানার চাদরটা ময়লা হলে তাকেই কাচতে হবে—তাই তার এই সতর্কতা।

কিন্তু বিছানার চাদর বা কাপড় জামা কাচতে তাকে আমি কোনদিনই দেখিনি, নজরুলই আমাকে সেকথা বলেছিল। বলেছিল—পাছে আমি কিছু মনে করি এই ভেবে।

ছিনু কিন্তু স্পষ্ট পরিষ্কার বলে বসলো—বিছানার ওপর তোমরা মই-মাড়ন্ কর আর আমি তোমার চাদর কেচে মরি।

নজরুল হো হো করে হাসতো। সেই পবিত্র নির্মল হাসি! নিতান্ত সহজ সরল শিশুর মত নিষ্কলঙ্ক অন্তঃকরণের বহিঃ-প্রকাশ।

বিস্কুটওলা এসে দাঁড়াতো জানলার পাশে। মিশমিশে কালো গায়ের রং, গলায় শুভ্র যজ্ঞোপবীত। বাঁশের চুপড়িতে নানা-রকমের বিস্কুট পাঁউরুটি—ময়লা একটা ন্যাকড়া দিয়ে ঢাকা।

ছিনু বলতো, কি হে তুমি বামুন তো?

বিস্কুটওলা বলতো, হাঁ বাবু, আমার বাঁকুড়া জেলায় বাড়ি।

ছিনু বলতো, দেখো মিছে কথা বলে আমাদের জাত মেরে দিও না। দাও। ওই বাবুদের দাও, আমি চা আনি ততক্ষণ।

নজরুলের টাকা-পয়সা থাকতো তার বিছানার তলায়। টাকা-পয়সা বলতে শিয়াড়শোল রাজবাড়ি থেকে পাওয়া মাসিক সাতটি টাকা। ইস্কুলে বেতন দিতে হতো না, বোর্ডিং-এর খরচ দিতে হতো না, সাতটি টাকা পেতো সে নিজের খরচের জন্যে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ! বিছানার তলাতেই থাকতো, সেইখান থেকেই খরচ হতে হতে একদিন শেষ হয়ে যেতো। সাত টাকার বেশির ভাগ নিতো এই বিস্কুটওলা। তারপর চলতো ধার। সে ধার শোধ করতাম হয় আমি, নয় আমাদের আর-এক সহপাঠী বন্ধু শৈলেন ঘোষ। সে ছিল ক্রিশ্চান। সে দিত। একবার একটা ভারি মজা হয়েছিল। মাসের প্রথমেই রাজবাড়ি থেকে সাতটি টাকা নজরুল নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছে। বোর্ডিং-এ এসে দেখে, তার ছোট ভাই আলি হোসেন এসেছে গ্রাম থেকে। সচ্ছল সংসার নয়। দারিদ্র্যের জ্বালা লেগেই আছে। দুঃখ কষ্টের কথা পাছে বেশি শুনতে হয় তাই তাড়াতাড়ি সাতটি টাকাই আলি হোসেনের হাতে দিয়ে নজরুল তাকে বিদেয় করে দিয়েছে।

গিয়ে দেখি, ছিনু গজ গজ করছে আর নজরুল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

যাবামাত্র নজরুল বললে, চল বেড়িয়ে আসি।

আমি আর বসলাম না। বললাম, চল।

ছিনু বললে, জানো মিঞা-সাহেব, দুখু মিঞার ছোট ভাইটার বিড়ি-সিগ্রেটের খরচই মাসে সাত টাকা।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারিনি। ছিনু বুঝিয়ে দিলে।

বললে, ওই সাতটা টাকা ওর মায়ের হাতে দেবে কিনা ওর ভাইটা! বিড়ি-সিগ্রেট খেয়েই ফুঁকে দেবে।

নজরুল বললে, বিড়ি-সিগ্রেট ও খায় না।

ছিনু বললে, খায় না—খাবে।

নজরুল বললে, আর তুই যে হুঁকো টানিস !

ইস্কুলের ছেলে—হুঁকো টানে ! তাজ্জব ব্যাপার !

ছিন্নুকে জিজ্ঞাসা করলাম, সত্যি ?

কথাটা বলতে ছিন্নুর ভারি লজ্জা !

না মিঞা-সাহেব, মিছে কথা। আমি চা আনছি। বোস্। বলে সে পালিয়ে গেল।

নজরুলও যেন বাঁচলো সেই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ থেকে রেহাই পেয়ে।

মিঞা-সাহেব !

পেছন ফিরে তাকাতেই দেখি, বিস্কুটওলা এসে দাঁড়িয়েছে। বললে, ঝালরুটি এনেছি।

লঙ্কা নুন আর মরিচের গুঁড়ো দিয়ে শক্ত শক্ত এক রকম পাঁউরুটি তৈরি করে ওরা। বলে, ঝালরুটি। আমিই তাকে আনতে বলেছিলাম।

বললাম, দাও।

কিন্তু তুমি আমাকে মিঞা-সাহেব বললে কেন হে ?

ছিন্নু এলো একটি কলাইকরা থালার ওপর ডাঁটভাঙা কাপে চা নিয়ে। বিস্কুটওলাকে দেখেই বললে, তুমি আমাদের জাত মেরে দিয়েছ। কাল থেকে আর এসো না।

বিস্কুটওলা হাসতে লাগলো।

ছিন্নু বললে, হাসি নয়। তুমি বামুন নও, আমি সব খবর নিয়েছি।

বিস্কুটওলা কথাটা গ্রাহ্যই করলে না। আনা-চারেকের ঝাল-রুটি দিয়ে সে ধার রইলো বলে চলে যাচ্ছিল। আমি তার দাম দিয়ে দিলাম।

ছিন্নু বললে, তুমি বেহেস্তে যাবে মিঞা-সাহেব। খোদাকে আজ রাত্রেই আমি বলে দেবো।

—রাত্রে তোমার সঙ্গে দেখা হবে খোদার ?

ছিন্নু বললে, হ্যাঁ রোজ রাত্রে তামাক খেতে আসে।

এই সব তুচ্ছ সামান্য কথা শুনতাম আর হেসে হেসে পেটে খিল্ ধরে যেতো।

ছিনুকে বলেছিলাম, আমাকে মিঞা-সাহেব বোলো না ছিনু। আজ বিস্কুটওলা পর্যন্ত আমাকে মিঞা-সাহেব বলে ডেকে গেল।

ছিনু বললে, তোমার দাদামশাই-এর খেতাব রায়-সাহেব। সরকার দিয়েছে। আর তোমার খেতাব মিঞা-সাহেব। আমি দিয়েছি। ছিনু-সরকার। আজ রাত্রে খোদাকে বলে আমি ওটা মঞ্জুর করিয়ে নেবো।

নজরুল আর আমি একদিন বিকালে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। দেখি, বোর্ডিং-এর পেছন দিকে আগাছার জঙ্গলের ভেতর লণ্ঠন নিয়ে কে যেন কি খুঁজছে।

আবতুল ছিল দোরের কাছে দাঁড়িয়ে। আবতুল রান্নাও করে, চাকরের কাজও করে। তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম, লণ্ঠন নিয়ে ওই দিকটায় কে গেল আবতুল?

আবতুল বললে, ছিনু মিঞা হুঁকো খুঁজছে।

—হুঁকো খুঁজছে?

আবতুল বললে, হ্যাঁ বাবু, তোমাদের ইস্কুলের পণ্ডিত এসেছিল তোরাব-সাহেবের কাছে। ছিনু মিঞা ওই জানলার কাছে বসে বসে তামাক খাচ্ছিল, দেখতে পায়নি। তার পর যেই পণ্ডিতকে দেখতে পাওয়া, আর অমনি আগুন-সুদ্ধ হুঁকো-কলকে ওই জানলা গলিয়ে ফেলে দিয়েছে ওইদিকে।

—তাই বুঝি আনতে গেছে ছিনু?

আবতুল বললে, হ্যাঁ। ওদিকে ভাত চাপিয়েছি। এখনও লণ্ঠনটা আনলে না।

পরের দিন দেখলাম, ছিনুর হুঁকোটি জানলার পাশে নামানো। নারকেলের মালার এখানে-ওখানে সাদা চুন লাগানো হয়েছে। পাথরের ওপর পড়ে ফেটে গেছে হুঁকোটি।

আমাদের তখন মর্নিং ইস্কুল। রাণীগঞ্জ কয়লাকুঠির দেশ। ওখানকার গরম মনে রাখবার মত। আমরা অবশ্য জন্মেছি ওই

দেশে। আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। তবু স্কুলের ছুটির পর পুকুরে গিয়ে স্নান করাটাকে সৌভাগ্য বলে মনে হয়।

পুকুরে গিয়ে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে হাপুস্-হুপুস্ করবো, সাঁতার কেটে এপার-ওপার হব, স্নান করবো, চোখদুটো লাল হয়ে উঠবে, হাতের আঙুলের ডগা চুপ্‌সে যাবে, পশ্চিমের সেই প্রচণ্ড গরমেও একটু শীত-শীত করবে, তবে জল থেকে উঠবো। এই ছিল নিয়ম।

আমাদের ম্যানেজার-পুকুরের খুব কাছেই ছিল নজরুলের আস্তানা মহমডেন্-বোর্ডিং। এত কাছে পুকুর, তবু সে আসতো না স্নান করতে। জিজ্ঞাসা করলে বলতো, আমি কূয়োর জলে স্নান করি।

ওদের বোর্ডিং-এর উঠোনে ছিল একটা পাতকূয়ো। বলতো, আমাদের এই কূয়োর জলটা কিরকম ঠাণ্ডা দেখেছো? বরফ-দেওয়া জলের মত। শরীর জুড়িয়ে যায়।

—আরে রাখো তোমার কূয়ো! পুকুরের জলে চান না করলে চানই হয় না!

এই বলে নজরুলকে একদিন জোর করে ধরে নিয়ে গেলাম। শান-বাঁধানো চমৎকার ঘাট। জলে নেমে একপা-একপা করে এগিয়ে এক-কোমর জল পর্যন্ত গিয়ে সে আর যেতে চায় না কিছুতেই।

বললাম, চল।

কিছুতেই যাবে না।

যত টানাটানি করি, ততই অনুনয় বিনয় করতে থাকে।

—টেনো না টেনো না ডুবে যাব।

—ডুববে কেন? সাঁতার জানো না? নজরুল বললে, না।

সেইদিন বুঝলাম তার কূয়োতে স্নান করবার রহস্য।

বললাম, সাঁতার আমি শেখাবো তোমাকে।

নজরুলকে সাঁতার শেখাতে গিয়ে পড়লাম বিপদে। প্রথম দিন রাজী হলো না। কেমন করে সাঁতার কাটতে হয় দেখাচ্ছি তাকে। চিৎ-সাঁতার কাটতে কাটতে পুকুরের প্রায় মাঝখানে গিয়ে পড়েছি, আর সেই সুযোগে হাতের আঙুল দিয়ে নাকটা চেপে ধরে

টুপ্ করে একটা ডুব দিয়ে হড়বড় হড়হড় করে জল থেকে উঠেই—দে ছুট!

পরের দিন আবার ধরে নিয়ে গেলাম নজরুলকে। সেদিন তাকে অনেক কষ্টে রাজী করেছি। রাজী করিয়েছি এই বলে যে, তোমাদের বাড়ির পাশে অত বড় দীঘি—পীরপুকুর, কাছেই অজয়ের মত অত বড় নদী, তুমি সাঁতার জানো না—শুনলে লোকে হাসবে যে!

পুকুরের চার পাড়ে কাঁকর-বিছানো পায়ে চলার পথ। পথের দু'ধারে মরসুমী ফুলের কেয়ারি, আর নানা রকমের সারি সারি ফলের গাছ। পুবদিকের পাড়ে ছোট ছোট দুটো গাছে বিস্তর ফল ধরেছিল। ফলগুলো আঙুরের মত দেখতে। খুব টক। এত টক যে নুন দিয়ে খেতে হয়। তার নাম আমরা কেউ জানতাম না। তখনও জানতাম না, এখনও জানি না। পথের পাশেই টালির একটি ছোট্ট ঘরে থাকতো তিনজন মালি। নজরুল চট্ করে ঢুকে পড়লো মালিদের ঘরে। বেরিয়ে এলো খানিকটা নুন হাতে নিয়ে।

নুন কি হবে?

জবাব না দিয়েই নজরুল ছুটলো সেই গাছের দিকে।

ওইগুলো খাবার ছুতো করে যত দেরি হয় ততই ভাল।

দেরি কিন্তু হলো না। গাছে তখন খাবার মত একটি ফলও নেই। সব তুলে নিয়ে গেছে।

হাতের নুন ফেলে দিয়ে নজরুলকে নামতে হলো পুকুরের ঘাটে।

সেদিন আর কোন কথা নয়। সাঁতার তাকে শিখতেই হবে। কোন ভয় নেই বলে তাকে একবুক জলে টেনে নিয়ে গেলাম। বললাম, এইবার পা-দুটো মাটি থেকে তুলে, জলের ওপর ভেসে থাকবার চেষ্টা কর।

আমি রইলাম কাছে—তার নাগালের ভেতর।

ও বোধকরি তখন দাঁড়িয়ে ছিল শান-বাঁধানো ঘাটের শেষ পৈঠায়।

মাটি থেকে পা তুলে জলে ভাসবার চেষ্টা করতে গিয়ে হঠাৎ কোন্ সময় সে ডুবন্-জলে চলে এসেছে বুঝতে পারেনি।

প্রাণের ভয়ে তৎক্ষণাৎ সে দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে জাপ্‌টে ধরে ফেললে।

সে তখন নিজেও ডুবছে, আমাকেও উঠতে দিচ্ছে না।

আমি যত উঠতে চেষ্টা করি, নজরুল ততই আমাকে চেপে ধরে!

জাপ্‌টা-জাপ্‌টি করে সেদিন বোধহয় আমরা দু'জনেই মরেছিলাম।

আমাদের ঘোড়ার গাড়ির কোচ্‌ম্যান্‌ মহবুব স্নান করছিল। সে আমাদের এই অবস্থা দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি টেনে তুলে আনলে সেখান থেকে।

নজরুল আর আমি—হাঁটুজলে এসে সব-কিছু ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম আর-একটু হলেই আমরা মরে যেতাম। মরে যেতাম মহবুব যদি-না আমাদের টেনে তুলতো।

মহবুবের গায়ের রং ছিল আলকাতরার মতন কালো। তার ওপর তার সর্বাঙ্গে ছিল বড় বড় লোম। কালো একটা ভাল্লুকের মত দেখতে। অসুরের মত যেমন বলবান, তেমনি জোয়ান।

এই মানুষটির ওপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলাম না আমি।

কেন ছিলাম না সেই কথাই বলি।

আমার মাতামহ রায়-সাহেবের ছিল দুটি ঠিক একই রকমের কালো রঙের বড় বড় ঘোড়া, আর দুটি চমৎকার ঘোড়ায়-টানা গাড়ি। রবার-দেওয়া চাকায় কোনও শব্দ উঠতো না, রাণীগঞ্জ শহরের ওপর দিয়ে সে-গাড়ি যখন চলতো, অনেক দূর থেকে শোনা যেতো চারজোড়া ক্ষুরের টপ্‌ টপ্‌ শব্দ। পাশের বাড়িগুলো যেন কাঁপতো থর্‌ থর্‌ করে।

বিকেলে একদিন আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি—তিন বন্ধু। নজরুল, শৈলেন আর আমি। একজন মুসলমান, একজন ক্রিশ্চান আর-একজন ব্রাহ্মণ। হঠাৎ আমার অতিপরিচিত ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনে পেছন ফিরে তাকালাম। দেখি, মহবুব আসছে গাড়ি নিয়ে। রায়-সাহেব রাণীগঞ্জে নেই, নিশ্চয়ই খালি গাড়ি। বন্ধুদের বললাম, চল গাড়িতে চড়ে কাগজ-কল পর্যন্ত ঘুরে আসি।

সবাই আমরা থমকে থামলাম।

সত্যিই ফাঁকা গাড়ি। সওয়ারী থাক আর নাই থাক ঘোড়া দুটোকে রোজ একবার অন্তত ঘুরিয়ে না আনলে শুনেছি তাদের পায়ে বাত হয়। তাই মহবুব চললো ফাঁকা গাড়ি নিয়ে।

হাত তুলে গাড়ি থামাতে বললাম।

গাড়ি কিন্তু থামলো না।

ভাবলাম সে বুঝতে পারেনি। তখন চীৎকার শুরু করলাম।

—মহবুব, গাড়ি থামাও। আমরা যাব।

মহবুব শুনলে না। আমাদের দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে অগ্রাহ্য করে চলে গেল।

বন্ধুদের কাছে আমি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম।

এরকম একদিন নয়। আরও দু'দিন।

সেই মহবুব!

আসন্ন বিপদ থেকে আজ সে আমাদের বাঁচিয়েছে। তার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ছিল আমার।

কী যে সে আশা করেছিল জানি না। আমরা কিন্তু তখন সেকথা ভুলে গেছি। এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নজরুল আর আমি খুব হাসছি।

মহবুব আমাদের ধমক দিয়ে বললে, ওঠো! জল্দি ভাগো। না তো বাবুকে বলে দেবো।

সত্যিই বলে দিলে।

এমন অতিরঞ্জিত করে রং ফলিয়ে আমার এই সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবে যাবার কথা মহবুব বলেছিল আমার মাতামহকে যে, তার পরের দিন থেকে পুকুরে যাওয়া আমার বন্ধ হয়ে গেল। হুকুম হলো—বাড়ির ইন্দারার কাছে চৌকির ওপর বসবো, বাল্‌তি দিয়ে জল তুলে চাকর আমার মাথার ওপর ঢেলে দেবে।

বিকেলে নজরুলকে গিয়ে বললাম সে-কথা।

ছিনু মিঞা শুনলে। বললে, হায় রে কপাল! আমি যদি তুমি হতাম!

জিজ্ঞাসা করলাম, কি করতে তাহলে?

ছিন্নু বললে, চাকরটা দু'দিনেই বাপ্ বাপ্ বলে পালাতো। বলতাম, ঢাল্ ব্যাটা কত ঢালবি। জল তুলিয়ে তুলিয়ে হাতে তার ব্যথা ধরিয়ে দিতাম।

আমার পুকুরে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু নজরুলের বোধকরি তখন নেশা ধরে গেছে।

শুনি সে রোজই পুকুরে যায় স্নান করতে।

কতদিন পরে ঠিক মনে নেই, পনেরো কুড়ি দিন হবে বোধহয়। আমার দাদামশাই রায়-সাহেব কোথায় যেন গেলেন।

ইস্কুল থেকে এসেই তেল মেখে গামছা নিয়ে দে ছুট্!

নজরুলের বোর্ডিং-এ গিয়ে দেখি—নজরুল প্রস্তুত।

পুকুরে গিয়ে নজরুলের কাণ্ড দেখে অবাক! সেই জল-কাতুরে নজরুল যেন অন্য নজরুল হয়ে গেছে। জলে নেমে আমার আগে আগে চলেছে সে। আমার দিকে তাকাচ্ছে আর হাসছে। এক-কোমর, এক-বুক, বললাম, আর যেয়ো না। ডুবে যাবে।

তার কাছ থেকে একটু দূরে দূরে রইলাম। সেদিনের মত যদি জাপ্টে ধরে তো দু'জনেই ডুববো।

কিন্তু অবাক করে দিলে নজরুল। ডুবলো না। আমার সঙ্গে সমানে সাঁতার কেটে এগিয়ে চললো।

বা-রে, এই তো বেশ শিখে ফেলেছো! কেমন করে শিখলে? কে শেখালে?

নজরুল বললে, মহবুব।

শুনলাম, আমি যে ক'দিন আসিনি, নজরুল প্রতিদিন এসেছে আর মহবুব তাকে সাঁতার শিখিয়েছে।

ছিন্নু মিঞার সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে অনেকদিন আগে।

রাণীগঞ্জে থাকতে থাকতেই হঠাৎ একদিন শুনলাম, ছিন্নু দেশে চলে গেছে। শুনলাম, দেশে গেছে 'সাদি' করবার জন্যে।

কিন্তু সেই যে গেল, সে আর ফিরে এলো না।

· তার স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে ভাঙা চুনকামকরা সেই হুঁকোটি পড়ে রইলো বোর্ডিং-হাউসের বারান্দার এক কোণে।

অনেকদিন পরে—এখন থেকে মাত্র ছ' সাত বছর আগে, কি একটা কাজের জন্য গিয়েছিলাম আসানসোল। স্টেশনে ট্রেনটা গিয়ে দাঁড়ালো সন্ধ্যায়। চারিদিকে আলো জ্বলে উঠেছে। দিনের মত পরিষ্কার। প্ল্যাটফর্ম ধরে এগিয়ে চলেছি, হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ডাকলে, শৈলবাবু!

শৈলবাবু!

এ-নাম ধরে কে ডাকলে? থমকে দাঁড়ালাম।

পেছন ফিরে তাকাতেই দেখি, একটি লোক এগিয়ে আসছে আমার দিকে। শীর্ণকায় এক বৃদ্ধ মুসলমান। মুখে কাঁচা-পাকা কয়েক গাছা পাতলা পাতলা দাড়ি-গোঁফ। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। কাছে এসে সে আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো।

—চিনতে পারছেন শৈলবাবু?

চেনবার মত কিছুই ছিল না সে-মুখে, তবু আমার চিনতে দেরি হলো না। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই বোধকরি এমন একটা সময় আসে, যখন যা-কিছু সে দেখে, শুধু চোখ দিয়ে দেখে না, মন দিয়ে দেখে, তাই মন তাকে আর ভুলতে পারে না সারা জীবনেও। সে সময়টা মানুষের কৈশোর। তাই বোধহয় ইস্কুলের সহপাঠীদের আমরা ভুলতে পারি না। কিন্তু কলেজের বন্ধুদের ভুলে যাই।

বললাম, চিনেছি। তুমি ছিনু।

কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় রেল-কোম্পানির একজন কর্মচারী এসে তার একখানা হাত ধরে টানতে আরম্ভ করলে। বললে, এসো, টাকা দেবো এসো।

'কি হয়েছে মশাই?' বলে এগিয়ে গেলাম।

রেল-কর্মচারী বললে, আর বলেন কেন, ব্যাটা পাজীর একশেষ! যাবে বলছে জামুড়িয়া। ধানবাদ থেকে টিকিট করেছে কুলটির। নেমেছে আসানসোলে। জিজ্ঞাসা করলুম তো পাগলের মত

আবোল-তাবোল যা-তা বলতে লাগলো, তারপর উত্তম-মধ্যম দু' এক ঘা দিতেই তখন ঠিক ঠিক জবাব দিলে।

বলেই সে ছিনুর মুখের পানে তাকিয়ে ভেংচি কেটে বললে, ব্যাটা বলে কিনা আমার মাথার ঠিক ছিল না!

কর্তব্যপরায়ণ রেল-কর্মচারীটিকে শান্ত হবার জন্যে অনুরোধ করলাম। বললাম, থামুন। ও চুরিও করেনি, ডাকাতিও করেনি। ওকে মারলেন কেন? ছিঃ!

লোকটি আমার মুখের দিকে কট্‌মট্‌ করে একবার তাকিয়ে দেখলে। তারপর হঠাৎ কেমন যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল। বললে, আপনাকে ডেকে আনলে বুঝি? না না মারবো কেন, মারিনি, মারিনি, এমনি দু' একটা মানে—ধমক ধামক—মানে, যান আপনি যেখানে যাচ্ছেন যান, আমি একটা রসিদ লিখেই ওকে ছেড়ে দিচ্ছি।

বললাম, কিন্তু ও যদি আপনাকে না ছাড়ে!

—মানে?

বললাম, মানেটা খুব সোজা। আপনি ওকে উত্তম-মধ্যম যা দিয়েছেন, ওই-বা সেগুলো চুপচাপ হজম করবে কেন? ছিনু, দাও তো একটি একটি করে গুনে গুনে সেগুলি ওঁকে ফেরত দিয়ে। তারপর উনি গিয়ে রসিদ কেটে আনুন, এক্সেস্‌ ভাড়া যা লাগে আমি দিচ্ছি। কুলটি পর্যন্ত তোমার যে টিকিটখানা ছিল সেটা কোথায়?

এতক্ষণ পরে ছিনু মুখ তুলে চাইলে। জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললে, আমার কাছেই আছে।

বলেই সে তার হাতের বোঁচকাটি নামিয়ে শতচ্ছিন্ন কোটের এ-পকেট ও-পকেট হাতড়াতে লাগলো।

ঠিক সেই সময় ওদিকের প্ল্যাটফর্মে ডাউনের একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন এসে দাঁড়ালো।

রেল-কর্মচারীটি বললে, দেখুন, দেখুন, ফাইভ-ডাউন এসে গেল। দাঁড়ান মশাই, আমার চাকরিটা বজায় রাখি আগে।

এই বলেই সে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োতে লাগলে সেইদিকে।

ছিন্নু ততক্ষণে বের করেছে তার হলুদ রঙের টিকিটখানি।

বললাম, থাক, ওটা রাখো তোমার পকেটে। উনি আর আসবেন না।

ছিন্নু বললে, লোকটি পালিয়ে গেল বলে মনে হচ্ছে!

—হ্যাঁ। চলো, স্টেশনের বাইরে গিয়ে তোমার সঙ্গে তুটো কথা বলি। কতদিন পরে দেখা হলো বল তো ?

ছিন্নু তার বোঁচকাটি তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো। বললে, বেঁচে থাকলে দেখা হয় তাহলে ? আমি আপনাকে ঠিক চিনতে পেরেছি।

বললাম, ও কি ছিন্নু, তুমি আমাকে 'আপনি' বলছো কেন ?

ছিন্নু বললে, বলবো না ?

—কেন বলবে ? কখনও বলেছ ?

ছিন্নু যেন এতক্ষণ পরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো। বললে, ভয়ে ভয়ে বলছিলাম মিঞা-সায়েব। তুখু মিঞা কেমন আছে ভাই ?

তার কি হয়েছে তুমি জানো ?

ছিন্নু বললে, শুনেছি সে নাকি পাগল হয়ে গেছে। যেদিন শুনেছিলাম সেদিন লুকিয়ে লুকিয়ে কি কান্নাই-না কেঁদেছি। আচ্ছা ভাই, এখন কি করে সে ? তোমাকে চিনতে পারে ?

বললাম, না। কাউকে চিনতে পারে না।

পাশেই একটা চায়ের দোকান। ছিন্নু আমাকে সেইখানে নিয়ে গিয়ে বসালে। একটা বেঞ্চির ওপর পাশাপাশি বসলাম তু'জনে।

নজরুল সম্বন্ধে সব কথা সে জানতে চায়।

কতরকমের কত প্রশ্ন। সে যেন আর শেষ হতে চায় না।

যতদূর সম্ভব বলে চলেছি। মাঝখানে দোকানদার চায়ের দাম চাইলে। দিতে যাচ্ছিলাম। ছিন্নু আমাকে কিছুতেই দিতে দিলে না। পকেট থেকে একটুকরো ন্যাকড়ার একটি খুঁটের গিঁট খুলে পয়সা বের করে চায়ের দাম দিলে।

জিজ্ঞাসা করলে, কিছু খাবে ?

বললাম, না। তুমি খাবে তো খাও।

ছিনু বললে, না। কিন্তু দু' কাপ চা নিয়ে আমরা অনেকক্ষণ বসে আছি। এবার যদি আমরা না উঠি তো তাড়িয়ে দেবে।

উঠতে হলো।

কিন্তু আমাদের কথা তখনও শেষ হয়নি।

ছিনু বললে, তোমরা ভাই কত বড় হয়েছ। যেখানে যাই সেইখানেই শুনি তোমাদের নাম। লোকে যখন বলে, আমার বুকখানা তখন দশ হাত হয়ে যায়। কত লোকের কাছে আমি বলি তোমাদের কথা। কিন্তু কেউ আমাকে বিশ্বাস করতে চায় না। লোকের কথা ছেড়ে দাও, নিজের ছেলে পর্যন্ত বিশ্বাস করে না। কতটুকুই-বা আমি তোমাদের জানি। কতদিনই-বা ছিলাম তোমাদের সঙ্গে।

কোনও দোকানে আমাদের বসা হলো না। বড় রাস্তার ধারে ধারে কথা বলতে বলতে চলেছি। বাজারের কোলাহল ছাড়িয়ে পুবমুখে চলেছি আমরা গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড ধরে। পথের দু'পাশে বড় বড় গাছ। বললাম, এসো, বসি এই গাছের তলায়।

ছিনু বললে, আমিও ভাবছিলাম বলি। কিন্তু বলতে সাহস হচ্ছিল না।

গাছের নীচে মাটিতে বসলাম। বললাম, আমাদের কথা তো সবই শুনলে ছিনু, এইবার তোমার কথা বল।

কথাটা শুনে ছিনু যেন অবাক হয়ে গেল। তার আবার কথা কি? পৈতৃক বিঘে-দশেক ধানের জমি, খড়ের চাল-দেওয়া খান-তিনেক মাটির ঘর, একটি গাই আর দুটি বলদ। চাষী মুসলমান গৃহস্থ। জনমজুর খেটে খাই। আমরা আবার মানুষ! তার আবার কথা! কলকাতা শুনেছি আজব শহর—কত জিনিস আছে দেখবার। তাই দেখলাম না আজ পর্যন্ত।

বললাম, আমার ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। তুমি একবার এসো। বেশি দূর তো নয়। কবে কোন্ ট্রেনে আসছো জানিয়ে আগে একখানা চিঠি দিও। স্টেশন থেকে তোমাকে নিয়ে যাব। তোমার দুখু মিঞাকে দেখে আসবে।

ছিনু বললে, সে তো আমাকে চিনতে পারবে না মিঞা-সাহেব।

বললাম, না, তা পারবে না।

—সে তো আমি সহ্য করতে পারবো না! ছিনু বললে, নাঃ, যাওয়া হবে না।

একটা কাগজে লিখছিলাম আমার ঠিকানা।

ছিনু বললে, দাও ওটা। রেখে দেবো বাড়িতে। দেখাবো সবাইকে।

বললাম, না না ছিনু, একটিবার এসো কলকাতায়।

ছিনু আমার ঠিকানাটি যত্ন করে তার পকেটে রাখতে রাখতে বললে, যেতে পারতাম। আমার বড় ছেলেটা যদি বেঁচে থাকতো। চাকরি করছিল ধানবাদে। দশ পনেরো টাকা করে দিচ্ছিল মাসে মাসে। কিন্তু অত সুখ আমার কপালে সইলো না। খবর পেলাম তার কলেরা হয়েছে। সেইখানেই গিয়েছিলাম। দেখতে পেলাম না।

ছিনুর ঠোঁটদুটি থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলো। কথা বলতে পারছিল না। একটা ঢোক গিলে সামলে নিলে। তারপর বললে, পরশু রাত্তিরে শেষ হয়ে গেছে। আমাদের জাতভাই ছিল সব—দিয়েছে মাটি দিয়ে। জিনিসপত্র বলতে কিছুই ছিল না। মেরে দিয়েছে। দিকগে। মানুষটাই গেল তার আবার জিনিসপত্র!

কাপড়ের পোঁটলাটি দেখিয়ে বললে, এই যা ছিল নিয়ে এলাম।

নিজের গায়ের ছেঁড়া কোটটি দেখিয়ে বললে, থাকবার ভেতর ছিল এই কোটটি। আর—

পকেট থেকে পোস্টাপিসের একটি পাশ-বই বের করে তার পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললে, তেরটি টাকা আছে।

টস্ টস্ করে দু' ফোঁটা চোখের জল পড়লো পাশ-বই-এর পাতায়। বইটি বন্ধ করে পকেটে রাখলে। বললে, এ কি আর তুলতে পারব আমি? দেবে না আমাকে। সাদি দিয়েছিলাম। বৌ আছে আর ছোট ছোট দুটো বাচ্চা আছে। থাকে যদি আমার কাছে তো খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করতে হবে আমাকেই।—হুঁঃ! আমি যাব কলকাতায়! তবেই হয়েছে! দাও, তোমার একটা সিগ্রেট দাও—খাই।

সিগ্রেট ধরিয়ে ছিনু আবার বলতে লাগলো, কুলটিতে আছে ছোট ছেলে। রাজমিস্ত্রির কাজ বেশ ভালই শিখেছে। সিমিন্ট্-মাটির ঢালাই-এর কাজও করতে পারে। রোজ চার টাকা, সাড়ে চার টাকা রোজগার। বৌ আছে আর একটা মেয়ে আছে। আলাদা হেঁসেল। আলাদা রান্নাবান্না করে। বাপকে একটি পয়সাও দেয় না। আবার শুনছি নাকি কুলটিতে আর একটা বিয়ে করেছে। সত্যি কিনা জানবার জন্যে কুলটির টিকিট কেটেছিলাম। কিন্তু বড় ছেলেটার কথা ভাবতে ভাবতে এমনি উদাস হয়ে গেলাম যে, কখন কুলটি পেরিয়েছি, সীতারামপুর পেরিয়েছি বুঝতেও পারিনি। আসানসোলে এসে হুঁশ হলো—নেমে পড়লাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি এখন বাড়ি যাবে কেমন করে ছিনু?

দূরে একখানা মোটর-বাস দাঁড়িয়েছিল। ছিনু আঙুল বাড়িয়ে সেই বাসটা দেখিয়ে বললে, আমি ওই বাসে চড়ে বসবো। নামবো একেবারে বাড়ির দরজায়।

এই বলে সে তার বোঁচকাটি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে, তোমার অনেক দেরি করে দিলাম মিঞা-সাহেব। আর ক'দিনই বা বাঁচবো! তবু যাবার আগে একবার দেখা হলো।

ছিনু তাড়াতাড়ি গিয়ে 'বাসে' চড়ে বসলো।

সেই ছিনু মিঞা!—প্রিয়দর্শন বলিষ্ঠ এক কিশোর ছাত্র! যার প্রতিটি কথায় মনের অন্ধকার কেটে যেতো। প্রাণ খুলে হেসে বাঁচতাম।

আজ এই শীর্ণ শোকাতুর বৃদ্ধের ভেতর আনন্দোচ্ছল প্রাণবন্ত সেই ছিনুকে খুঁজে পেলাম না।

কলকাতায় ফিরে এসেছি।

ছিনুর কথা সবার আগে যাকে আমার জানানো উচিত—সে-ই বা কোথায়?

সেও তো আত্মসমাহিত, নির্বিকার!

এ-কথা আমি বলবো কাকে—?

দুই

রাণীগঞ্জের ইস্কুলে তখন আমাদের ক্লাশ বসে দোতলায়।

পশ্চিমদিকে বড় বড় জানলা। সেই খোলা জানলার পথে দেখলাম, দলে দলে লোক ছুটছে রেল-লাইনের দিকে। কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। ইস্কুলের ছেলে—ক্লাশ ছেড়ে যেতেও পারি না। সবাই ভাবছে, ছুটি হোক, ছুটি হলেই ছুটবো ওইদিকে।

ছুটি হলো। বাইরে বেরিয়েই শুনলাম, সাঁওতালদের একটা মেয়ে নাকি কাটা পড়েছে ট্রেনের তলায়। তার মৃতদেহটা পড়ে আছে লাইনের ধারে।

ইস্কুলের ছেলেরা অনেকেই গেল দেখতে। আমার কিন্তু একা যেতে মন সরলো না। কিছুদিন ধরে কি যে হয়েছে—নজরুলের সঙ্গে দেখা না হলে বিকেলটা মনে হয় মাটি হয়ে গেল।

নজরুল পড়ে শিয়াড়শোল ইস্কুলে, আমি পড়ি রাণীগঞ্জে। এক এক সময় আফশোষ হয়—এক ইস্কুলে পড়লাম না কেন? কিন্তু উপায় নেই।

বাড়িতে বই-খাতা রেখেই ছুটলাম।

বাগানে গিয়ে দেখি, পুকুরের শান-বাঁধানো ঘাটের চত্বরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে নজরুল। দু'হাত দিয়ে বুক বাজাচ্ছে, গুঁক গুঁক করে ডুগি-তবলার বোল বলছে আর গান গাইছে।

আমাকে দেখেই তার সঙ্গীত বন্ধ হয়ে গেল। উঠে বসেই বললে, অনেকক্ষণ এসেছি।

—বেশ করেছ। চল।

কোনও কথা বলবার অবসর না দিয়েই দু'জনে ছুটলাম রেল-লাইনের দিকে। মুসলমানপাড়ার ভেতর দিয়ে, শেকার-সাহেবের বাঙলো পেরিয়ে, অলিতে-গলিতে এঁকেবেঁকে হাঁপাতে হাঁপাতে

লাইনের ধারে গিয়ে যখন পৌঁছোলাম, দেখি—সব ভোঁ-ভাঁ। কেউ কোথাও নেই। গোটাকতক ছাগল চরছে শুধু লাইনের ওপর।

কাকেই-বা জিজ্ঞাসা করি?

নজরুল তো ছ'হাত তুলে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে গান ধরে দিলে :

'আহা কি দেখালে হরি!
শ্যামের বামে রাই-কিশোরী!'

কাঠের স্লিপারের ওপর পা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

—ও মশাই, শুনছেন?

এক ভদ্রলোক লাইন পার হচ্ছিলেন ছাতি মাথায় দিয়ে। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে একটা মেয়ে কাটা পড়েছিল জানেন?

—জানি।

—কি হলো বলতে পারেন?

পুলিশ তাকে তুলে নিয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

বাস, খতম। হয়ে গেল আমাদের অভিসার-যাত্রা।

সামনে এগেরা যাবার পাকা রাস্তা। রাস্তার ছ'দিকে বড় বড় গাছ। লাইন থেকে নেমে সেই রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম। কোথায় যাব ভাবছি। নজরুল বললে, আমি আর হাঁটতে পারছি না। বসলাম।

গাছের তলায় কচি কচি ঘাস গজিয়েছে। শাখায়-প্রশাখায় পত্রে-পল্লবে মাথার ওপর আকাশ দেখা যায় না। ছায়াস্নিগ্ধ জায়গাটি বড় মনোরম। ঘাসের ওপর নজরুল শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে বুক বাজিয়ে আবার শুরু হলো তার সঙ্গীতচর্চা।

গাছের তলায় ছ'জন পাশাপাশি শুয়ে।

হঠাৎ মোটরের হর্নের শব্দে চমকে উঠলাম। চেয়ে দেখি, পথের ওপর একটা মোটর এসে দাঁড়িয়েছে। হুড্‌খোলা মোটর। যিনি চালাচ্ছিলেন তিনি ইংরেজ। আমাদের দিকে তাকিয়ে কি যেন তিনি বললেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে।

নজরুল বললে, আমাদের ডাকছে।

গেলাম এগিয়ে। কিন্তু কি যে বলছেন ভদ্রলোক, এক বর্ণ বুঝলাম না।

সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ছি। ছাপা বই পড়তে পারি। মানেও বুঝি কিছু কিছু। কিন্তু খাস ইংরেজের কথা বুঝবার ক্ষমতা তখনও হয়নি। নজরুল তাকাচ্ছে আমার দিকে, আমি তাকাচ্ছি তার দিকে। গাড়ির পেছনে কমবয়েসী যে মেয়েছুটো বসেছিল, তারা তখন মুখ টিপে টিপে হাসছে।

সাহেবের পাশে যে ভদ্রমহিলা বসেছিলেন, তিনি গাড়ির দরজা খুলে নামলেন। আমাদের কাছে এসে বললেন, ছেলেসকল! এসোনসোল কেটো দূর বলিতেছি।

নজরুল বলে উঠল, দে গরুর গা ধুইয়ে! তা এতক্ষণ বলতে হয় মা-ঠাকরুণ!

এবার মা-ঠাকরুণের পালা! কিছু বুঝতে না পেরে তিনি হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে।

বললাম, ভুল পথে চলে এসেছেন আপনারা।

নজরুল বললে, পিছু হঠে গিয়ে গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড ধরতে হবে।

বাঙলা-জানা মেমসাহেব ভেবেছিলাম এবার সবই বুঝতে পারবেন। কিন্তু 'ভুল' কথাটা তখন তাঁর মাথায় ঢুকে গেছে। এখনও আমার মনে আছে—কি বিপদেই না পড়েছিলাম সেদিন। আমি যত বলি—'ভুল হয়েছে আপনাদের', উনি তত বলেন, 'নো। ভুল আমার হইতে পারে না।'

তাঁর সে কী রাগ!

প্রথমে বুঝতে পারিনি তাঁর রাগের কারণটা। পরে বুঝেছিলাম।

ভদ্রমহিলা ভেবেছিলেন, আমি বুঝি তাঁর বাঙলা ভাষার ভুলের কথা বলছি।

তাঁরও দোষ নেই। যতই তিনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, একদিক থেকে যুবতী মেয়ে ছুটো খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে, আর একদিক থেকে আমাদের দুর্বোধ্য দেশী ভাষায় নজরুল টিপ্পনি কাটতে থাকে।

শেষে অতিকষ্টে গ্রামার বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে ইংরেজি বলে মেমসাহেবকে বুঝিয়ে দিতে হলো।—ইউ হ্যাভ কাম হিয়ার বাই মিস্টেক মেমসাহেব। ইট ইজ আওয়ার রাণীগঞ্জ। ইট ইজ নট আসানসোল।

নজরুল বললে, ইউ উইল হ্যাভ টু গো ব্যাক অ্যাণ্ড ক্যাচ গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড।

এই বার বাধল আর-এক বিপদ।

কোথায় গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড? কোন্‌দিকে?

অথচ সেই রাস্তা ধরেই তাঁরা এসেছেন।

হাত বাড়িয়ে, আঙুল বাড়িয়ে, লেফট বলে, রাইট বলে, এদিকে ঘুরে, ওদিকে ঘুরে, কিছুতেই তাদের যখন বুঝিয়ে দিতে পারলাম না, মেমসাহেব নিজেই তখন তার মীমাংসা করে দিলেন। হাতে ধরে আমাদের দু'জনকে তুলে নিলেন তাঁর গাড়িতে। পথ দেখিয়ে তাঁদের নিয়ে যেতে হবে। ধরিয়ে দিয়ে আসতে হবে গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড।

গাড়িতে চড়তে পেয়ে আমাদের সে কি আনন্দ! মোটরগাড়ি তখন আমাদের ওদিকে একরকম নেই বললেই হয়।

গাড়ি ঘুরিয়ে নেওয়া হলো। আমরা দু'জন বসেছি সুমুখের সিটে—সাহেবের পাশে। মেমসাহেব গিয়ে বসলেন পেছনে—তাঁর দুই কন্যার সঙ্গে।

তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। শহরের পথে কেরোসিনের বাতি জ্বলেছে।

গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড সেখান থেকে খুব কাছে নয়। অনেকখানি পথ। যাবার সময় না হয় মোটরে গেলাম, কিন্তু ফেরবার পথে?

নজরুলকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম, আসবে কেমন করে?

—পায়ে হেঁটে।

বললাম, অনেক রাত্রি হয়ে যাবে।

নজরুল বললে, হোক না।

বললাম, তোমার কি! তোমাকে তো কেউ কিছু বলবে না, আমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে। খুব বকবে।

নজরুল বললে, তাহলে অতদূর গিয়ে কাজ নেই।

নামবার ইচ্ছা তারও ছিল না, আমারও ছিল না, কিন্তু বাধ্য হয়ে নামতে হলো।

ফিডার রোডের ওপর খাঁড়গুলির মাথায় গাড়ি থামালাম। বললাম, এবার আপনারা সোজা চলে যান। গিয়ে যে রাস্তায় পড়বেন, সেইটেই গ্র্যাণ্ড-ট্র্যাঙ্ক-রোড। সোজা বাঁদিকে চলে যাবেন। যেখানে দেখবেন--রাস্তার দু'পাশে বড় বড় বাড়িঘর, দোকান-পসরা, হাট-বাজার, সেইটেই জানবেন আসানসোল।

এই বলে আমরা নামলাম গাড়ি থেকে।

এইবার ধন্যবাদ দেবার পালা। তখন আমরা ইস্কুলের ছাত্র। তখন বুঝতে পারিনি। এখন বুঝেছি—জাতি হিসাবে ইংরেজ অতি ভদ্র।

আমাদের গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে অনায়াসে গাড়ি ছুটিয়ে তারা চলে যেতে পারত। আমরা কতটুকু উপকারই-বা করেছি তাদের। তাদেরই গাড়িতে চড়ে তাদের শুধু পথ দেখিয়ে দিয়েছি।

এই কৃতজ্ঞতার ঋণটুকু তারা পরিশোধ না করে দিয়ে সেখান থেকে নড়ল না। সাহেব নামল, মেমসাহেব নামল, এমন কি মেয়ে দুটিও নামল গাড়ি থেকে। তারপর প্রত্যেকে আমাদের হাতে হাত মিলিয়ে হ্যাণ্ডশেক্ করে বললে, থ্যাঙ্ক ইউ!

ভদ্রমহিলা শুধু হ্যাণ্ডশেক্ করে ক্ষান্ত হলেন না। সবার শেষে দু'হাত দিয়ে তিনি আমাদের হাত দুটি ধরে বুকের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, গড ব্লেস ইউ মাই চাইল্ড!

তারপর জনবিরল সেই শহরতলীর পথের ওপর দিয়ে স্বল্পালোকিত সন্ধ্যার অন্ধকারে গাড়িখানি অদৃশ্য হয়ে গেল। জীবনে আর কোনদিনই তাদের সঙ্গে দেখা হবে না জানি। ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভাষা, সম্পূর্ণ অপরিচিতা, অনাত্মীয়া এই ভদ্রমহিলা। তবু এই মুহূর্তটি আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে আমার জীবনে।

বাড়ি ফেরার পথে নজরুল বলেছিল, ইংরেজিটা শিখতে হবে।

সেকেণ্ড মাস্টার বলেছিলেন, ইংরেজি শিখতে হলে ইংরেজি

খবরের কাগজ পড়ো, আর ইস্কুলের লাইব্রেরী থেকে ইংরেজি গল্পের বই নিয়ে গিয়ে পড়বার চেষ্টা কোরো।

আমাদের বাড়িতে আসতো দু'খানা ইংরেজি কাগজ। ইংলিশম্যান আর হিন্দু পেট্রিয়ট।

কয়েকদিন চেষ্টা করলাম পড়বার। কিন্তু ভাল লাগল না। হিন্দু পেট্রিয়ট খুলে ছবি দেখতাম শুধু।

ইস্কুলের লাইব্রেরী থেকে বই আনতে আরম্ভ করলাম। দু'চার পাতা পড়ি আর শক্ত কথার মানে বুঝবার জন্যে ডিক্সনারী খুলি। এমনি করে অভিধান খুলে মানে বুঝে বুঝে গল্পের বই পড়তে ভাল লাগে না। বই আনি আর ফেরত দিই। আবার আনি, আবার ফেরত দিয়ে আসি।

বই আর আনবো না বলে প্রতিজ্ঞা করে লাইব্রেরীতে সেদিন গিয়েছিলাম বই ফেরত দিতে।

লাইব্রেরিয়ান-ভদ্রলোক লজ্জায় ফেলে দিলেন। বইখানা ফেরত নিয়ে বললেন, হ্যাঁ। এমনি করেই পড়তে হয়। পড়ে পড়ে আলমারি প্রায় সাফ করে আনলে। এইবার 'মেরি কোরেলি' ধর।

এক গাদা ছেলের মাঝখানে এই কথা শুনে খালি-হাতে ফেরা হলো না। বললাম, দিন একখানা মেরি কোরেলিই দিন।

'ভেনডেটা' নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

নজরুলের কাছে গিয়ে দেখি সেও দু'খানা বেশ মোটা মোটা বই এনেছে তাদের ইস্কুল থেকে। বই দু'খানার নাম আজ আর আমার মনে নেই।

আমি যদিই-বা অতিকষ্টে মেরি কোরেলি প্রায় শেষ করে এনেছিলাম, নজরুল তার বই-এর পাতাও কোনদিন উল্টে দেখেনি। প্রায়ই দেখতাম বই দু'খানা তার ডুগিতবলার কাজ করছে। মোটা বই—বাজাবার সুবিধে হয়েছিল ভাল।

তিন

এমনি দিনে একটা ভারি মজার ঘটনা ঘটল।

শেকার-সাহেবকে প্রায়ই দেখি আমাদের বাড়ির সুমুখ দিয়ে যাওয়া-আসা করে। বেঁটে-খাটো মোটাসোটা মানুষটি, চোখে চশমা, হাতে একটি মোটা লাঠি। কোনদিন দেখি, বাজারের থলে হাতে নিয়ে বাজার করতে যাচ্ছে। আবার কোনদিন দেখি, চেন দিয়ে বাঁধা প্রকাণ্ড একটা অ্যাল্‌সেশিয়ান কুকুর তার সঙ্গে।

সেদিন তাকে দেখেই হঠাৎ আমার মনে হলো—ভাল ইংরেজি শেখবার এই একটা পথ আছে।

ছুটে গিয়ে ধরলাম সাহেবকে।—গুড মর্নিং মিস্টার শেকার।

শেকার-সাহেবের সঙ্গে সেদিন কুকুর ছিল না। নির্ভয়ে এগিয়ে গেলাম। সাহেব আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, মর্নিং, হু আর ইউ?

বললাম, Rai Shaheb M. Chatterjee's grandson.

সাহেব আমার কাঁধে হাত রাখলে। বললে, ভাল। কি বলছো? বাংলায় বল। আমি বাংলা জানি।

সর্বনাশ! এ বলে কি!

বললাম, না, বাংলায় বলব না। ইংরেজিতে বলব। I shall go to your house.

ভেবেছিলাম, সাহেব ইংরেজিতে জবাব দেবে। কিন্তু ইংরেজির ধার-পাশ দিয়েও সে গেল না। পরিষ্কার বাংলায় বললে, যেয়ো। পয়সা নিয়ে যেয়ো কিন্তু। দু'আনায় একটা মস্ত বড় পেঁপে দেবো। পেয়ারা দেবো আনায় দুটি।

সাহেব গরীব। পেঁপে, পেয়ারা, ডিম, কলা বিক্রি করে জানি। কিন্তু ইংরেজিতে কথা যদি সে না বলে?

নিশ্চয়ই বলবে। আমাদের উদ্দেশ্য সাহেবকে বুঝিয়ে বলব—

তাহলেই বলবে। এই আশা নিয়েই গেলাম সেদিন নজরুলকে সঙ্গে নিয়ে।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে শেকার-সাহেবের বাংলো। চারিদিকে ফলের গাছ আর ফুলের বাগান। তারই মাঝখানে ছোট্ট একটি একতলা বাড়ি। ছবির মত দেখতে।

গাছের তলায় কতকগুলো মুরগি ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাঁস চরছে, আর পায়রা উড়ছে।

ফুলের বাগানের মাঝখান দিয়ে পথ। দু'দিকে বড় বড় ফুল ফুটে রয়েছে। কতরকমের কত রঙের কত ফুল। তাদের নাম জানি না।

নজরুল বললে, বাঃ, এখানে এইরকম জায়গা আছে, আগে বলনি। রোজ আসব।

বললাম, ইংরেজি বল এখানে বাংলা নয়।

নজরুল বললে, চুপ! গ্রামার একদম পড়িনি। সব ভুল হয়ে যাবে।

বললাম, হোক ভুল। তবু বলব।

নজরুল বললে, অমন কাজটি করো না। হেসে ফেলব।

কুকুরটা বোধ হয় এতক্ষণ আমাদের দেখতে পায়নি। এইবার হাউ হাউ করে চেঁচিয়ে উঠল।

বাঘের মত কুকুরটাকে নজরুলও এতক্ষণ দেখেনি। যেই দেখা, উল্টে পড়ে আমাকে টানতে টানতে ছুটে একেবারে গেটের বাইরে।

ওদিকে সাহেব তখন চেঁচাচ্ছে: এসো! এসো তোমরা। টম কিচ্ছু করবে না। চলে এসো।

নজরুল বললে, ওটা কুকুর কে বললে? ওটা তো বাঘ।

বললাম, না, বাঘের মত দেখতে। অ্যাল্‌সেশিয়ান।

নজরুল বললে, যেই হোক, বৈষ্ণব তো নয়। চল পালাই।

জায়গাটা ছেড়ে যেতেও ইচ্ছে করছে না, কুকুরের ভয়ে ঢুকতেও ভয় করছে।

এমন সময় ষোল-সতেরো বছরের সুন্দরী একটি মেয়ে

এসে দাঁড়াল গেটের কাছে। বললে, এসো, বাবা তোমাদের ডাকছে।

বললাম, কুকুরটা কামড়াবে না তো?

মেয়েটি বললে, ধেৎ, কাউকে কামড়ায় না। খুব কথা শোনে। এসো।

মেয়েটির পিছু পিছু দু'জনেই যাচ্ছি। নজরুল চুপি চুপি বললে, এরা সায়েব নয়। অন্য কোনও জাত।

—কে বললে?

—মেয়েটা কি রকম বাংলা বললে শুনলে না?

বললাম, বাংলা শিখেছে।

নজরুল বললে, তাহলে ইংরেজি ভুলে গেছে।

ধীরে ধীরে এসে বসলাম সাহেবের কাছে। সাহেব আগেই তার ইজিচেয়ারের দু'দিকে দুটি টুল পেতে রেখেছিল। কুকুরটা তখন শুয়ে শুয়ে মিট্ মিট্ করে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে।

সাহেব বললে, পয়সা এনেছ?

বললাম, ইয়েস, টেক ইট।

পকেট থেকে বের করে দু' আনা পয়সা তার হাতে দিয়ে বললাম, প্লিজ, স্পিক ইন ইংলিশ।

হোয়াই?—সাহেব হো হো করে হেসে উঠল। তারপর ডাকতে লাগল, মতি! মতি!

যে-মেয়েটি আমাদের এখানে ডেকে আনলে তারই নাম মতি।

মতি এসে দাঁড়াতেই সাহেব বললে, ভাল একটি পাকা পেঁপে কেটে দুটি জায়গায় ভাগ করে এদের দাও।

মতি বললে, মাকে বলবো, না আমি দেবো বাবা?

সাহেব জিজ্ঞাসা করলে, মা তোমার কি করছে?

মতি তার বাবার কানে কানে কি বললে কিছুই বুঝা গেল না।

সাহেব হঠাৎ চীৎকার করে উঠল: শালা আবার এসেছে? আবার এসেছে শালা চোর!

এই বলে লাঠি হাতে নিয়ে সাহেব ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল

যাবার সময় আমার-দেওয়া দু'-আনিটি কিন্তু সে নিয়ে যেতে ভুললো না।

হঠাৎ বাড়ির ভেতর দারুণ এক হট্টগোল।

মনে হলো সাহেব তার লাঠি দিয়ে কাকে যেন মারছে, আর সে লোকটা বাবারে মারে বলে চীৎকার করছে। তাই না শুনে মতিও চলে গেল ভেতরে।

নজরুল বললে, এ কি আরম্ভ হলো ? চল পালাই।

বললাম, পেঁপে খাবে না ?

নজরুল বললে, মার খেতে হবে তাহলে।

চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, এমন সময় সাহেবের তাড়া খেয়ে চীৎকার করতে করতে যে-লোকটা আমাদের পায়ের কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, তাকে আমরা দেখেই চিনতে পারলাম। দুগ্‌গা।

শুধু আমরা কেন, সারা রাণীগঞ্জের ভেতর দুগ্‌গাকে চেনে না—এমন লোক বোধ হয় নেই। অস্বাভাবিক রকম লম্বা আর কালো, অস্থিচর্মসার এই দুগ্‌গার বয়স বোধকরি কুড়ি কি বাইশ। টিয়া পাখির ঠোঁটের মত বাঁকা আর লম্বা নাক, গোল-গোল বড়-বড় দুটো চোখ—একবার যে দেখেছে, সে আর তাকে ভুলবে না কখনও।

আগেও যেমন দেখেছি সেদিনও তেমনি দেখলাম তার পরণে খাঁকি হাফ-প্যাণ্ট, গায়ে লাল রঙের গেঞ্জি।

মার খেয়ে ছুটে সে পালাচ্ছিল। টুলে পা লেগে উলটে পড়ে গেল। সাহেবের হাতের লাঠি তোলাই ছিল, পড়তো যদি সেটা তার মাথায় তো কি হতো বলা যায় না। নজরুল লাফিয়ে গিয়ে দু'হাত দিয়ে সাহেবের হাতখানা ধরে ফেললে।

সাহেব বললে, ছাড়, ওকে আমি আজ মেরেই ফেলব।

কালো রঙের বর্ষীয়সী যে-মেয়েটি সাহেবের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে বলে উঠল, হ্যাঁ তা আর মারবে না! এই ছেলেটাকে মারতে তোমার হাত উঠছে ? ছি !

সাহেব চেঁচিয়ে উঠল : তুমি থাম। ব্যাটা চোর। ও আমার ঘড়ি চুরি করেছে আর তুমি ওকেই কিনা বসে বসে খাওয়াচ্ছিলে !

মেয়েটি বললে, বেচারা তিনদিন কিছু খায়নি। এই কথা শুনেও আমি চুপ করে থাকব?

এই অবসরে দুগ্গা ছুটে পালিয়েছে দেখে নজরুল শেকার-সাহেবের হাতটা দিলে ছেড়ে, আর মতি বললে, মা, তুমি চুপ কর। যার জন্যে চেঁচাচ্ছ সে পালিয়েছে।

মতির মা বললে, আহা, বেচারাকে খেতেও দিলে না!

শেকার-সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিরকম ঘড়ি আপনার?

সাহেব বললে, খুব ভাল পকেট-ঘড়ি।

আমাদের বাড়ির সামনেই ঘড়ি মেরামত করবার একটি দোকান। বাঙালী ক্রিশ্চান জোসেফ্ তার মালিক। দুগ্গাকে আমি প্রায়ই দেখি, জোসেফের কাছে বসে বসে বিড়ি টানছে। বললাম, দাঁড়ান আমি দেখি যদি ঘড়িটা উদ্ধার করতে পারি।

সাহেব বললে, দু' এক টাকা লাগে যদি—

মতির মা বললে, আমি দেবো। আমার কাছ থেকে নিয়ে যেয়ো।

সেদিন আমাদের পেঁপেও খাওয়া হলো না, ইংরেজিও বলা হলো না। আর-একদিন হবে বলে চলে এলাম।

জোসেফ মানুষটি বড় ভাল। সেইদিনই সন্ধ্যায় তার দোকানে গিয়ে বসলাম। চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম, দুগ্গা আপনাকে একটা ঘড়ি দিয়েছে?

জোসেফ আমার মুখের পানে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। বললে, তোমাদের ঘড়ি? দেড়টি টাকা নিয়ে এস। আমি দোকান বন্ধ করব।

তৎক্ষণাৎ ছুটলাম শেকার-সাহেবের বাড়ি।

কুকুরের ভয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে মতি মতি বলে ডাকছি, দূর থেকে মতি বললে, বাবা বাড়িতে নেই।

বললাম, তোমার মাকে ডাক।

কালো সেই মেয়েটি বেরিয়ে এলো। বললাম, দেড়টা টাকা আনুন, ঘড়িটা এনে দিচ্ছি।

হাসতে হাসতে মতির মা একটি টাকা আর একটি আধুলি

আমার হাতে এনে দিয়ে বললে, বেঁচে থাকো বাবা, তুমি আমার কী উপকার যে করলে!

—দাঁড়ান আগে এনে দিই, তারপর বলবেন।

দেড়টি টাকা জোসেফের হাতে দিতেই ঘড়িটি জোসেফ আমার হাতে দিয়ে বললে, দুগ্‌গাকে বাড়ির ভেতর ঢুকতে দিও না। দুগ্‌গাটা চোর।

কথার জবাব না দিয়ে ঘড়ি নিয়ে আমি ছুটলাম শেকার-সাহেবের বাড়ি। আনন্দে আত্মহারা হয়ে কুকুরের কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। সোজা বাড়ির ভেতর ঢুকে দেখি দোরের সামনে কুকুরটা শুয়ে আছে। বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল। থমকে থেমে গিয়ে চীৎকার করে উঠলাম, মতি! কুকুর—

কুকুরটা কিন্তু চোখ তুলে আমাকে দেখেই মুখ নামিয়ে নিলে। কিছুই বললে না। মতি এলো। মতির মা এলো। মতি আমার অবস্থা দেখে হাসতে হাসতে বললে, চেনা মানুষকে টম কিছু বলে না।

মতির মা'র হাতে ঘড়িটা দিতেই তার সে কি আনন্দ!

আমাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না! বলে, কিছু খেয়ে যাও।

আমার কিন্তু তখন আর এক মুহূর্ত দেরি করবার উপায় নেই। পড়ার জায়গায় আমাকে না দেখলেই লোক ছুটবে নজরুলের বোর্ডিং-এ। বললাম, আর-একদিন আসব। বলেই ছুটে পালিয়ে এলাম সেখান থেকে।

তারপর থেকে প্রায়ই যেতাম শেকার-সাহেবের বাড়ি। কিন্তু যে-কাজের জন্যে যাওয়া সে-কাজ আর হয়ে উঠতো না। শেকার-সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া শুনতাম মতির মা'র। শেকার-সাহেব রাগলে সবাইকে শালা বলত। মতির মাকেও বলত—শালা। নজরুল আর আমি হো হো করে হেসে উঠতাম।

শেকার-সাহেব পয়সা পয়সা করেই অস্থির। আর মতির মা সেদিক দিয়ে দিলদরিয়া। চারটি পয়সা নিয়ে আমাদের দু'জনকে দুটি পেয়ারা দিলে শেকার-সাহেব। ভাবলে খুব বিজনেস্ করলাম। ওদিকে সাহেবের চোখের আড়ালে দুটো দুটো চারটে

ডিমের আমলেট তৈরি করে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের খাইয়ে দিলে মতির মা।

অত বড় একটা সাহেব, সাদা ধপ ধপ করছে গায়ের রং, আমরা কথা বলি রীতিমত সমীহ-সম্মান করে, অথচ মতির মা—নেহাত কুৎসিত না হলেও কয়লার মতন গায়ের রং, কি জাতের মেয়ে তাই-বা কে জানে, কিন্তু সাহেবকে সে এতটুকু খাতির করে কথা বলে না।

নজরুল একদিন বললে, কই হে, তোমার সায়েব তো ইংরেজিতে কথাই বলছে না!

মতির মা হাসতে হাসতে বলেছিল, নাই-বা বললে। ইংরেজিতে কথা বললে তোমরা বুঝতে পারবে না যে!

নজরুল বললে, শুনতে শুনতে বুঝব।

আমি সেদিন মতির মাকে বুঝিয়ে বলেছিলাম, ইংরেজিতে কথা বলা আমরা শিখতে চাই। সাহেব বলবে, আমরাও বলব, এমনি বলতে বলতেই শিখে ফেলব।

কথাটা শুনে মতির মা তো হেসেই খুন! বলে, খবরদার, খবরদার, অমন কাজটি করো না। সাহেব তোমাদের ভুল শিখিয়ে দেবে।

সাহেব কোথায় যেন গিয়েছিল। ঠিক সেই সময়েই লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে এসে দাঁড়াল। মতির মা তার মুখের ওপরেই বলে দিলে, সাহেব লেখাপড়া জানে না যে! মুখখু! গো-মুখখু যাকে বলে, ঠিক তাই। মেলা টাকাই জমিয়েছে শুধু, নিজের নামটা পর্যন্ত সহি করতে পারে না।

সাহেব তার ইজিচেয়ারটিতে বসতে বসতে বল্লে, শালা!

সময় পেলেই আমরা ছুটতাম শেকার-সাহেবের বাংলোয়।

ইংরেজি শেখা হলো না। তবু যেতাম। গেলেই দু-চার পয়সা প্রণামী দিতে হতো সাহেবকে, তবু সেখানে যাবার কেমন যেন একটা অনিবার্য আকর্ষণ অনুভব করতাম। অপরিণত বয়স্ক ইস্কুলের ছাত্র আমরা. কোন-কিছুই তলিয়ে বুঝবার ক্ষমতা তখন আমাদের ছিল

না। এখন এতদিন পরে এই বৃদ্ধ বয়সে বিগত জীবনের পেছনের পাতাগুলো ওল্টাতে গিয়ে দেখি, এইখানকার কয়েকটি পাতায় যেন পাকা রং ধরেছে। এতদিন পরে সবকিছু ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেছে, রাণীগঞ্জে গিয়ে দেখে এসেছি—শেকার-সাহেবের সে বাংলো নেই, মনোরম তপোবনের মত স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন সেই আশ্রমটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, শেকার-সাহেব নেই, মতির মা নেই, টম কুকুরটি নেই, শুনেছিলাম এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে মতি চলে গেছে সিঙ্গাপুরে। মহাকাল সব শেষ করে দিয়েছে। কালো কুৎসিত মতির মা শুধু আমার জীবন-খাতার কয়েকটি পাতা আলো করে রেখেছে। হয়তো-বা সে ছিল অস্পৃশ্যা, হয়তো-বা কোন অচ্ছুতের মেয়ে, সমাজে হয়তো-বা তার কোনও স্থান ছিল না, কিন্তু আমার মনের মণিকোঠায় মহীয়সী জননীরূপে এখনও সে তার পবিত্র স্থানটুকু অধিকার করে রয়েছে।

নজরুল ছিল একটু অশান্ত চঞ্চল, কিন্তু মতির মা'র কাছে এলেই লক্ষ্য করতাম, সব চঞ্চলতা তার স্থির হয়ে যেত, চুপ করে বসে বসে কি যেন ভাবত, একটি কথাও বলত না।

শেকার-সাহেবের বাংলোয় যত অশান্তি উপদ্রব ছিল দুগ্‌গাকে নিয়ে। শেকার-সাহেব কিছুতেই তাকে সহ্য করতে পারতো না।

আর কেই-বা পারতো!

ক্যাঁক্‌লাসের মত ওই লম্বা ডিগ্‌ডিগে ছেলেটা সারা রাণীগঞ্জের লোককে জ্বালিয়ে খেয়েছিল। পথের কুকুরগুলো যেমন ঘুরে বেড়ায় দুগ্‌গাও ঠিক তেমনি করে ঘুরে বেড়াত শহরের পথে পথে। কখনও কারও বাড়ির রকে, রেল-স্টেশনের ওয়েটিং রুমে, প্ল্যাটফর্মের ধারে, থানার বারান্দায়, পুকুরের শান-বাঁধানো ঘাটের চত্বরে, আস্তাবলের পাশে, কিংবা নির্জন কবরস্থানের গাছের তলায় রাত কাটাতো।

কেমন করে তার দিন চলত, কি খেত, কেউ কোনও খবর রাখত না। শুধু খবর রাখত তখন—যখন কারও কোনও জিনিস চুরি যেত।

যেই চুরি করুক, সবাই বলত দুগ্‌গা করেছে। যেখানে পেত কানে ধরে হিড় হিড় করে তাকে টেনে আনত, তারপর চলত তার শরীরের সেই হাড় ক'খানার ওপর অমানুষিক অত্যাচার। কিন্তু আশ্চর্য, এত যে মার খেত, কোনোদিন তার চোখে আমি জল দেখিনি। বাবারে, মারে বলে চীৎকার করত শুধু, কাঁদত না।

আর এত মারও সে খেতে পারত!

তখনই দেখতাম থানার কোনও কন্‌স্টেবল তাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে, আবার খানিক পরেই দেখতাম, পান খেয়ে বিড়ি টানতে টানতে হাসতে হাসতে সে পথ চলছে।

কোথাও যখন কিছু জুটত না, ক্ষিদের জ্বালা যখন অসহ্য হয়ে উঠত, তখনই বোধ হয় সে চুপি চুপি গিয়ে হাজির হতো শেকার-সাহেবের বাংলোয়।

তার ওপর মতির মা'র ছিল অপরিসীম করুণা।

কিন্তু সেখানেও ছিল এক বিড়ম্বনা।

শেকার-সাহেবের নজরে যেদিন পড়ত, সেদিন আর তার খাওয়া হতো না, মার খেয়েই ছুটে পালাত।

ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনটাকে এমনি করেই টেনে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছিল দুগ্‌গা। হঠাৎ তারও জীবনে এলো এক পরিবর্তন।

আরও বছর-দেড়েক পরে।

ইওরোপে তখন চলছে প্রথম মহাযুদ্ধ।

নজরুল আর আমি—দু'জনেই ফার্স্ট ক্লাশে পড়ছি। হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষা চলছে। কিছুদিন ধরেই দেখছি শহরের অলিতে গলিতে প্রতিটি বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে নানা রঙের রকমারি পোস্টার মারা হচ্ছে। মহামান্য করুণাময় বৃটিশ গভর্নমেন্ট ভারতবর্ষের যুবশক্তিকে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়ে মহা শক্তিশালী এক যোদ্ধা জাতিতে পরিণত করতে চান! এ সুবর্ণ সুযোগ হারানো উচিত নয়।

নজরুল আর আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম। নাম লেখালাম বাঙালী পল্টনে। কেন লেখালাম, কেনই-বা এ-কাজ করলাম সে-সব অনেক কথা। পরে বলব।

প্রথমে আমাদের যেতে হবে কলকাতায়। সেখান থেকে করাচী।

সবাই ধরে বসল—দুগ্‌গাকে নিয়ে যাও। পাড়া জুড়োক।

যুদ্ধে যাওয়া মানে মৃত্যু বরণ করা। এই ছিল সকলের ধারণা। ইস্কুলের ছেলে, পড়াশোনায় খারাপ নই, সবাই ভালবাসে, কি এমন হলো আমাদের, যার জন্য এই দুর্মতি—এরই জবাব দিতে দিতে প্রাণান্ত হয়ে গেলাম। যে ক'দিন রাণীগঞ্জে রইলাম, লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। দুগ্‌গা কিন্তু সঙ্গ ছাড়ল না।

কত বুঝালাম। কত বললাম। তোর এই হাড়-জিরজিরে চেহারা, তোকে নেবে কেন? যুদ্ধে কি করবি তুই?

দুগ্‌গা বলে, কত কাজ আছে সেখানে। চাকর চাই, রাঁধুনি চাই, সবাই তো আর বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ করবে না!

দুগ্‌গা বসে বসে আমাদের পা টিপতে লাগল।

তার জেদ দেখে আমরা আর না বলতে পারলাম না। বললাম, চল্।

রাণীগঞ্জ স্টেশনে রাত্রি বারোটার পর ট্রেন। প্রচণ্ড শীত।

নজরুল আর আমি হাওড়ার টিকিট কেটে ট্রেনের কামরায় গিয়ে উঠলাম। দেখি, দুগ্‌গা তার আগেই এসেছে। হাসতে হাসতে বিড়ি টানছে। পরণে সেই হাফ-প্যাণ্ট, সেই লাল গেঞ্জি আর খবরের কাগজে জড়ানো কি-একটা জিনিস। জিজ্ঞাসা করলাম, কিরে, তোর শীত করে না?

খবরের কাগজের মোড়কটা দেখিয়ে দুগ্‌গা হাসতে হাসতে বললে, এই ছাখ'।

দেখলাম, উলের একটি সোয়েটার।

—এ তুই কোথায় পেলি?

নজরুল বললে, কারও দোকান থেকে মৃগয়া করেছে হয়তো।

—কি রে, কোথায় পেলি বল্ না?

দুগ্‌গা কোনও কথা বলে না, শুধু দাঁত বের করে হাসে।

—কেউ দিয়েছে?

মাথাটা একটু কাত্ করে বললে, হ্যাঁ।

—কে দিয়েছে ?

আর কথা নেই। আবার চুপ!

হঠাৎ মতির মা'র কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। বললাম মতির মা দিয়েছে ?

তুগ্‌গা বললে, হ্যাঁ। বলেই সে ট্রেনের জানলার ধারে গিয়ে বসলো।

ট্রেন তখন ছেড়ে দিয়েছে। দেখলাম, সে জানলার বাইরে তাকিয়ে কি যেন দেখছে। আমরাও দেখলাম। দেখলাম, সেই দুরন্ত শীতের রাত্রে প্ল্যাটফর্মের একটেরে একটা আলোর নীচে দাঁড়িয়ে আছে মতির মা।

আমরাও ঝুঁকে পড়লাম জানলার পথে। হাত নেড়ে মতির মাকে জানালাম, আমরা চলে যাচ্ছি।

গাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে এলো। বেশিক্ষণ দেখতে পেলাম না।

—ছি ছি মতির মা এসেছে, আগে বলতে হয়!

নজরুল জিজ্ঞাসা করলে, হাঁরে তুগ্‌গা, মতির মা তোকে এত ভালবাসে, ও কি তোর কেউ হয় ?

তুগ্‌গা তার সেই বড় বড় চোখ দুটি তুলে একবার নজরুলের, একবার আমার মুখের দিকে তাকালে, তারপর বললে, আমার মা।

অবাক হয়ে গেলাম কথাটা শুনে।

নজরুল বললে, মতি তোর বোন ?

তুগ্‌গা বললে, হ্যাঁ। সায়েবের মেয়ে।

বললাম, কই এ-কথা তো আগে বলিসনি ?

তুগ্‌গার গলাটা ধরে এলো। অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, বারণ ছিল।

যা আমরা কোনোদিন দেখিনি, সেদিন তাই দেখলাম। দেখলাম, তুগ্‌গার দু' চোখ বেয়ে দর দর করে জল গড়াচ্ছে।

চার

কড়িকাঠের ফাঁকে বাসা বেঁধেছিল একটি চড়ুই পাখি। তারই একটি ছোট্ট বাচ্চা একদিন উড়তে গিয়ে পড়ে গেল নীচে।

আহা, বেচারা! উড়ে পালাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না, খানিকটা গিয়েই আবার বসে পড়ল। সবে তখন সে উড়তে শিখছে।

আমরা—যে ক'জন ছিলাম সেখানে, তখন কতই-বা আমাদের বয়স! আমরাও তখন ছোট।

যে-পাখি ধরা দেয় না, ধরতে গেলে উড়ে পালায়, সেই পাখি নিজে এসে ধরা দিয়েছে। এইতেই আনন্দ।

আমাদের ভিতর একজন ছুটে গিয়ে পাখিটাকে ধরে ফেললে। একজন আনলে লম্বা খানিকটা সুতো। সুতো বাঁধা হলো পাখিটার পায়ে।

তারপর চলতে লাগল খেলা।

পাখিটা চেষ্টা করছে উড়ে পালাবার। বেশিদূর যেতে পারছে না। পায়ে টান পড়তেই বসে পড়ছে।

ওদিকে মাথার উপরে পাখিদের জগতে তখন হুলুস্থুল পড়ে গেছে। মা-পাখিটা চীৎকার করছে। উড়ে উড়ে একবার এখানে বসছে, একবার ওখানে বসছে। ভাষা বুঝি না, তবু মনে হচ্ছে—কি যেন সে বলছে আমাদের। আরও অনেকগুলো চড়ুই পাখি জুটেছে তার সঙ্গে।

নজরুল বললে, ওকে ছেড়ে দাও।

—হ্যাঁ ছেড়ে দিই, আর কাগে ঠুকরে ঠুকরে ওকে মেরে ফেলুক।

কে যেন বললে, ওকে ওইখানে তুলে দাও!

—বেশ বলেছ! তুলে দিই, আবার পড়ে যাক। এবার পড়লে ও মরে যাবে কিন্তু।

তাছাড়া কড়িকাঠ অনেক উঁচুতে। নাগাল পাওয়া মুশকিল।

নজরুল কখন বেরিয়ে গিয়েছিল বুঝতে পারিনি। খানিক পরে দেখি, সে একটা মই কাঁধে নিয়ে ফিরে আসছে।

পাখিটা তখন আর উড়ছে না। এক জায়গায় বসে বসে থর থর করে কাঁপছে। ভয়ে বোধ হয় আধমরা হয়ে গেছে।

সেই আধমরা পাখির বাচ্চাটিকে তুলে দেওয়া হলো তার মায়ের কাছে। নজরুলই তুলে দিলে।

ভাল কাজের একটা মজা আছে। যখন কেউ করে না তো করে না, আবার যখন কেউ করে, তখন মানুষের মাথা সেখানে আপনা থেকেই হেঁট হয়ে যায়।

আমার খুব ভাল লাগল। সেইদিনই রাত্রে আমি একটি কবিতা লিখে ফেললাম।

নজরুলকে শোনাতে গিয়ে দেখি, সে-ও লিখেছে একটা। কবিতা লেখেনি, লিখেছে কথিকা। আজকালকার দিন হলে হয়ত বলতাম গদ্য কবিতা।

বাগানের বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে আছি দু'জনে। আমি বলছি—তার লেখাটা ভাল হয়েছে, সে বলছে, আমারটা।

মীমাংসা কিছুতেই হচ্ছে না, হঠাৎ পঞ্চু এসে মীমাংসা করে দিলে। কখন যে সে আমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারিনি। তার গলার আওয়াজ পেয়ে চমকে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে আর বলছে—কোনটাই কিছু হয়নি।

জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি শুনেছ?

পঞ্চু বললে, শুনেছি। ভারি তো একটা চড়ুই পাখি! আমাদের দর-দালানে ওরকম হাজার-দু'হাজার আছে।

পঞ্চুর এইরকম বুদ্ধি চিরকাল। এক ক্লাশেই পড়তাম, দু'বছর প্রমোশন পায়নি। এখন সে আমাদের দু'ক্লাশ নীচে।

সেজন্য তার দুঃখ নেই। তার দুঃখ শুধু দুটি পায়ের জন্যে। পা দুটি তার জন্মাবধি বাঁকা। ধনুকের মত বাঁকা সেই পা দুটি

ঢাকা দেবার অনেক চেষ্টাই সে করেছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি।

ঢিলে পাৎলুন তৈরি করিয়েছে, ট্রাউজার পরেছে, কখনও-বা পাৎলুনের ওপর পা পর্যন্ত আলখেল্লা চড়িয়েছে, কতরকমের কত কিম্ভূতকিমাকার পোশাকে পা দুটি ঢাকবার চেষ্টা করেছে সে।

লোকজন সব হাঁ করে তাকিয়ে দেখেছে। কেউ-বা হেসেছে। কেউ-বা ডেকে জিজ্ঞাসা করেছে। ওরকম পোশাক কেন হে?

পঞ্চু জবাব দেয়নি।

—লাটসাহেবের মেজাজ ছ্যাখো!

সেই থেকে তার নামই হয়ে গেছে—পঞ্চু-লাট।

অনেকে তাকে পঞ্চু-লাট বলে ডাকে। পঞ্চু গ্রাহ্যই করে না। হয় জবাব দেয় না, নয়তো হাসে।

আমরা অবশ্য তাকে পঞ্চু বলেই ডাকি। আমাদের সঙ্গে তার সম্বন্ধই আলাদা।

বড়লোক জ্যেঠামশাই-এর পোষ্যপুত্র। ইস্কুলের পড়া পরে না, কিন্তু পাব্লিক-লাইব্রেরীর নভেলগুলো সব প্রায় শেষ করে ফেলেছে। প্রতি মাসে দেখি কলকাতা থেকে দীনেন রায়ের ডিটেক্‌টিভ বই-এর ভি-পি আসছে তার নামে।

পঞ্চু সেদিন বাগান থেকে আমাদের তুলে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। পাশেই বাড়ি। দোতলা বাড়ির দক্ষিণদিকের একখানি ঘরে সে থাকে। ঘরখানি নিজের মনের মত করে সাজিয়েছে সে। দেয়ালে পঞ্চম জর্জ, সপ্তম এডওয়ার্ড, থেকে আরম্ভ করে তখনকার দিনের কয়েকজন লাট-বেলাটের ছবি টাঙানো। মেঝেয় কার্পেট পাতা, তার উপর কয়েকটি চেয়ার।

ঘরে ঢুকতেই আমাদের বসতে বলে পঞ্চু চেঁচিয়ে বললে, তিন পেয়ালা চা।

বলেই সে নিজের গদি-আঁটা চেয়ারটিতে গিয়ে বসল। সুমুখে অনেকগুলি ড্রয়ার-দেওয়া একটি টেবিল। টেবিলের উপর ডিটেকটিভ নভেলের গাদা।

ড্রয়ার থেকে বিলেতি কোম্পানীর বিস্কুটের টিন বের করে পঞ্চু বললে, নাও, খাও।

নজরুল বললে, তার আগে তুমি সেই জিনিসটা কবে আনাচ্ছ তাই বল।

পঞ্চু বললে, তার আগে আমার একটা জিনিস আসছে, সেইটে আসুক, তারপর—।

কিছুই বুঝলাম না। নজরুলই-বা কি বলছে, পঞ্চুই-বা কি বলছে বুঝতে না পেরে আমি ঘন ঘন এর ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম।

—কি জিনিস?

নজরুল বলতে চায় না। ফিক্ ফিক্ করে হাসে।

পঞ্চু বলে, কাল চল আমার সঙ্গে পোস্টাপিসে। নিজের চোখেই দেখতে পাবে।

কলকাতা থেকে ভি-পি পার্সেলে জিনিসপত্র আনানো—জানি পঞ্চুর এ একটা শখ। পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন দেখে দেখে কত জিনিস যে সে আনিয়েছে তার অন্ত নেই।

আমার দাদামশাই-এর নামে দুটো বড় বড় ইংরেজি ক্যাটালগ্ এসেছিল কলকাতা থেকে। একটার উপরে লেখা, 'হোয়াইটওয়ে লেড্‌লো', আর-একটার ওপর 'আর্মিনেভি স্টোর্স'। বই দুটো পড়েই থাকতো ঘরের এক কোণে, কেউ কোনদিন উল্টেও দেখতো না। আমি একদিন দেখতে গিয়ে আর ছাড়তে পারলাম না। চকচকে পুরু কাগজে ছাপা, পাতায় পাতায় রং-বেরঙের ছবি। ছবি দেখবার জন্যে নিয়ে এলাম বইদুটো।

সেই ক্যাটালগ্ দুটি আমি দিয়েছি পঞ্চুকে।

বলেছি, এই নাও, এবার সায়েবদের দোকান থেকে জিনিসপত্র আনাও।

বইদুটো পেয়ে পঞ্চুর আনন্দ যেন আর ধরে না!

সেইদিনই সে তার পঞ্জিকাটা দূরে সরিয়ে রেখে বললে, বাঃ, এই তো আমি চাইছিলাম।

ওই-সব সাহেবদের দোকানে পঞ্চু-লাটের কিছু অর্ডার গেছে কিনা তাই-বা কে জানে!

পরের দিন ইস্কুলের ছুটির পর যেই পথে বেরিয়েছি, পঞ্চু হাসতে হাসতে আমার কাছে এগিয়ে এলো। বললে, চল।

বাড়ি যেতে হলে একই রাস্তায় যেতে হবে দু'জনকে। এক রাস্তা ধরেই যাচ্ছি, জিজ্ঞাসা করলাম, নজরুল কি আনতে বলেছে কই বললে না তো?

তখনও বললে না। মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল।

পথের ধারেই পোস্টাপিস। পঞ্চু বললে, এস, এসেছে কিনা দেখেই যাই।

পোস্টাপিসে যেতেই আমাদের পাড়ার বুড়ো পিওন পঞ্চুকে দেখে এগিয়ে এলো। বললে, পার্সেল এসেছে। ছাব্বিশ টাকা ন' আনা।

পঞ্চু তখন পকেটে হাত দিয়েছে। পিওন বললে, নিয়ে যেতে পারবেন? মস্ত বড় বাক্স।

—তা হোক, তুমি নিয়ে এস।

পঞ্চু তার পকেট থেকে টাকা বের করে গুণে গুণে সাতাশটা টাকা তার হাতে দিয়ে বললে, খুচরো সাত আনা আর ফেরত দিতে হবে না। তোমার বখশিস।

পোস্টাপিসের ভিতর থেকে লম্বা একটা কেরোসিন-কাঠের বাক্স এনে দিয়ে পিওন জিজ্ঞাসা করলে, কি এটা?

পঞ্চু বললে, বন্দুক।

বাক্সটা চট দিয়ে মোড়া। তার ওপর কাগজের লেবেল। বড় বড় ইংরেজিতে ছাপা হোয়াইটওয়েলেড্ ল এণ্ড কোং।

—আমার দেওয়া ক্যাটালগের সদ্ব্যবহার করেছ তাহলে?

পঞ্চু বললে, যার নামে এসেছে পার্সেলটা, তার নামটা পড়ে ছাখো!

পড়তে গিয়ে হেসে ফেললাম। লেখা আছে—রায়বাহাদুর পঞ্চানন ঘোষ।

—এ আবার কি পাগলামি করেছ?

পঞ্চানন বললে, পাগলামি নয়। রায়বাহাদুর না লিখলে এইরকম খাতির করে পাঠাত ভেবেছ? অর্ধেক টাকা অগ্রিম

মনিঅর্ডার করে পাঠাতে লিখতো। এইবার আমার নামে ওরা ক্যাটালগ্ পাঠাবে দেখো।

বললাম, পার্সেলটা খোলো, দেখি কেমন বন্দুক।

পঞ্চু বললে, না। নজরুলকে ডাকব, ডেকে ওর সামনে খুলব।

এতক্ষণে বুঝলাম, বন্দুকের শখটা কার।

আমাদের হাতে বইখাতা। অত বড় কাঠের বাক্সটা বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না। পঞ্চু একটা কুলি ডাকলে।

রাস্তায় যেতে যেতে বললাম, বন্দুকের লাইসেন্স করতে হবে না?

পঞ্চু কানে-কানে বললে, চুপ। এয়ারগান।

বরকত্ আলীর ছেলেকে একদিন এয়ারগান দিয়ে পাখি মারতে দেখেছিলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম লাইসেন্সের কথা। সে বলেছিল, বছরে চার আনা করে দিতে হয়।

—এটাও তো সেই এয়ারগান?

পঞ্চু বললে, না, সেটা এর চেয়ে ভাল।

নজরুলকে ডাকতে হলো না। সে নিজেই এলো। পার্সেলের ওপর পঞ্চুর নামের আগে রায়বাহাদুর দেখে খুব একচোট হেসে নিলে, তারপর চললো পার্সেল খোলার পালা। ছুরি এলো, কাটারি এলো, রান্নাঘর থেকে সাঁড়াশি এলো। ছুরি দিয়ে চট্টা কাটছিল নজরুল, পঞ্চু হাঁ হাঁ করে নিষেধ করলে। রায়বাহাদুর-লেখা কাগজটা তার চাই। যত্ন করে রেখে দেবে।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো। সযত্নে পার্সেলটি খুলে চকচকে বন্দুকটি দেখে আমাদের আনন্দের আর সীমা রইল না। বন্দুকের সঙ্গে ছিল কাগজের একটি বাক্সে এক হাজার ছোট ছোট গোল গোল ছড়্রা গুলি।

কিন্তু কেমন করে বন্দুকে গুলি ভরতে হয়, কেমন করে ছুঁড়তে হয়—নজরুলও জানে না, পঞ্চুও জানে না। আমার শরণাপন্ন হতে হলো তাদের।

আমি যখন আরও ছোট, তখন আমার একটা ছোট এয়ারগান

ছিল। কিন্তু গুলি ভরতে গিয়ে দেখি, এটা সেরকম নয়। না হলেও বুঝে নিতে দেরি হলো না।

ইস্কুল থেকে এসে অবধি পঞ্চু এখনও কিছু মুখে দেয়নি, জ্যেঠাইমা অনেকক্ষণ থেকে ডাকাডাকি করছেন। যতবার তিনি ডাকছেন পঞ্চু ততবার চীৎকার করে তাঁকে ধমক দিচ্ছে। —'দেখতে পাচ্ছ না কিরকম কাজে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছি!'

এদিকে বেলা পড়ে আসছে। সন্ধ্যে নামতে বেশি দেরি নেই। শিকারে বেরুতে হলে তখনই যাওয়া দরকার। খাওয়া রইল পড়ে। পঞ্চুর সঙ্গে আমরাও বেরিয়ে পড়লাম।

পঞ্চু কিন্তু বন্দুকটা কাউকে ছুঁতে দেবে না।

এমন ভঙ্গী করে বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে সে এগিয়ে চললো—যেন কত বড় শিকারী।

আমরা যাচ্ছিলাম তার পিছু পিছু।

বন্দুকটা একবার চালাতে দেবে এই লোভে এমনি করে তার পিছু-পিছু যাওয়াটা নজরুল কেমন যেন পছন্দ করছিল না। তার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। বললাম, পঞ্চু পাখি মারুক, চল আমরা চলে যাই।

চলে আমরা সত্যিই যাচ্ছিলাম, কিন্তু পঞ্চুই যেতে দিলে না। পিছন ফিরে দেখলে, আমরা অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছি। বললে, এসো দেখে যাও।

অর্থাৎ কেমন করে সে বন্দুক ছুঁড়ছে ছাখো। দেখে নয়ন সার্থক কর।—কেউ যদি নাই দেখলে তো এত টাকা খরচ করে বন্দুক সে আনলে কিসের জন্যে?

কাছে যেতেই পঞ্চু বললে, কি মারি বল দেখি?

যেন মারতে সে সবই পারে, শুধু আমাদের বলার অপেক্ষা!

পাখিদের তখন ঘরে ফেরবার সময়। চোখের সামনে কত রকমের কত পাখি। বললাম, মারো না একটা!

পঞ্চু ফুটফাট করে বারকতক চালালে বন্দুকটা। পাখি মরা দূরে থাক, কেউ একটু নড়েও বসল না।

বললাম, পাখি ওতে মরে না।

পঞ্চু বললে, নিশ্চয় মরে। দু'একদিন প্র্যাক্‌টিস করতে করতেই দেখবে ঠিক লেগে যাবে।

—লাগলেও মরবে না। সে বন্দুকের দাম বেশি।

পঞ্চু বললে, সেই দামী বন্দুকটাই ওরা আমাকে পাঠিয়েছে।

—কেন?

পঞ্চু বললে, আমি রায়বাহাদুর যে! আমাকে খাতির করেছে।

এই বলে সে নিজেও হাসতে লাগল। আমরাও হাসতে লাগলাম।

পঞ্চুর তখন জেদ চেপে গেছে। প্রাণপণে একটার পর একটা এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে লাগল। যতক্ষণ না হাত ভেরে গেল ততক্ষণ চললো তার এই অব্যর্থ সন্ধান।

আমাদেরও আসতে দিলে না, বন্দুকটাও হাতছাড়া করলে না।

বন্দুক চালাবার সাধ যখন তার মিটে গেল, কোনদিকেই তখন আর ভাল নজর চলে না। চারিদিকে নেমে এসেছে সন্ধ্যার অন্ধকার।

নজরুলের দিকে বন্দুকটা বাড়িয়ে ধরে পঞ্চু বললে, নাও চালাও।

নজরুল নিলে না বন্দুকটা। বললে, এখন আর নজর চলবে না। থাক।

পঞ্চু বললে, তাহলে কাল চালাবে। আজ রেখে দিইগে বন্দুকটা বেশ ভাল করে।

পঞ্চু বন্দুক রাখতে গেল, আমরাও চলে গেলাম সেখান থেকে। নজরুলের মুখখানা গম্ভীর। কথা বলছে না। মনে হচ্ছে যেন খুব ইচ্ছে ছিল বন্দুক চালাবার। চালাতে না পেয়ে মনটা ভারি হয়ে উঠেছে।

আমি একটা বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম পঞ্জিকায়—মাত্র পনেরো টাকায় বায়োস্কোপের চলন্ত ছবির মেশিন। বাড়ির দেয়ালের গায়ে পর্দা টাঙিয়ে মোমবাতি দিয়ে বায়োস্কোপের ছবি দেখা যায়। পঞ্চুকে আমি অনেকদিন থেকে সেই মেশিনটা আনাবার কথা

বলেছিলাম। মাঝখান থেকে নজরুল দিলে সব মাটি করে! সায়েবদের দোকানের ক্যাটালগ এনে দিলাম, তাইতে বন্দুকের ছবি দেখে নজরুল তাকে বন্দুক আনাবার কথা বলতেই সে বন্দুক আনালে। তার চেয়ে পনেরোটি টাকা খরচ করে সিনেমার মেশিনটা যদি আনাতো, এতক্ষণ সবাই মিলে আমরা একসঙ্গে বসে বসে বায়োস্কোপের চলন্ত ছবি দেখতাম।

বললাম, তোমরাও যেমন! আনাবার মত আর জিনিস পেলে না! বন্দুক নিয়ে কি হবে?

নজরুল বললে, ইংরেজদের তাড়াতে হবে এদেশ থেকে।

—ইংরেজদের তাড়াতে হবে?

হেসেই ফেললাম কথাটা শুনে। বললাম—ইংরেজ তাড়াবে ওই এয়ারগান দিয়ে?

নজরুল বললে, ওই এয়ারগান দিয়ে হাতের নিশানটা ঠিক করে নেবো ভেবেছিলাম।

শেষ পর্যন্ত হলোও তাই।

তার পরের দিনই দেখা গেল, বন্দুক চালাবার শখ পঞ্চুর মিটে গেছে।

ইস্কুলের ছুটির পর যাচ্ছিলাম নজরুলের বোর্ডিং-এ, পথে পড়ল পঞ্চুর বাড়ি, ভাবলাম দেখেই যাই।

দেখলাম, পঞ্চু বাড়িতে নেই। জ্যেঠাইমা বললেন, না বাবা আজ আর সে ইস্কুলে যায়নি। সারাদিন শুধু চড়ুই পাখি মেরেছে।

—মেরেছে? ক'টা মেরেছে, কই দেখি।

জ্যেঠাইমা বললেন, মেরেছে নাকি? মরেনি একটাও। আমিই শুধু—এই ভ্যাখো, মরতে মরতে বেঁচে গেছি।

এই বলে জ্যেঠাইমা তাঁর বাঁহাতটা দেখালেন। দেখলাম কনুই-এর কাছে অনেকখানি চুন লাগিয়েছেন।

বললেন, ওইখানে দাঁড়িয়েছিলাম, ফট্ করে এসে লাগল।

—খুব লেগেছে বলুন। কোথায় সে?

জ্যেঠাইমা বললেন, আমার বকুনি খেয়ে বন্দুক হাতে নিয়েই পালিয়েছে।

খবরটা নজরুলকে দেবার জন্যে তার বোর্ডিং-এ গিয়ে দেখি পঞ্চু নেই। নজরুলের খাটের ওপর দেখলাম পঞ্চুর বন্দুকটা পড়ে রয়েছে।

আবদুল কুয়োর কাছে বসে কাপড়ে সাবান দিচ্ছিল, বললে, দুখু মিঞা এখনও ইস্কুল থেকে ফেরেনি।

জিজ্ঞাসা করলাম, বন্দুকটা কে রেখে গেল ?

আবদুল বললে, পাঁচু-লাট।

—কিছু বলে গেছে ?

আবদুল বললে, না, অমনি রেখে দিয়ে চলে গেল।

নজরুলের খাটের পাশেই জানলা। কাঠের গরাদে-দেওয়া সেই জানলার ফাঁকে বন্দুকের নলটা রেখে ফটাস্ ফটাস্ করে চালাচ্ছি, এমন সময় নজরুল এলো ইস্কুল থেকে। বন্দুকটা দেখেই বলে উঠল, নিয়ে এসেছ ?

বললাম, না। পঞ্চু দিয়ে গেছে।

নজরুল বললে, বুঝতে পেরেছে বোধহয়, আমি রাগ করেছি।

বললাম, না। তুমি রাগ করলে তো ওর ভারি বয়েই গেল।

তাহলে দিয়ে গেল কেন ?

বললাম, দু'দিনেই ওর শখ মিটে গেছে।

বইখাতা রেখেই নজরুল বললে, চল।

—কিছু খাবে না ?

—না, দেরি হয়ে যাবে।

বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। গেলাম নির্জন কবরখানায়।

শহরের একটেরে ক্রিশ্চানদের কবরখানা। ওর ত্রিসীমানায় লোকজন কেউ হাঁটে না। গাছও যত, পাখিও তত।

বন্দুকটা নজরুলের হাতে দিয়ে বললাম, মারো এইবার যত পারো।

কেমন করে চালাতে হয় শিখিয়ে দেবার প্রয়োজন হলো না।

কিন্তু পাখি সে কিছুতেই মারবে না। মরুক না মরুক গায়ে তো লাগতো!

অথচ নজরুল সে রাস্তা মাড়ালে না। গোরস্থানের একদিকে সারি সারি কয়েকটি ইট-বাঁধানো বেদীই হলো তার লক্ষ্য। তার ভেতর একটি বেদী হলে বড়লাট, একটি হলো ছোটলাট, একটি হলো ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, আর একটি হলো এস্‌-ডি-ও। তারপর একের পর এক চলতে লাগল তাদের ওপর আক্রমণ।

ইট দিয়ে বাঁধানো চুন-কাম করা বড় বড় বেদী। বেশী দূরেও নয়, মারতে গেলে পাখির মত উড়েও পালায় না। কাজেই হাতের তিকের বিশেষ প্রয়োজন হলো না। গোল গোল সীসের গুলি এয়ারগানের নলের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে ফটাস্‌ ফটাস্‌ করে লাগল গিয়ে দেশের শত্রু ইংরেজদের গায়ে।

একটা গুলি লাগে, আর নজরুলের সে কী উল্লাস!

নজরুলকে তখন বলেছিলাম, আমার আজও মনে আছে—'ওরা কি দোষ করলে বল তো? বড়লাট, ছোটলাট—ওরা তো চাকরি করে, ওরা কর্মচারী।'

নজরুল বলেছিল, না। ওরা ইংরাজের প্রতিনিধি। ইংরেজ মাত্রেই আমাদের শত্রু। ওরা আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাক

—নইলে তুমি ওদের মেরে তাড়াবে?

—চেষ্টা করব। প্রাণের ভয়ে এদেশে কেউ আসতে চাইবে না।

এমনি করে পঞ্চুর এয়ারগান নিয়ে চলতে লাগল আমাদের ইংরেজ মারার খেলা।

গুলি ফুরিয়ে গেলেই পঞ্চুর কাছে যাই, আবার কতকগুলো ছড়্‌রা নিয়ে আসি চেয়ে।

ভয় হয় এবার বুঝি সে বন্দুকটা চাইবে। কিন্তু চাওয়া দূরে থাক, বন্দুকের নামও সে করে না কোনোদিন। নজরুলের বিছানার তলায় বন্দুকটা লুকোনো থাকে। বিকেলে রোজ আমরা বন্দুক হাতে নিয়ে আমাদের বাগানে যাই। কেমন যেন নেশা ধরে গেছে।

পঞ্চুর কাছে সেদিন ছড়্‌রা চাইতে গিয়ে দেখি, মোটা একটা বই থেকে পঞ্চু কাঁচি দিয়ে কি যেন কাটছে।

কাছে গিয়ে দেখলাম সম্রাট পঞ্চম জর্জের একটি রঙিন ছবি।

কি হবে জিজ্ঞাসা করতেই বললে, খুব ভাল করে বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙাবো।

পঞ্চম জর্জের আর একখানি ছবি ছিল দেয়ালে টাঙানো। বললাম, ওই তো রয়েছে একখানা, আবার কেন?

পঞ্চু বললে, এই ছবিখানা ওর চেয়ে অনেক ভাল। আচ্ছা, তুমিই বল তো দুখু মিঞা!

ছবিখানা না দেখেই দুখু মিঞা বললে, খুব ভাল। কিন্তু সম্রাটের ওপর তোমার এত ভক্তি কেন বল দেখি?

পঞ্চু বললে, বা-রে, এত বড় একটা মানুষ, সারা পৃথিবীর মধ্যে ওঁর রাজত্ব কত জানো?

এই বলে সে হুড় হুড় করে ইংরেজ-অধিকৃত দেশগুলির নাম একটির পর একটি মুখস্থ বলে যেতে লাগল। সে-সব দেশ কোথায়, তার শাসন-ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদ, সেখানকার রাজপুরুষদের বেতন, চাকরির মেয়াদ—এ-সব কথা পঞ্চু যখন নির্ভুলভাবে বলে যায়, ইস্কুলে সে যে ভাল ছাত্র নয়—পরীক্ষায় সে যে আজ দু'বছর পাশ করতে পারেনি, সেকথা তখন মনেই হয় না।

নজরুল অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। পঞ্চুর কথা শেষ হতেই বললে, তোমার বন্দুকটা আমি কাল দিয়ে যাব।

পঞ্চু বললে, কে চাইছে? ও-বন্দুক আমি আর ছোঁব না প্রতিজ্ঞা করেছি।

নজরুল হেসে উঠল।—শখ মিটে গেল?

পঞ্চু বললে, বন্দুকের শখ আমার তো নয়। তোমার।

আমি বললাম, বেশ তাহলে বন্দুকটা নজরুলকে দিয়ে দাও।

পঞ্চু বললে, দিয়ে তো দিয়েছি।

নজরুল বললে, ভাল। এখন কিছু ছড়্রা দাও তো! ফুরিয়ে গেছে।

পঞ্চু তার ড্রয়ার টেনে ছড়্রার পুরনো প্যাকেটটা দিয়ে দিলে।

আমরা উঠে আসছিলাম, পঞ্চুর জ্যেঠাইমা আমাদের জন্য মুড়ি আর চা নিয়ে এলেন।

জ্যেঠাইমাকে দেখেই তাঁর হাতের দিকে আমার নজর চলে গেল। সেদিন পঞ্চুর গুলি খেয়ে হাতে খানিকটা চুন লেপেছিলেন দেখে গিয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, হাতের বেদনা সেরে গেছে?

জ্যেঠাইমা বললেন, হ্যাঁ বাবা।

কথাটা পঞ্চু শুনতে পেয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলে, তুমি জানো তাহলে?

বললাম, জানি।

পঞ্চু বললে, সেইজন্যেই প্রতিজ্ঞা করেছি বন্দুক আমি আর ছোঁব না।

ক্রিশ্চানদের গোরস্থান ছেড়ে দিয়ে আমরা তখন এসেছি আমাদের বাগানে। বাগানের পশ্চিমদিকের প্রাচীরের কোলে কোলে সারি সারি পেঁপে গাছে তখন বড় বড় পেঁপে ধরেছে।

বন্দুকে হাত-বশ করতে হলে বড় বড় পেঁপে হচ্ছে সবচেয়ে ভাল। সীসের ছড়্‌রা পেঁপের গায়ে প্যাক্‌ করে বসে যায়। গুলি ঠিক লাগল কিনা বোঝবার ভারি সুবিধে।

প্রথম প্রথম খুব অসুবিধা গেছে নজরুলের।

গোরস্থানের বেদীটা ছিল বড়, বন্দুকটা কোনোরকমে চালিয়ে দিলেই যেখানে হোক লেগে যেতো, কিন্তু পেঁপে তার চেয়ে ছোট জিনিস, হাতের নিশান পাকা না হলে পেঁপের গায়ে গুলি লাগানো শক্ত।

তিনদিন লাগল নজরুলের হাত ঠিক করতে।

প্রথম যেদিন গুলি লাগল পেঁপের গায়ে, নজরুলের সেদিন সে কী আনন্দ!

সেই পেঁপে গাছটাই হলো বড়লাট।

তার পরের গাছটা ছোটলাট, তার পরেরটা ম্যাজিস্ট্রেট, তারপর এস-ডি-ও, তারপর থানার বড় দারোগা, ছোট দারোগা ইত্যাদি ইত্যাদি—

বলেছিলাম, না না থানার দারোগাদের মেরো না। ওরা তো ইংরেজ নয়, ওরা বাঙালী।

নজরুল বলেছিল, হোক বাঙালী! ওরা বিশ্বাসঘাতক। একদিনে সব চাকরি ছেড়ে দিয়ে ইংরেজের রাজত্বটা অচল করে দিয়ে চলে যাক না!

এমনি-সব কথা, আর বন্দুক দিয়ে ইংরেজকে মেরে তাড়াবার খেলা আমাদের জোর চলতে লাগল কয়েকদিন ধরে।

ছড়্রা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, ওদিকে বায়োস্কোপের কথাটাও পঞ্চুকে বলা হচ্ছে না, অথচ সে থাকে আমাদের বাগানের ঠিক পাশেই। এক ইস্কুলে পড়ি, অথচ দেখা হয় না।

নজরুলকে সেদিন বললাম, চল যাই পঞ্চুর কাছে। আরও কিছু ছড়্রা নিয়ে আসি।

নজরুল বললে, দাঁড়াও, ওর পঞ্চম জর্জকে মারি আগে।

বললাম, না না ও-বেচারা অনেক দূরে থাকে, ওর সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ?

নজরুল বললে, ওই তো পালের ধাড়ি। ও তো ফট করে একদিন সবাইকে ডেকে বলে দিতে পারে, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিয়ে দিলাম। ব্যাস্, একদিনেই আমরা স্বাধীন।

—ঠিক বলেছ। তাহলে লাগাও—ওকে আজই শেষ করে দাও।

কিন্তু না, অত সহজে ওকে মারা চলবে না।

কিছুক্ষণ আগেই আমি মেরেছি পুলিশ-সাহেবকে। মেরেছি অনেক দূর থেকে, প্রাচীরের আড়ালে দাঁড়িয়ে, খুব সাবধানে। দূরের একটা গাছের সবচেয়ে ছোট একটি পেঁপে হয়েছিল পুলিশ-সাহেব।

নজরুলকেও তেমনি করে মারতে হবে। সবচেয়ে দূরে যে পেঁপে গাছটা রয়েছে, সেই গাছের বড় একটি পেঁপের গায়ে লাগাতে হবে পরের পর দুটো গুলি।

পেঁপেটি দেখিয়ে দিলাম। হাঁটু গেড়ে বসলো নজরুল। কায়দা করে ধরলে বন্দুকটা। এক চোখ বন্ধ করে নিশান করলে। তারপর—

ব্যাস্! দিলে লাগিয়ে প্রথম গুলিটাই!

চললো আমাদের ধেই ধেই করে নৃত্য!

নজরুল চুপ করে থাকবার ছেলে নয়। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল—খতম! পঞ্চুর পঞ্চম জর্জ খতম!

—এত আনন্দ কিসের?

তাকিয়ে দেখি, হাসতে হাসতে পঞ্চু এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

একটা চিমটি কেটে নজরুলকে চেঁচাতে বারণ করলাম। রাজভক্ত রায়বাহাদুর আসছে! চুপ কর।

চুপ করা দূরে থাক, হাত বাড়িয়ে পঞ্চুর গলাটা জড়িয়ে ধরলে নজরুল। তারপর লাফাতে লাফাতে বলে দিলে, দিলাম তোমার পঞ্চম জর্জকে খতম করে।

কথার মানেটা বুঝতে পারলে না পঞ্চু। বোকার মত সেও নজরুলের কোমরটা জড়িয়ে ধরে নাচতে লাগল। বেঁটে মানুষ, গলাটা তার নাগাল পেলে না।

নজরুল তাকে আরও ভাল করে বুঝিয়ে দিলে।

পেঁপে গাছগুলোর কাছে পঞ্চুকে টেনে নিয়ে গিয়ে প্রতিটি গাছের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলে। এইটি বড়লাট, এইটি ছোট লাট……

সবার শেষে বড় পেঁপে গাছটিকে দেখিয়ে বললে, এইটি তোমার পঞ্চম জর্জ।

—তারপর?

তারপর এই ভ্যাখো। এইখানে দাঁড়িয়ে তোমার বন্দুক দিয়ে—

বন্দুকটা একবার চালিয়ে নজরুল দেখিয়ে দিলে। দেখিয়ে দিলে, কেমন করে একে একে তাদের হত্যা করা হচ্ছে। এদের হত্যা না করলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে না।

নজরুলের দিকে হাত বাড়িয়ে পঞ্চু বন্দুকটা নিলে। নিয়ে বললে, কর তোমরা ভারতবর্ষ স্বাধীন। কিন্তু আমার বন্দুক দিয়ে নয়।

এই বলে পঞ্চু আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়াল না। বন্দুকটি হাতে নিয়ে সে সোজা চলে গেল তার বাড়ির দিকে।

আমি যাচ্ছিলাম পঞ্চুর কাছ থেকে বন্দুকটা চেয়ে আনতে। নজরুল আমার হাতটা চেপে ধরলে। যেতে দিলে না। বললে, না যেয়ো না।

পাঁচ

নজরুল ভাল করে কথা বলছে না। বুঝলাম তার লেগেছে খুব। পঞ্চুর কাছ থেকে বন্দুকটা আমি চেয়ে আনতে পারতাম, কিন্তু নজরুল আমাকে কিছুতেই যেতে দিলে না।

বন্দুক চালানোর একটা নেশা আছে। নেশাটা ঠিক পাখী মারার নেশা নয়। গুলীটা ঠিক জায়গায় লাগাতে পারার নেশা। নজরুল যদি কাঁচা পেঁপের গায়ে গুলী ঠিক লাগাতে না পারতো, তাহলে তার লাট-বেলাট মারার নেশা ছুটে যেতো দু'দিনেই।

পরের দিন হাতটা নিস্‌পিস্‌ করছিল আমারও। ভাবলাম, যাই একবার পঞ্চুর কাছে। গিয়ে বলি, খুব অন্যায় হয়েছে তোমার। বন্দুকটা দাও।

কিন্তু কি যে হলো সেদিন, পঞ্চুর বাড়ির দোর পর্যন্ত গিয়েও ঘরে ঢুকলাম না, সোজা চলে গেলাম নজরুলদের বোর্ডিং-এ।

গিয়ে দেখি, নিজের খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে নজরুল কি যেন লিখছে।

নজরুলকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইস্কুল যাওনি ?

কই আর গেলাম ! বলে তার লেখাটি আমার হাতের কাছে ফেলে দিয়ে বললে, নাও পড়। তোমার অন্ন মেরে দিলাম। কবিতা লিখলাম।

দেখলাম, সেদিনের সেই চড়ুই পাখীটাকে নিয়ে লেখা হয়েছে। লিখেছে—

মস্ত বড় দালান বাড়ীর উই লাগা ঐ কড়ির ফাঁকে
ছোট একটি চড়াইছানা কেঁদে কেঁদে ডাকছে মাকে।
'চুঁ চা' রবের আকুল কাঁদন যাচ্ছিল নে' বসন-বায়ে
মায়ের পরাণ—ভাবলে বুঝি দুষ্টু ছেলে নিচ্ছে ছায়ে।[১]
অমনি কাছের মাঠটি হতে ছুটলো মাতা ফড়িং মুখে
স্নেহের আকুল আশীষ-জোয়ার উথলে উঠে মায় সে বুকে !

১। ছা—মানে বাচ্চা। আমাদের ও-অঞ্চলে পশু পাখীর বাচ্চাকে বলে 'ছা'।

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে

আধ-ফুরফুরে ছা'টি,নীড়ে দেখছে মা তার আসছে উড়ে,
ভাবলে আমিই যাই না ছুটে, বসিগে মার বক্ষ জুড়ে।
হৃদয়-আবেগ রুধতে নেরে[১] উড়তে গেল অবোধ পাখী
ঝুপ করে সে গেল পড়ে—ঝরল মায়ের করুণ আঁখি!
হায়রে মায়ের স্নেহের হিয়া বিষম ব্যথায় উঠলো কেঁপে
রাখলে নাকো প্রাণের মায়া, বসল ডানায় ছা'টি ঝেঁপে।
ধরতে ছুটে ছানাটিরে ক্লাসের যত দুষ্টু ছেলে
ছুটছে পাখী প্রাণের ভয়ে ছোট দুটি ডানা তুলে।
বুঝতে নারি কি সে ভাষায় জানায় মা তার হিয়ার বেদন
বুঝে না কেউ স্কুলের ছেলে—মায়ের সে যে বুকভরা ধন।
পুরছে কেহ ছাতার ভিতর, পকেটে কেউ পুরছে হেসে,
একটি ছেলে দেখছে আঁশু চোখ দুটি তার যাচ্ছে ভেসে।
মা মরেছে বহুদিন তার ভুলে গেছে মায়ের সোহাগ
তবু গো তার মরম ছিঁড়ে উঠল বেজে করুণ বেহাগ।
মই এনে সে ছানাটিরে দিল তাহার বাসায় তুলে
ছানার দুটি সজল আঁখি করলে আশীষ পরাণ খুলে।
অবাক-নয়ান মা'টি তাহার রইলো চেয়ে পাঁচুর পানে
হৃদয়-ভরা কৃতজ্ঞতা দিল দেখা আঁখির কোণে।
পাখীর মায়ের নীরব আশীষ যে ধারাটি দিল ঢেলে
দিতে কি তার পারে কণা বিশ্বমাতার বিশ্ব মিলে!*

এমনি কবিতা লিখেও সে যদি বন্দুকের কথা ভুলে থাকে তো থাক আমি ক্রমাগত তাকে কবিতা লেখার তাড়া দিতে লাগলাম।

তিন দিন পরে দেখলাম আবার আর একটা লিখেছে।

১। নেরে—না পেরে (আঞ্চলিক)।

[*আজ থেকে প্রায় বিয়াল্লিশ বছর আগে লেখা এই কবিতাটি আমি সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম। এমনি আরও কিছু বাল্যের স্মৃতিচিহ্ন ছিল আমার কাছে। কিছু তার আছে, কিছু হারিয়েছে। এখন শুধু মনে মনে ভাবি—অনেক মূল্যবান বস্তুই তো হারিয়েছি, কোনও কিছু সঞ্চয় করে রাখা ধর্মই আমার নয়, তবু এমন কী মূল্য আমি এর মধ্যে দেখেছিলাম, যার জন্য যখের ধনের মত কয়েক টুকরো কাগজ আমি আগলে রেখেছি!]

কবিতাটির নাম দিয়েছে 'রানীর গড়'। কবিতাটি চমৎকার। আমার কাছে আছে এখনও। কোথাও ছাপা হয়নি।

তার পরে লিখেছিল 'রাজার গড়'। সেটিও অপ্রকাশিত। আছে আমার কাছে।

নজরুল যখন এমনি করে একটির পর একটি কবিতা লিখে চলেছে, তখন একদিন একটা ঘটনা ঘটলো।

ছিনু তখনও রয়েছে তাদের বোর্ডিং-এ। যে-ছিনুর কথা লিখেছি প্রথম পরিচ্ছেদে—সেই ছিনু মিঞা।

আমি গেছি তাদের বোর্ডিং-এ। দেখলাম নজরুল তার খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে, বুকের নীচে একটা বালিশ নিয়ে একমনে কি যেন লিখে চলেছে। খোলা জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে লিখছিল। আমাকে দেখতে পায়নি।

হাতের ইশারায় ছিনু আমাকে ডাকলে। কথা না বলেই বাইরে বেরিয়ে এলাম। নজরুল বুঝতেই পারলে না আমি এসেছি।

রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে ছিনু চা তৈরি করছিল, আমাকে সেইখানে নিয়ে গিয়ে বসালে। তালপাতার চাটাই-এর ওপর চেপে বসলাম। এক পেয়ালা চা আমার হাতের কাছে নামিয়ে দিয়ে বললে, খাও মিঞা-সাহেব, গরম চা খেয়ে আগে ঠাণ্ডা হও, তারপর বলছি তোমাকে কেন ডাকলাম।

বললাম, তুমি না বললেও আমি বুঝতে পেরেছি।

—কই বল দেখি কি বুঝতে পেরেছ?

বললাম, আমি বসে থাকলে ওর লেখা হবে না, তাই তুমি আমাকে ওখান থেকে সরিয়ে আনলে।

ছিনু বললে, না, তুমি বুঝতে পারোনি মিঞা-সাহেব। কাল থেকে দুখু মিঞার সঙ্গে আমার রা-কথা বন্ধ হয়ে গেছে।

সর্বনাশ! এ-ও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

যে-ছিনু নজরুলকে তার প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসে, সেই নজরুলের সঙ্গে হলো তার ঝগড়া!

হেসে বললাম, এ তোমাদের প্রেমের ঝগড়া ছিনু, এক্ষুণি দেখবো ভাব হয়ে গেছে।

ছিনু বোধ করি রাগ করলে আমার কথাটা শুনে। বললে, তুমি তো তা বলবেই। তুমিই হচ্ছ যত নষ্টের গোড়া! তুমিই তো এইটি করলে!

কথাটা তখন বুঝতে পারিনি।—'কি করলাম?'

—করলে না?

ছিনুর রাগ আমি কখনও দেখিনি। ডাঁট-ভাঙা একটা কাপে ফুঁ দিয়ে দিয়ে চা খাচ্ছিল ছিনু। কাপটা ঠক করে নামিয়ে দিয়ে সে যেন লাফিয়ে উঠলো! বললে, এ-বিছে ওকে কে শেখালে? এই যে আজ চারদিন ধরে দিনরাত মুখ গুঁজে পড়ে আছে, নাওয়া নাই, খাওয়া নাই, এসব কী বলতে পারো? বেলা ছুটোর সময় হুকুম হলো—ছিনু চা দে। তাই দিলাম। গরম চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। মুখে দিলে না। বলতে গেলাম তো বললে আবার গরম করে দে। দিলাম গরম করে। বাস্‌, তাও খেলে না। না-খেলি তো না-খেলি! বললাম, চা-টা তো আবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

বাবু মেজাজ দেখিয়ে বললে, যাকগে, তোর কি? আমার কি, আমার বয়ে গেল! এই চায়ের পাট দিলাম তুলে, এবার কি খাবি খা।

বলেই সে ঘটির জলটা উনোনে ঢালতে যাচ্ছিল। ঘটিটা কেড়ে নিলুম তার হাত থেকে।

বললে, আসল কথাটাই তো বলিনি এখনও। শোনো। পাঁচ পয়সার কোরোসিন তেল কিনি, ছু'দিন-তিনদিন চলে। কাল বিকেলে তেল কিনে লণ্ঠন ভর্তি করে দিয়েছি, আর আজ সকালে দেখি না—লণ্ঠন একেবারে শুকনো ঠন্‌ ঠন্‌ করছে। বুঝতেই পারছো—বাবু কাল সারারাত ধরে পদ্য লিখেছে। অপরাধের মধ্যে লণ্ঠনটা দেখিয়ে বলতে গেলাম—বলি ইস্কুলের পড়া তো কোনদিন এমন করে পড়তে দেখিনি, এক রাতেই এক লণ্ঠন তেল খতম! তা সে করলে কি জানো? তেড়ে আমাকে মারতে এলো। লণ্ঠনটা দিলে আমার গায়ে ছুঁড়ে! কাঁচটা ভেঙে একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

বিশ্বাস হলো না। বললাম, সেরকম রাগ তো আমি ওর কোনোদিন দেখিনি ছিনু। তুমি তেলের কথা বললে, আর নজরুল ছুঁড়ে দিলে লণ্ঠনটা?

ছিনুর মুখখানা এবার অন্যরকম হয়ে গেল। বললে, এই ছ্যাখো, তুমি আমাকে জেরা করতে আরম্ভ করলে! আমি কি মিছে কথা বলছি?

বললাম, না-না, আমি তা বলিনি। আমি বলছি, তুমি নিশ্চয় ওকে বিরক্ত করেছিলে।

ছিনু এবার হেসে ফেললে। ফিক করে হেসে বললে, তা করেছিলাম। চুল ধরে দু'বার টেনে দিয়েছিলাম, আর ওই যাতে লিখছে, ওই খাতাটা কেড়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম।

বললাম, তাহলে বেশ করেছে।

ছিনু বললে, বেশ করেছে? লণ্ঠনের কাঁচটা ভেঙে দিয়েছে, বেশ করেছে? আমি কিন্তু কাঁচ আর আনছি না! থাক ও অন্ধকারে, লিখুক কেমন করে লিখবে।

বললাম, না তুমি কাঁচ আর কেরোসিন তেল নিয়ে এসো, যাও।

পারবো না। বলে ছিনু মুখ ফিরিয়ে বসলো।

ছিনুর কথা ফুরিয়েছে ভেবে উঠে আসছিলাম সেখান থেকে। ছিনু আসতে দিলে না। বললে, যেয়ো না মিঞা-সাহেব, শোনো।

—আবার কি শুনবো?

—আসছি, দাঁড়াও।

লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে গজ গজ করতে করতে ছিনু বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। বললে, তুমি বললে তাই যাচ্ছি, নইলে যেতাম না কিছুতেই। এসো আমার সঙ্গে।

—আমি আর নাই-বা গেলাম।

ছিনু কিন্তু ছাড়লে না আমাকে। বললে, কেন মিছে লেখাটা বন্ধ করে দেবে! লিখছে লিখুক না! এসো।

সারাটা রাস্তা ছিনু বক্‌বক্‌ করতে করতে গেল।

—মাসের শেষ, পয়সাগুলি সব শেষ করেছে, হাতে একটি পয়সা নেই। এইবার ওর ইস্কুলের বইগুলি আমি একটি একটি করে বেচে দেবো।

বললাম, কেন? বই বেচবে কেন?

ছিনু বললে, কি হবে বইগুলো? ইস্কুলের বই তো ও ছোঁয় না!

বললাম, ছোঁবে, ছোঁবে। রাগ করছো কেন?

—রাগ করবো না?

ছিনু বললে, দ্যাখো মিঞা-সাহেব, দুখু মিঞার ঘরে ভাত নাই, গরীবের ছেলে, ওর বাড়িতে যে কি কষ্ট তা আমি জানি। কোনরকমে লেখাপড়া একটু যদি শিখতে পারে তো কয়লাখাদে যেমন হোক একটা চাকরিবাকরি জুটবে। ওর কি এইরকম করা সাজে? কই, তুমিই বল না!

কি আর বলবো, চুপ করেই রইলাম।

ছিনু বলে যেতে লাগলো, এমনি করে যদি ইস্কুল কামাই করে, রাজবাড়ির টাকাটি বন্ধ হতে আর কতক্ষণ! হেডমাস্টার ঘ্যাচ করে নামটি দেবে কেটে। ব্যস্, যে-দুখু মিঞা কে সেই-দুখু মিঞা! বাড়ি গিয়ে গরু চরাও, আর নাঙ্গল ধরো! ও কিন্তু তাও পারবে না, এই আমি বলে দিলাম তোমাকে, তুমি দেখে নিও!

এই বলে সে খানিক থামলো। সামনেই একটা দোকান। লণ্ঠনটা দোকানীর হাতে দিয়ে বললে, ভাল দেখে একটি কাঁচ দাও তো ভাই, বেশ পুরু দেখে। চট্ করে যাতে না ভাঙে।

বলেই সে পয়সা বের করতে করতে বললে, তোমার কি, তুমি বড় লোকের নাতি, তুমি এ-সব দুঃখুর কথা বুঝবে না।

কাঁচটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে কাঁচের দাম দিয়ে ছিনু চললো তেল আনতে। পথ চলতে চলতে আবার বললে, তুমি যদি একটি কাজ কর তো দু'দিনেই আমি ওকে জব্দ করে দিতে পারি।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি কাজ?

বলতে বোধহয় সে ইতস্তত করছিল। বললে, বলবো?

—হ্যাঁ বল।

ছিন্নু বললে, তুমি যদি দিনকতক আসা বন্ধ কর তো ওর পদ্য লেখা আমি বন্ধ করে দিই!

বুঝলাম, আমাকেই সব-কিছুর জন্য দায়ী করেছে ছিন্নু।

স্কলারশিপ পাবার মত ছেলে নজরুল। প্রতি বৎসর ফার্স্ট হয়ে প্রমোশন পায়। আর এই লেখার নেশায় মেতে যদি ইস্কুল যাওয়া বন্ধ করে তো আর-কেউ কিছু না বলুক, ছিন্নু আমাকে বলতে ছাড়বে না।

বললাম, বেশ, যাব না।

নজরুলের মঙ্গল কামনায় বলিনি। তার কবিতা লেখা বন্ধ হোক ভেবেও নয়। আজও আমার বেশ মনে আছে—বলেছিলাম ছিন্নুর উপর রাগ করে।

লণ্ঠনে তেল নিয়ে বোর্ডিং-এ ফেরার পথে ছিন্নুর সঙ্গে খানিকটা গিয়ে হঠাৎ একসময় দাঁড়িয়ে পড়লাম। ছিন্নু বললে, দাঁড়ালে কেন, এসো।

বললাম, থাক আর যাব না। তুমি যাও।

ছিন্নু বোধহয় খুশীই হলো।

পাশেই খোঁয়াড়। ইটের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা খানিকটে জায়গা। যে-সব গরু-ছাগল অন্যের ক্ষেতে-বাগানে ঢুকে, গাছপালা খেয়ে দেয়, তাদের ধরে এনে এই খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তারপর গরু-ছাগলের মালিক পয়সা দিয়ে তাদের ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। সরকারী খোঁয়াড়। বছরের শেষে নিলাম-ডাকের মত 'ডাক' হয়। সেই ডাকের টাকা জমা দিয়ে একবছরের জন্য যে-লোক এই খোঁয়াড়ের ইজারা নেয়, তাকেও বসে থাকতে দেখি রাস্তার ধারে ছোট একটি ঘরে।

নজরুলের বোর্ডিং-এ যাওয়া-আসার পথে খোঁয়াড়-মুন্সির ছোট ঘরখানি রোজই আমার নজরে পড়ে, কিন্তু সেদিকে বড়-একটা তাকাই না, তাকাবার প্রয়োজন হয় না।

ছিন্নু চলে যাবার পর সেদিন দাঁড়িয়েছিলাম খোঁয়াড়-মুন্সির এই ঘরটার কাছেই। মনের অবস্থা খুব খারাপ। যে-ছিন্নু

কথায় কথায় হাসায়, সেই ছিনুই আজ আমাকে কাঁদিয়ে দিয়েছে। কি করবো, কোথায় যাব ভাবছি, এমন সময় দেখি—কান-কাটা জগা হেট্ হেট্ করতে করতে ছুটো গরু তাড়াতে তাড়াতে সেইদিকেই আসছে।

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, গরু ছুটোকে আসতে দেখে একটু সরে গেলাম। আমার দিকে নজর পড়লো জগার। জগা কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

অপ্রস্তুত হবার কারণটা বুঝলাম। সেও যে বোঝেনি তাও নয়।

গরু ছুটো সে খোঁয়াড়ে দেবার জন্যেই নিয়ে এসেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, গরু ছুটো কার-কি খেয়েছে রে জগা ?

আমার কথার জবাবই দিলে না সে। অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে চেঁচাতে লাগলো, খোঁয়াড়-মুন্সি ! খোঁয়াড়-মুন্সি !

পাতলা ছিপছিপে একজন মুসলমান-ছোকরা বেরিয়ে এলো রাস্তার ধারের সেই ছোট্ট ঘর থেকে। এসেই সে তাড়াতাড়ি তালা-দেওয়া ফটক খুলে গরু ছুটোকে আগে ঢুকিয়ে দিলে প্রাচীর-ঘেরা সেই জায়গাটায়। তারপর আবার সে তার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। কান-কাটা জগা গেল তার পিছু পিছু।

ঘরের ভেতরটা সেখান থেকে দেখা যাচ্ছিল না। একপা এগিয়ে যেতেই দেখলাম—খোঁয়াড়-মুন্সি কাগজের ওপর কি যেন লিখলে, তারপর কাঠের একটি হাত-বাক্স থেকে পয়সা বের করে জগার হাতে দিলে।

পয়সা নিয়ে জগা আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে, শ্লা ছ'গণ্ডা পয়সা দিলে মাইরি। ঝগড়া করে মা সারাদিন কিছু খায়নি। দিইগে যাই।

বলেই সে ছুটে পালালো।

মা মানে ছুতোর-বৌ। থাকে আমাদের বাড়ির পাশেই। ছুতোরদের মেয়ে যে এত সুন্দর হতে পারে জগার মাকে দেখবার আগে সে-ধারণা আমার ছিল না। কান-কাটা জগার বয়স যদি হয় পনেরো-ষোলো তো জগার মা'র বয়স বোধকরি তিরিশ-বত্রিশ।

ছোট-খাটো বেঁটে মেয়েটি, গায়ের রঙ খুব ফরসা।

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে

গ্রাম থেকে শহরে এসেছিল স্বামীর সঙ্গে। জগা তখন তার কোলে।

পাড়ার মেয়েরা দেখতে আসতো। বলতো, আহা, যেমন মা, তার তেমনি ছেলে!

ছেলের কাটা কানটি সে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করতো।

কিন্তু দেখতে যারা এসেছে, তাদের চোখ এড়ানো বড় শক্ত। বলতো, ছেলের কানে কি হয়েছিল ছুতোর-বৌ?

জগার মা সত্যি কথাই বলতো। বলতো, গ্রামে আমার শ্বশুরবাড়ি ছিল একটা জঙ্গলের ধারে, মাটির ঘর, ভাঙা দেয়াল, অবস্থা তো ভাল ছিল না! একদিন ঘুম ভাঙতেই দেখি, ছেলে নেই। খোঁজ, খোঁজ, ছেলে কোথায় গেল? জগাব বাবা বেরুলো কুড়ুল কাঁধে নিয়ে। ফিরে এলো বেলা তখন দুপুর। ছেলেটাকে পাওয়া গেছে জঙ্গলের ধারে। শেয়ালে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কানটা কাটা, সারা মুখে গায়ে কাঁচা রক্ত! যাক মরেনি ছেলেটা।

অনেক কষ্টে তাকে বাঁচিয়ে তুললাম। তার পরেই আমরা গ্রামের বাড়িঘরদোর ছেড়ে চলে এলাম এই শহরে।

কাঠের কাজ বেশ ভালই করতো জগার বাবা। দিন তাদের বেশ ভালই চলতো। ছেলেটা দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠলো। কিন্তু হলে কি হবে? লেখাপড়া শিখলে না।

ছুতোর-বৌ বলতো, ভাল কাজ হচ্ছে না কিন্তু। ছেলেকে এত আদর দিও না। ওকে লেখাপড়া শেখাও।

জগার বাবা বলতো, একটা মাত্তর ছেলে, ওকে আমি বড় মিস্ত্রি করে তুলবো তুমি দেখে নিও। খুব ভালো কাঠের কাজ শিখিয়ে দেবো।

কিন্তু মানুষ যা ভাবে সবসময় তা হয় না। জগা যখন দশ বছরের ছেলে, তখন একদিন সব শেষ হয়ে গেল। জগার বাবা গেল মরে।

অকূল পাথারে পড়ে গেল ছুতোর-বৌ।

পড়লো, কিন্তু ডুবলো না। দশ বছরের অকর্মণ্য ছেলেকে জড়িয়ে ধরে ভেসে চললো তার দিকচিহ্নহীন সংসার-সাগরে।

সেই দশ বছরের ছেলে আজ ষোলো বছরের জোয়ান! সকাল থেকে টো টো করে ঘুরে ঘুরে বেলা বারোটার সময় বাড়ি এসে বলে, মা, খেতে দাও!

মা আর কতদিন মুখ বুজে চুপ করে থাকে!

ভাতের থালা মুখের কাছে নামিয়ে দিয়ে বলে, এই শেষ! কাল থেকে আর দেবো না।

কিন্তু কালও সে তাকে না দিয়ে পারে না।

এমনি করে দিনের পর দিন পরের বাড়ি দাসীবৃত্তি করে, মুড়ি বেচে ছুতোর-বৌ তার জোয়ান ছেলের পেট ভরায় আর প্রাণপণে গালাগাল দেয়!

সে গালাগালি আমরা রোজই শুনি।

আজও বোধহয় তেমনি গালাগালি দিয়ে ছেলের ওপর অভিমান করে সে না খেয়ে পড়ে আছে। ছেলে তাই গরু খোঁয়াড়ে দিয়ে দু'আনা পয়সা রোজগার করে মায়ের রাগ ভাঙাতে গেল।

গরু দুটো কোনও অপরাধ করেনি—আমি নিজে দেখেছি। পথের ধারে ঘাস খাচ্ছিল, জগা আসছিল সেই পথ দিয়ে, গরু দুটোকে দেখে হঠাৎ তার কি খেয়াল হলো, হেট্ হেট্ করে তাদেব তাড়িয়ে নিয়ে এসে দাঁড়ালো একেবারে খোঁয়াড়ের দরজায়।

গরু ছাগলের মালিককেই জানি পয়সা দিয়ে খোঁয়াড় থেকে গরু ছাগল ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে হয়। গরু ছাগল ধরে এনে যে-লোক খোঁয়াড়ে দিয়ে যায়, সেও যে কিছু রোজগার করে সেকথা আমার জানা ছিল না।

পথের ধারে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খোঁয়াড়-মুন্সি ভাবলে বুঝি তাকে আমি কিছু বলবো। আমার দিকে তাকিয়ে বললে, এসো না ভেতরে। ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?

জগার কথাটা বলবার জন্যে এগিয়ে গেলাম। বললাম, জগা বুঝি এমনি করে গরু-ছাগল ধরে এনে খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে দেয়?

খোঁয়াড়-মুন্সির বয়স বেশি নয়। চেহারা দেখলে মুসলমান বলে চিনতে দেরি হয় না। লোকটি হাসতে হাসতে বাইরে

বেরিয়ে এলো, তারপর আমার হাতদুটো জড়িয়ে ধরে তার সেই ছোট ঘরখানির ভেতর টেনে নিয়ে গেল। টিনের একটি চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বললে, বোসো।

বসতে চাইছিলাম না, কিন্তু খোঁয়াড়-মুন্সির অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। বসতে হলো।

কাঠের একটা তক্তপোষের ওপর শতরঞ্জি পাতা রয়েছে দেখলাম। তারই ওপর সে নিজে বসলো। বসেই একটি কাগজের ঠোঙায় কয়েকটি সাজা পান আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে, খাও।

বললাম, খাই না।

—বিড়ি ?

বললাম, না।

—সিগ্রেট ?

—না।

খোঁয়াড়-মুন্সি এইবার একটি পান মুখে দিয়ে বিড়ি ধরিয়ে ভাল করে চেপে বসলো। বসেই বললে, গরু ছাগল যারা নিয়ে আসে তাদের দু-একটা পয়সা আমরা দিই।

বললাম, জগাকে দেওয়া বোধহয় আপনার অন্যায় হলো। রাস্তার ধারে গরুদুটো ঘাস খাচ্ছিল, জগা ওদের সেইখান থেকে তাড়িয়ে নিয়ে এলো আমি দেখলাম।

গরু কোত্থেকে নিয়ে এলো—মুন্সি কি তাও দেখবে ? বলতে বলতে যে-ছেলেটি বেরিয়ে এলো পাশের ঘর থেকে, তার দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ছেলেটি আমারই সঙ্গে পড়ে, আমারই সমবয়সী—সতীশ।

ছোট এই ঘরটার ভেতরে আর-একটা যে অন্ধকার খুপ্‌রি আছে তা জানতাম না। সতীশকে যে এ-অবস্থায় এখানে দেখবো তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। বড়লোক এক উকিলের ছেলে সতীশ। আমাদের ক্লাশের একজন নামকরা ভাল ছেলে।

জিজ্ঞাসা করলাম, ওখানে তুমি কি করছিলে ?

সতীশ অম্লানবদনে বলে বসলো, বিড়ি টানছিলাম।

সতীশ যে বিড়ি খায় তাও জানতাম না। অবাক হয়ে আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সতীশ ভাল করে চেপে বসলো খোঁয়াড়-মুন্সির পাশে। বললে, মুন্সি, ওকে একটা বিড়ি দাও না!

মুন্সি বললে, দিয়েছিলাম। খেলে না।

সতীশ বললে, খাও না! বেশ লাগবে। ভাল ছেলে হয়ে আর কতদিন থাকবে বাবা!

—ধেৎ!

—অমনি ধেৎ বলে ফেললে! যখনই খাবার ইচ্ছে হবে এইখানে চলে আসবে, এই ঘরে তোফা আরাম করে বসে বসে টানবে, কেউ দেখতে পাবে না, কেউ জানতেও পারবে না।

বললাম, জান না তো আমার দাদা-মশাইকে, মুখে গন্ধ পেলে মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেবে।

সতীশ বললে, দাদামশাই তোমার মুখ শুঁকতে আসবে বুঝি! যাঃ! কাছে যদি যেতেই হয় তো মুখটা চট করে ধুয়ে নেবে।

বললাম, বিড়ি টানবার জন্যেই তুমি এইখানে আসো বুঝি?

সতীশ চট করে দুহাত বাড়িয়ে খোঁয়াড়-মুন্সিকে জড়িয়ে ধরে বললে, না। খোঁয়াড়-মুন্সি এই আলী-সাহেব আমাদের বন্ধু।

বুঝলাম খোঁয়াড়-মুন্সির নাম আলী সাহেব।

আলী-সাহেব বললে, বিড়ি-সিগ্রেট নাই-বা খেলে, এখানে আসতে দোষ কি? এই দিক দিয়ে রোজই তো পেরিয়ে যাও দেখি। পঞ্চুলাটের বাড়ি যাও, মুসলমান বোর্ডিং-এ যাও।

বললাম, তাও জানো?

আলী-সাহেব বললে, সব জানি।

সতীশ বললে, দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমাকে আজ আমি একটা খুব ভাল সিগ্রেট খাইয়ে দিচ্ছি। পঞ্চু-লাট আসুক।

পঞ্চু-লাট সিগ্রেট খায় তাও জানতাম না। বললাম, পঞ্চু সিগ্রেট খায়? আসে এখানে?

সতীশ বললে, হ্যাঁ, সব চেয়ে দামী যে-সিগ্রেট, সেই সিগ্রেট খায় ও। বিড়ি খায় না। বলে, বিড়ি যারা খায় তারা ছোটলোক।

এই বলে হাসতে লাগলো তারা ছু'জনেই।

আমি ভাবছি তখন পঞ্চুর কথা। হঠাৎ যদি আসে এখানে তো দেখা হয়ে যাবে। দেখা হলেই কথা উঠবে বন্দুকের। তার চেয়ে থাক সে তার বন্দুক নিয়ে। আমি চলি।

উঠে দাঁড়াতেই সতীশ বলে উঠলো, দাঁড়াও না! পঞ্চু-লাট আসুক, তোমার নামে সিগ্রেট একটা আদায় করে না-হয় আমরাই খাব!

তোমরাই খাও। বলে সিগারেটের লোভ সম্বরণ করে আমি সেখান থেকে সত্যিই চলে এলাম।

কিন্তু কি কুক্ষণেই যে সতীশ তার বিড়ি খাওয়ার কথা আমার কাছে বলে ফেলেছিল! সেদিন থেকে সে আমার পেছনে লেগে রইলো।

সিগারেট না-হোক, একটা বিড়ি অন্তত সে আমাকে খাওয়াবেই!

খাইয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

এই সতীশই আমার ধূমপানের দীক্ষাগুরু।

শিউলি ফুলের কড়া গন্ধের সঙ্গে আমার এই ধূমপানের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। হঠাৎ যদি কোনদিন শিউলি ফুলের গন্ধ আমার নাকে আসে, তৎক্ষণাৎ আমার মন চলে যায় সেই অতীত দিনে। স্পষ্ট পরিষ্কার একটি ছবি ভেসে ওঠে চোখের সুমুখে।

ইস্কুলে টিফিনের ঘণ্টা পড়েছে। সতীশ আর আমি বেরিয়ে পড়েছি রাস্তায়। সুমুখে পুরনো জেলখানার বড় বড় ভাঙা ভাঙা ইটের প্রাচীর। কোনটা-বা একেবারে ভেঙে পড়েছে, কোনটা-বা এখনও খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে ছোট ছোট আগাছার জঙ্গল। তারই ভেতর দিয়ে একটুখানি এগিয়ে, সিমেন্ট-বাঁধানো পরিষ্কার একটা চত্বরের ওপর গিয়ে আমরা বসেছি। ছু'জনে ধরিয়েছি ছুটি সিগারেট। কাছাকাছি একটা ফাঁকা জায়গায় ছোট একটি শিউলি গাছে অজস্র শিউলি ফুল ফুটেছে। টুপ্ টুপ্ করে একটি ছুটি ফুল অনবরত খসে খসে পড়ছে গাছের তলায়।

এখন আর সে ভাঙা ভাঙা বড় বড় প্রাচীরও নেই, সে শিউলি গাছও নেই। সব-কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে ইমারতে অট্টালিকায় জায়গাটা ভরে গেছে। শুধু আমার মনে আছে তার অবিস্মরণীয় স্মৃতি। দুর্গের মত বড় বড় প্রাচীরঘেরা সেই পুরনো জেলখানার ধ্বংসাবশেষ, আর শিউলি ফুলের গন্ধে-ভরা মনোরম সেই নির্জন জায়গাটুকু!

খোঁয়াড়-মুন্সি আলী-সাহেবের আস্তানা ছেড়ে বাড়ি ফিরেই নজরুলের কথা বেশি করে মনে পড়লো।

ছিনু বলেছে, আমি যেন আর নজরুলের কাছে না যাই! আমিও বলেছি যাব না।

আমি না গেলে জানি নজরুল আসবে আমার কাছে।

আমি কিন্তু যাব না যাব না করেও তার পরের দিন বেরিয়ে পড়লাম নজরুলের সন্ধানে।

খোঁয়াড়ের সুমুখ দিয়ে যেতে হবে। কান-কাটা জগার গরু তাড়ানোর ব্যাপার নিয়ে সত্ত-পরিচিত আলী-সাহেব যদি ডাকে? আমাদের চেয়ে বছর-দশেকের বড় এই মানুষটির সঙ্গে সতীশের এত ঘনিষ্ঠতা হলো কেমন করে? শুধুই কি বিড়ি-সিগারেট টানবার সুবিধা হবে বলে? না, আর-কিছু? এমনি সব নানান কথা ভাবতে ভাবতে চলেছি।

না যদি কেউ ডাকে তো এগিয়ে চলে যাব

কিন্তু এগিয়ে যাওয়া আমার হলো না। ডাক শুনে থমকে থামলাম। চেয়ে দেখি, ছোট সেই ঘরখানির ভেতর থেকে সতীশ ডাকছে।

ঘরে গিয়ে বসতে হলো। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার আলী-সাহেব কোথায়?

ছোট একটি জানলার পথে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে।

দেখলাম, খোঁয়াড়ের ভেতর অনেকগুলো গরু ছাগলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন সে বেশ জোরে-জোরে কথা বলছে।

সতীশ বললে, ঝগড়া করছে ছোট ভাই-এর সঙ্গে। ওরকম ওদের রোজই হয়। এসো।

এই বলে সে আমার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলো। অর্থাৎ এসো ওই ছোট ঘরটায়!

—কিসের জন্যে তা তো জানো!

আমিও যাব না, সেও ছাড়বে না।

শেষে আমারই হলো পরাজয়। সেই ঘরটার ভেতর আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে সতীশ তার ফতুয়ার পকেট থেকে দুটি সিগারেট বের করলে। একটি আমার হাতে দিলে, আর একটি নিজে নিয়ে বললে, তোমার জন্যে কিনেছি।

—সিগ্রেট তুমি আমাকে খাওয়াবেই?

সতীশ বললে, হ্যাঁ খাওয়াবই।

দেশলাই দিয়ে সিগারেটটি ধরিয়ে সতীশ পরমানন্দে ধোঁয়া বের করতে লাগলো। কিন্তু আমার হলো মুশকিল। আমাকেও ধরাতে হলো। টেনে টেনে বারকতক ধোঁয়া ছেড়েই সিগারেটটা নিবিয়ে, দিলাম দোরের বাইরে ফেলে।

ভাল লাগলো না।

বললাম, কি সুখে যে তোমরা এ-সব খাও কে-জানে!

সতীশ বললে, এমনি রোজ এক-আধবার করে টানলেই অভ্যেস হয়ে যাবে। তখন বুঝতে পারবে কি সুখ।

এদিকে তখন আলী-সাহেব আর তার ভাই এসে ঘরে ঢুকেছে। গোলমাল তখনও তাদের থামেনি। তাদের কথা বলবার সে এক বিচিত্র ভাষা! না হিন্দি, না বাংলা। তাড়াতাড়ি কথা যখন বলে শুনতে বেশ লাগে, কিন্তু বুঝতে পারি না সহজে। সতীশকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বুঝতে পারো ওদের ভাষা?

সতীশ বললে, সব বুঝতে পারি। আলী-সাহেবের ভাই কি বলছে জানো? বলছে, প্রায়ই দেখি তুমি হিসেবে গোলমাল কর। এবার যদি কর তো তোমাকে আর আমি এখানে বসতে দেবো না; আমি বসবো।

আলী-সাহেব বলছে, ওটা আমি ভুল করে লিখেছিলাম। কাটতে ভুলে গেছি।

অন্ধকার ঘরটায় বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। সতীশকে বললাম, চল বেরোই এখান থেকে।

সতীশের সিগারেট তখনও শেষ হয়নি। আমার একটা হাত সে চেপে ধরলে। বললে, দাঁড়াও, এটা শেষ করে নিই। আলী-সাহেবের ভাইটা চলে যাক।

কাঠের ক্যাশ-বাক্সটি উজাড় করে টাকা-পয়সা যা ছিল ঢেলে নিয়ে আলী-সাহেবের ভাই চলে গেল।

সতীশের সিগারেটটা তখন শেষ হয়েছে।

আমাকে দেখেই আলী-সাহেব হেসে জিজ্ঞাসা করলে, কখন এলে ?

বললাম, তুমি তখন ভাই-এর সঙ্গে ঝগড়া করছিলে।

আলী-সাহেব বললে, ওটা ওমনি।

সতীশ জিজ্ঞাসা করলে, আজ আবার হিসেবের ভুল হলো নাকি ?

আলী-সাহেব হাসতে হাসতে বললে, তুটো একটা ওরকম হয়। নাও, বিড়ি খাও।

এই মাত্তর খেলাম। বলে' সতীশ তার খাতাটা তুলে নিলে। বললে, ভাই তোমার ভুল ধরলে কেমন করে দেখি!

খাতার পাতার একদিকে লেখা থাকে গরু ছাগল যে-কটা জমা হলো তার হিসেব, আর একদিকে থাকে, কার জন্যে কত পয়সা পাওয়া গেল তার হিসেব।

সতীশ সেটা দেখেই বলে উঠলো, এই তো হাতে-হাতে ধরা পড়বার ব্যবস্থা করে রেখেছো এইখানে। কান-কাটা জগা যে-গরু তুটো দিয়ে গেল, সেটা তুমি কেটে ফেললেই পারতে!

আলী-সাহেব খাতাটা কেড়ে নিলে সতীশের হাত থেকে। বললে, কাটতে ভুলে গেছি। দাও।

ব্যাপারটা ভাল বুঝতে পারছিলাম না। সতীশকে জিজ্ঞাসা করতেই সে আমাকে বুঝিয়ে দিলে। বললে, জগা যে গরু তুটো দিয়ে গিয়েছিল সে-তুটো আজ ছাড়াতে এসেছিল বদি ময়রা।

আলী-সাহেব তার কাছ থেকে একটি পয়সাও নিলে না, এমনি ছেড়ে দিলে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

সতীশ বললে, তুমিই তো বললে, গরু ছুটো জগা রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এসেছে। কারও কোনও ক্ষতি ওরা করেনি।

বললাম, তবে যে কাল বললে, আমাদের ও-সব দেখবার দরকার নেই!

কথাটা বলেছিল আলী-সাহেব। আমিও বলেছিলাম তাকে শুনিয়েই।

তাকিয়ে দেখি, সে তখন মুখ টিপে টিপে হাসছে।

সতীশ বললে, দেখছো কি? ও-লোকটি অমনি!

লোকটির সত্যকার পরিচয় তখনও আমি পাইনি। ভেবেছিলাম, আমাদের চেয়ে বয়সে বড় এই অশিক্ষিত মুসলমানের ভেতর আমাদের বয়সী ইস্কুলের ছেলেরা এমন কী দেখেছে যার জন্য সবাই এখানে এসে জড়ো হয়!

শুধু যে লুকিয়ে লুকিয়ে পান-বিড়ি খাবার জন্যে আসে না সেকথা পরে বুঝেছিলাম। পরিচয় ক্রমশ আমাদের ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। দেখেছিলাম, সত্যাশ্রয়ী দৃঢ়চেতা অথচ বিনয়-নম্র সদানন্দ একটি সত্যিকার মানুষ!

দেখেছি, গরীব মানুষ, হাতজোড় করে এসে দাঁড়িয়েছে, বলেছে, গাইটা আপনার খোঁয়াড়ে এসেছে মিঞা-সাহেব, ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার পয়সাটা যোগাড় করে উঠতে পারলাম না আজ। কাল আমি ওকে নিয়ে যাব।

আলী-সাহেব জিজ্ঞাসা করেছে, তাহলে আজ তুমি এসেছ কি জন্যে?

লোকটি বলেছে, শুনেছি এখানে নাকি গরুগুলোর সেবাযত্ন হয় না, তাই বলতে এসেছি যেন দু'-আঁটি খড় আর এক বালতি জল ওকে দেওয়া হয়।

আলী-সাহেব বলেছে, বয়ে গেছে আমার সেবা-যত্ন করতে! তুমি নিয়ে যাও তোমার গাই!

এই বলে সে খোঁয়াড়ের তালা খুলে দিয়েছে।

লোকটা বলেছে, কিন্তু পয়সা—

—পয়সা কে চাইছে তোমার কাছ থেকে? গাইটা নিয়ে তাড়াতাড়ি পালাও, নইলে আমার ভাই এক্ষুণি এসে পড়বে।

নজরুলের কাছে যাব বলেই বেরিয়েছিলাম, সতীশ না আটকালে হয়ত এতক্ষণ চলেই যেতাম।

হঠাৎ নজরে পড়লো—ছিনু আসছে। বেরিয়ে পড়লাম খোঁয়াড় থেকে।

ছিনুকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই ছিনু বললে, বন্ধু তোমার বাড়ি চলে গেছে।

—চুরুলিয়া গেছে?

ছিনু বললে, হ্যাঁ, তার ভাই এসেছিল। মায়ের অসুখ, অনেকদিন যায়নি, তাই গেল একবার।

ছিনুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাড়ি ফিরে এলাম। ভাবলাম নজরুল গেছে চুরুলিয়া, এই সময় আমিও একবার অণ্ডাল থেকে ফিরে আসি।

এখান থেকে মাইল-দশেক দূরে অণ্ডাল গ্রাম। আমার মামার বাড়ি। গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড ধরেও যাওয়া যায়, আবার ট্রেনে চড়েও যাওয়া চলে। ট্রেনে তখন ভাড়া ছিল মাত্র চার পয়সা।

পরের দিন রবিবার। সকালের ট্রেনে চলে গেলাম অণ্ডাল।

ভেবেছিলাম, সোমবার এসে ইস্কুল করব।

কিন্তু রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর শীত-শীত করতে লাগলো। রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। রীতিমত জ্বর। দিদিমাকে বলবার উপায় নেই। হৈ চৈ কাণ্ড বাধিয়ে দেবে। চাপাচুপি দিয়ে কোনরকমে রাতটা কাটিয়ে দিলাম। ভেবেছিলাম, সকালে উঠে কাউকে কিছু না বলেই পালাবো।

কিন্তু পালাবো কি—উঠতেই পারলাম না বিছানা ছেড়ে।

জানাজানি হয়ে গেল।

বুড়ো অনন্ত কোবরেজ এলো দেখতে। হাত দেখলে, পেট

দেখলে, চোখ দেখলে, দেখেশুনে বলে গেল, বেয়াড়া জ্বর। দিনকতক ভোগাবে।

সত্যিই ভোগালে।

যত না ভুগলাম জ্বরে তার চেয়ে বেশি ভুগলাম মনের উদ্বেগে। নজরুল তার বাড়ি থেকে ফিরেই দেখবে, আমি আর যাই না তার কাছে। কেন যাই না কিছুই জানবে না, কিছুই শুনবে না, হয়ত সে আসবে আমাদের বাড়িতে, হয়তো শুনবে আমি অণ্ডাল এসেছি, কিংবা হয়ত ভাল করে কেউ তার সঙ্গে কথাই বলবে না।

ভাত খেলাম পাঁচ-ছ' দিন পরে। ভাবলাম, এবার চলে যাব রাণীগঞ্জে। কিন্তু যেতে দিলেই তো! আরও দু'দিন থেকে যা।

থেকে গেলাম।

একমাত্র সান্ত্বনা—ছিনু খুশী হবে। নজরুলকে একখানা চিঠি লিখবো ভাবছিলাম। তাও লিখলাম না।

রাণীগঞ্জে ফিরে গেলাম দশ-বারো দিন পরে।

যেদিন গেলাম সেইদিনই বিকেলে যাচ্ছিলাম নজরুলের কাছে, খোঁয়াড়-মুন্সির ঘরে বসেছিল সতীশ, আমাকে দেখেই ছুটে বেরিয়ে এলো।

মনে হলো যেন আমারই জন্য অপেক্ষা করছিল সে। বললাম, আমার ভাই একটু বিশেষ দরকার আছে। এখন ছাড়ো।

সতীশ বললে, এদিকে তুমি কি দরকারে আসো তা জানি। যাচ্ছো নজরুল ইসলামের কাছে। একটু পরেই না হয় যেয়ো।

এই বলে সতীশ আমাকে একরকম জোর করে টেনে নিয়ে গেল খোঁয়াড়ের সেই ঘরটার ভেতর। আলী-সাহেব বসে বসে হাসছে। বললে, আজকাল কবরখানা হয়ে ঘুরে ঘুরে যাও বোধহয়।

—কোথায়?

—দুখু মিঞার কাছে।

আমি কিছু বলবার আগেই জবাব দিলে সতীশ। বললে, আজকাল ইস্কুল যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে।

বললাম, আমি ছিলাম না এখানে। অণ্ডাল গিয়ে জ্বরে পড়েছিলাম।

সতীশ বললে, যাক আর মিছে কথাটা নাই-বা বললে! নাও বিড়ি খাও।

তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে বললাম, না।

বিড়ি আমি খেতে চাইনি সেদিন।

সতীশ বললে, সিগ্রেট খাবে? গাঁজা?

খুব রাগ হলো সতীশের ওপর। বললাম, কী যা-তা বলছো! সত্যি বলছি আমার ভাল লাগে না খেতে।

সতীশ বললে, তোমরা গাঁজা খাচ্ছো লুকিয়ে লুকিয়ে আর একটা বিড়ি খেতেই যত দোষ?

বললাম, এ-সব কী বলছো তুমি সতীশ?

সতীশ বললে, ঠিকই বলছি। তোমরা—মানে তুমি আর নজরুল গাঁজা খাও।

এই কথার পর অন্য কেউ হলে তক্ষুনি ঝগড়া হয়ে যেতো কিন্তু আমার স্বভাবটাই অন্যরকম। কারও সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করতে ইচ্ছে করে না।

উঠে দাঁড়ালাম। এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল।

আলী-সাহেব বললে, রাগ করছো ভাই?

বললাম, ছাখো, আমি যদি-বা সতীশের পাল্লায় পড়ে বিড়ি সিগ্রেট দু'এক টান টেনেছি, নজরুল কোনদিন ছোঁয়নি ও-সব। আর সতীশ বলছে আমরা গাঁজা টানি।

সতীশ বললে, গাঁজা না টানলে ওইরকম কবিতা লিখতে পারে কেউ?

বললাম, কবিতা লিখলেই গাঁজা টানতে হবে?

সতীশ বললে, নিজের চোখকে তো অবিশ্বাস করতে পারি না। আমাদের বাড়ির সামনে গাঁজার দোকান। আমি দেখেছি নজরুলকে গাঁজা কিনতে। আচ্ছা, এইবার হাতে-নাতে একদিন ধরে দেবো—তাহলে হবে তো?

সেই ভাল। বলেই ছুটে বেরিয়ে পড়লাম সেখান থেকে। সতীশ আটকাতে পারলে না।

নজরুলের সঙ্গে দেখা হতেই বলে উঠলো, বেশ ছেলে বাবা! ছিন্নু কি বলেছে না বলেছে আর অমনি রাগ হয়ে গেল? ছিন্নু! ছিন্নু!

বাইরে থেকে ছিন্নুর জবাব এলো : শুনেছি। শুনেছি।

দু' কাপ চা হাতে নিয়ে ছিন্নু ঢুকলো হাসতে হাসতে। বললে, তোমার জন্যে বকুনি খেয়ে খেয়ে মরছিলাম বাবা, তুমি এসে গেছ, বাঁচলাম। নাও, চা খাও।

ছিন্নুকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বকুনি খাচ্ছিলে কেন?

—তোমাকে আসতে বারণ করেছিলাম যে।

বললাম, তাও তুমি বলেছো নজরুলকে?

—বলবো না? মরছিল যে তোমার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে। আমাকে বলছিল তুই যা একবার রায়-সাহেবের বাড়ি। আমাকে দেখলে চাকরগুলো ভাল করে কথা বলে না। মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। তুমি অণ্ডাল গিয়েছিলে মিঞা-সাহেব?

বললাম, হ্যাঁ। সেখানে গিয়ে জ্বরে পড়েছিলাম।

ছিন্নু বললে, ওই শোনো! আর দুখু আমাকে বলে কিনা আমি তোমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছি। কাজ কি বাবা, আমি আর তোমাদের কথায় থাকলেই তো!

ছিন্নু গজ্ গজ্ করতে করতে চলে গেল।

নজরুল তার বালিশের তলা থেকে খাতাটা টেনে বের করলে। বললে, দুটো বড় বড় কবিতা শেষ করেছি। শোনো। একটা 'রাজার গড়' একটা 'রাণীর গড়'।

দুটি কবিতাই শুনলাম।

শুনে বলেছিলাম, তুমি আর গদ্য লিখবে না। এখন থেকে কবিতাই লিখবে।

ছিন্নু যে ঘাপ্‌টি মেরে কোথায় দাঁড়িয়েছিল বুঝতে পারিনি। তার সেই হুঁকোটি হাতে নিয়ে কল্‌কেয় ফুঁ দিতে দিতে এসে দাঁড়ালো। বললে, সাধে কি তোমাকে আসতে বারণ করি মিঞা-সাহেব! ওই মন্তরটি দিলে তো ওর কানে! আবার বললে তো লিখতে!

নজরুল বলে উঠলো, ছিনু! তুই না বলেছিলি আর বলবি না!

ছিনু চুপ করে গেল। তার সেই অসহায় অবস্থাটা আমি লক্ষ্য করেছিলাম। সে-মুখ আমি আজও ভুলিনি। কল্‌কেটি হুঁকোর মাথায় বসিয়ে ধীরে ধীরে টানতে টানতে বলেছিল, হ্যাঁ, বলেছিলাম।

ব্যস্‌, আর কিছু সে বলতে পারেনি। নীচের দিকে মুখ করে উবু হয়ে বসেছিল মেঝের ওপর। হুঁকোটা পর্যন্ত টানতে পারছিল না।

নজরুল উঠে দাঁড়ালো। আমাকে তুলে দিয়ে বললে, চল একটু ঘুরে আসি।

আমিও তাই চাইছিলাম। সতীশের কথাটা তাকে না বলে আমি স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

ঘর থেকে বেরুচ্ছি, শুনলাম ছিনু বলছে, আমার আবার কথা! কেই-বা রাখে, আর কেই-বা শোনে!

বোর্ডিং থেকে বেরিয়েই সতীশের কথাটা নজরুলকে বলেছিলাম। কথাটা নজরুল হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল। হো হো করে হেসে বলেছিল, ঠিকই বলেছে সতীশ। গাঁজা আমি খাই। খেতে ধরেছি।

বিশ্বাস করতে পারিনি। বলেছিলাম, ধেৎ!

খোঁয়াড়ের সমুখ দিয়ে যাবার রাস্তা। কিন্তু ইচ্ছে করেই সে-পথটা ছেড়ে দিলাম। ডানদিকে ঘুরে গয়লা পাড়ার সরু গলির ভেতর ঢুকে পড়লাম। এঁদো গলির গোলকধাঁধায় ঘুরে ঘুরে বড় রাস্তা ধরলাম খাঁড়ুগুলির মোড়ে।

বাঁদিকে সতীশের বাড়ি। যদিও জানি, সে তখনও খোঁয়াড়ে বসে আছে, তবু তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে মন চাইছিল না। নজরুল কিন্তু থমকে থামলো। পকেট থেকে দু' আনা পয়সা বের করে পাশেই গাঁজার দোকানে ঢুকে পড়লো।

পথের ধারে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম হাঁ করে।

গাঁজার মোড়কটি হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলো নজরুল। বললে, দেখলে?

—দেখলাম।

মুখ দিয়ে আমার কথা সরছিল না। খানিকটা পথ চুপচাপ গিয়ে বললাম, তাহলে সতীশ যা বললে, সত্যি?

নজরুল বললে, সত্যি।

তখনও কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

হাসি-রহস্য করতে করতে পথ চলতে লাগলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো চারিদিকে। শহর ছাড়িয়ে তখন আমরা চলছি একটা ডাঙ্গার ওপর দিয়ে। বাঁদিকে গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড দেখা যাচ্ছে। ডানদিকে ধানের মাঠ।

বললাম, এবার ফিরি চল রাত হয়ে গেল।

নজরুল বললে, আর-একটু। ওই যে গাছের তলায় একটা আলো দেখা যাচ্ছে, ওইখানে যাব।

দেখলাম, অনেকদিনের পুরনো একটা বটগাছের তলায় মোটা মোটা কাঠের ধুনি জ্বালিয়ে জটাজুটধারী একজন সন্ন্যাসী বসে আছেন। আর তার এক ভক্ত চেলা বসে বসে তার পা টিপছে।

নজরুল তার পকেট থেকে গাঁজার প্যাকেটটি বের করে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে প্রণাম করলে।

এতক্ষণে বুঝলাম তার গাঁজার রহস্য। মন থেকে একটা গুরুভার বোঝা নেমে গেল।

নজরুল চোখ টিপে আমার হাতে একটা চিমটি কেটে ইশারায় কি যে বললে ঠিক বুঝতে পারলাম না। হাঁ করে তাকিয়েছিলাম সন্ন্যাসীর দিকে। সন্ন্যাসী চোখ পিট্ পিট্ করে এক-একবার তাকাচ্ছেন, আবার চোখ বুজছেন।

নজরুল চট্ করে এক সময় আমার কানে-কানে বললে, প্রণাম কর!

প্রণাম তো করবো, কিন্তু আমার সে প্রণাম দেখবে কে? প্রভুর তো চোখ বন্ধ!

প্রণাম একটা করলাম শেষ পর্যন্ত।

চোখ না হয় বন্ধ, কিন্তু কান বন্ধ নয় জেনে নজরুল হাতজোড় করে বললে, আমার ব্যাপারটা কি হবে বাবা? কখন বলবেন?

বাবা শুনেছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু বাবা নির্বিকার।

'বাবা' 'বাবা' বলে ডেকে ডেকে নজরুল হয়রান হয়ে গেল, বাবা চোখ আর খোলেন না কিছুতেই!

আগে যদি-বা এক-আধবার চোখ পিট্‌ পিট্‌ করছিলেন, এখন আবার তাও করছেন না।

অন্ধকার রাস্তা। আমাদের ফিরে যেতে হবে অতটা পথ। নজরুলকে চুপি চুপি বললাম, কাল না-হয় সকাল-সকাল আসা যাবে, আজ চল—আমরা চলে যাই।

নজরুল বোধকরি শেষ চেষ্টা করলে। আবার ডাকলে, বাবা!

নজরুলের ভাগ্য বুঝি হঠাৎ প্রসন্ন হলো। বাবা নড়ে চড়ে বসলেন। চোখ চেয়ে একবার তাকালেন আমাদের দিকে। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। তক্ষুণি সে লাল লাল ছোট ছোট চোখদুটি আবার বন্ধ হয়ে গেল। ধরা-ধরা গলায় বললেন, বাবুলাল, ছিলুম বনাও!

বাবুলাল বোধকরি চেলাটির নাম। বাবুলাল পা ছেড়ে দিয়ে নজরুলের দেওয়া গাঁজার মোড়কটি তুলে নিয়ে তার কাজ আরম্ভ করলে।

নজরুল আর কত ডাকবে! আমাকে বললে, আর-একটু দেখি।

ওদিকে বাবুলাল তার কাজ শেষ করে কল্‌কের ওপর ধুনি থেকে বেছে বেছে কয়েকটি আগুনের টুকরো তুলে নিয়ে চীৎকার করে উঠলো, ব্যোম শঙ্কর!

বাবাকে এবার আর ডাকবার প্রয়োজন হলো না। হাত বাড়িয়ে কল্‌কেটি নিয়ে বাবা প্রাণপণে বারকতক টানলেন, তারপর কল্‌কেটি আবার বাবুলালের হাতে ফেরত দিয়ে নজরুলের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

হাসতে হাসতে বললেন, নেহি নেহি বেটা, উও বিলকুল ঝুট্‌ হ্যায়। উহা কুছ্‌ নেহি হ্যায়।

নজরুল তার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে বলে মনে হলো।

কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কি তার প্রশ্ন জানি না। এখানে জিজ্ঞাসা করাও যায় না।

নজরুল এবার ওঠবার জন্যে প্রস্তুত। আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে ইশারা করলে।

আমিই উঠতে চাইলাম না। নজরুলকে বললাম, ছাখো।

গাঁজার কল্‌কেটি তখন বাবুলালের হাতে। সে তখন তার গুরুজীর প্রসাদ পাচ্ছে।

ধূমপান অনেক দেখেছি, কিন্তু সেরকম ধূমপান আমি কখনও দেখিনি। সেরকমটি দেখবার সৌভাগ্য আমার আজও হলো না। কি নিষ্ঠা! কি ভক্তি! সবার আগে কল্‌কেটি ছ'হাত দিয়ে ধরে চোখছটি বন্ধ করে বিড় বিড় করে কি যেন বলতে লাগলো। তারপর কল্‌কেটি কপালে ঠেকিয়ে মারলে টান। সে কী টান! ইঞ্জিনের একটানা হুইসলের মত একরকম শব্দ হলো, গলার রগ আর শিরাগুলো ফুলে মোটা হয়ে উঠলো, সারা মুখখানা হলো সিঁদুরের মত লাল, রোগা খিটখিটে লম্বা মানুষটি টানের সঙ্গে সঙ্গে পায়ের অঙুলের ওপর ভর দিয়ে খানিকটা উঁচু হলো, তারপর দম ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বেলুন যেমন করে চুপ্‌সে যায়, তেমনি করে থপাস্‌ করে বসে পড়লো, বাবুলালের ধূম্র সেবনের সে কী অপরূপ ভঙ্গী!

তারপর তারিয়ে তারিয়ে ধূম্র ভক্ষণ!

ঠোঁটে আর জিবে একরকম শব্দ করে কোঁৎ করে কি যেন গেলে, আবার শব্দ করে, আবার গেলে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই অপরূপ লীলা দেখছি, উঠতে পারছি না কিছুতেই, আর চাপা হাসিতে আমারও সর্বাঙ্গ তখন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

হাসি চাপতে গিয়ে নজরুল একটা বিশ্রী কাণ্ড করে বসলো।

মুখে হাত চাপা দিয়ে খুঁক খুঁক করে একরকম শব্দ করতে করতে সেখান থেকে উঠে পালাচ্ছে, একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লো গিয়ে একটি মেয়ের গায়ের ওপর।

মেয়েটি আসছিল সন্ন্যাসীর কাছে, তার সঙ্গে আসছিল লণ্ঠন হাতে নিয়ে একজন লোক।

লোকটা হৈ হৈ করে চীৎকার করে উঠলো।

ওদিকে বাবার তখন যোগনিদ্রা ভঙ্গ হয়ে গেছে। হুঙ্কার করছেন, কেয়া হুয়া ?

আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারছি আমি, আর বুঝতে পারছে আমাদের বাবুলাল।

কি আর করি, উঠে দাঁড়ালাম।

ভেবেছিলাম, ভদ্রমহিলা নজরুলকে কিছু বলবে, কিন্তু বলা দূরে থাক, নজরুলের মুখের দিকে তাকিয়েই বলে উঠলো, কে রে, দুখু ? তুই এখানে কি করছিস ?

নজরুল লজ্জায় এতক্ষণ মুখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারেনি। এতক্ষণ পরে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করে বললে, হ্যাঁ আমি— এখানে এই বাবার কাছে—

মেয়েটি বললে, যাস একদিন আমাদের বাড়ি। বাড়ি চিনিস না ? অর্জুনপটির কূয়োটার কাছেই। ওই তো, শৈল জানে।

আরে, আমাকেও চেনে দেখছি ! আমি কিন্তু তাকে চিনতে পারিনি। আমি হাঁ করে মেয়েটির মুখের দিকে চেয়েছিলাম।

—কিরে, আমাকে চিনতে পারছিস না ? আমি যতীনের দিদি।

যতীন আমার সহপাঠী। অন্তরঙ্গ বন্ধু। জাতে ক্রিশ্চান। তার দিদি এসেছে এই সাধুর কাছে !

'যাব।' বলে সেখান থেকে চলে এলাম।

পথে আসতে আসতে নজরুলকে জিজ্ঞাসা করলাম, যতীনের দিদি তোমাকে চিনলে কেমন করে ?

নজরুল প্রথমে বলতে চাইছিল না। বললে, সে অনেক কথা।

আমি তাকে ছাড়লাম না কিছুতেই। বললাম, হোক না অনেক কথা। রাস্তাও তো অনেকখানি, অনেক কথাও শেষ হয়ে যাবে যেতে যেতে।

কথা কিন্তু অনেক মোটেই নয়।

নজরুল বললে, তুমি জানো, কিছুদিন আমি কাজ করেছিলাম।

—কি কাজ ?

নজরুল বললে, ছোট কাজ। বাবুর্চির কাজ, খানসামার কাজ……

বললাম, জানি।

নজরুল বললে, এক গার্ড সাহেবের কাছে কাজ করতাম জানো ?

—জানি।

—এই মেয়েটিই সেই গার্ড সাহেবের স্ত্রী।

চুপ করে কি যেন ভাবছিলাম।

নজরুল বললে, এখন বুঝলে তো—কেমন করে এই মেয়েটি আমাকে চিনলে ?

—বুঝলাম। তবে যে বলছিলে অনেক কথা !

নজরুল চুপ করে রইলো।

বুঝলাম, কথাটা সামান্যই, কিন্তু সেই সামান্য কথা নজরুলের কাছে আজ অসামান্য হয়ে উঠেছে।

ভাবছিলাম, যতীনের দিদি ক্রিশ্চান, হিন্দু সন্ন্যাসীর কাছে সে গেল কিসের জন্যে ?

নজরুলও বলতে পারলো না।

ছয়

যতীন আর আমি পড়ি একই ক্লাশে, কিন্তু আমাদের সেক্‌শন্ আলাদা। ক্লাশে ছাত্রসংখ্যা অনেক। এক ঘরে কুলোয় না। তাই সেক্‌শন্ 'এ'র ছাত্রেরা বসে দোতলায়, 'বি'র ছাত্রেরা নীচে। যতীন বসে 'বি' সেকশনে। ছুটির আগে দেখা হয় না।

ছুটির পর একদিন দেখি, যতীন গেটের পাশে দাঁড়িয়ে।

কাছে যেতেই বললে, তোকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আজকাল তোর নতুন বন্ধু জুটেছে। তোর সঙ্গে দেখাই হয় না।

কথাটা সত্যি। নতুন বন্ধু মানে নজরুল।

বললাম, কি কথা বলতে ভুলে গেছিস তাই বল্ না।

যতীন বললে, দিদি একদিন তোকে যেতে বলেছিল।

বাড়ি যেতে হলে দু'জনেরই এক রাস্তা।

চলতে চলতে বললাম, দিদি আমাকে চিনলে কেমন করে যতীন? আমি তোর দিদিকে সেদিন প্রথম দেখলাম।

যতীন বললে, তুই দেখিসনি, হয়ত দিদি দেখেছে।

তা হবে। আগে প্রায় রোজই যেতাম যতীনের বাড়ি। জিজ্ঞাসা করলাম, দিদি কি জন্যে গিয়েছিল রে ওখানে—ওই সন্ন্যাসীর কাছে?

জানি না। বলে সে কথাটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল প্রথমে, তারপর পথ চলতে চলতে হঠাৎ তার কি মনে হলো কে জানে, বললে, বলতে পারি দিদি যদি কোনদিন না জানতে পারে।

যতীনের গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। বলেছিলাম, জানতে পারবে না, তুই বল্। যতীন তখন চুপি চুপি বলেছিল, দিদির সংসারে সুখ নেই। দিদি তার শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসতে চায়।

—তা সন্ন্যাসী কি করবে?

যতীন বলেছিল, নগেন ময়রার কাছে আমি শুনেছিলাম, চকমকির মাঠে এক সাধু এসেছে, সে নাকি কত রকমের সব অসাধ্য সাধন করছে। সেই কথা দিদিকে বলেছিলাম। দিদি প্রথমে

বিশ্বাস করেনি। তখন আমি নিজে গিয়ে একদিন ডেকে এনেছিলাম সন্ন্যাসীর সঙ্গে একজন লোক আছে—তাকে। সে এসে বলেছিল, সাধুবাবার জন্যে কিছু গাঁজা আর পাঁচটি টাকা নিয়ে যাবেন মা, বাবার কাছ থেকে আমি কিছু মন্ত্র-দেওয়া ভস্ম চেয়ে নিয়ে আপনাকে দিয়ে দেবো, সেই ভস্ম আপনি আপনার স্বামীর খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন, তারপর দেখবেন মজা। আপনাদের ছাড়াছাড়ি যদি না হয় তো আমাকে পাঁচ জুতো মারবেন। তাই এক টাকার গাঁজা আর পাঁচটি টাকা নিয়ে দিদি গিয়েছিল সেদিন।

শুনলাম মন্ত্র-দেওয়া ভস্ম নাকি দিদি সেদিন নিয়ে এসেছে।

রাস্তার ধারেই একতলা বাড়ি যতীনদের। কতদিন গেছি সেখানে। জানতাম যতীনের এক দিদি আছে, আর একটি বোন আছে যতীনের চেয়ে ছোট, কিন্তু কোনদিন তাদের আমি চোখে দেখিনি। সেদিন দিদিকে প্রথম দেখলাম চকমকির মাঠে সেই গাছের তলায়।

দোরের কড়া নাড়তেই চাকর এসে দোর খুলে দিলে। ছোট ছোট কয়েকটা মুরগীর বাচ্চা ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আমাদের দেখেই ছুটে পালালো।

সুমুখের ঘরখানিই যতীনের ঘর। পুরনো ভাড়াটে বাড়ি। কিন্তু এমনি পরিপাটি করে সাজানো, পুরনো বলে মনেই হয় না। দরজায় জানলায় পর্দা খাটানো, টেবিল, চেয়ার, খাট, আলমারি—সব-কিছু একেবারে নতুনের মত।

ঘরে ঢুকেই বললাম, ডাক দিদিকে!

যতীন আমার কথাটার জবাব দিলে না। বইখাতা নামিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো। ভাবলাম দিদিকে ডাকতে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারে লণ্ঠনের আলোতে যে-দিদিকে দেখেছি অপরূপ সুন্দরী, আজ সেই দিদিকে দেখবো দিনের আলোয়। সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছি দোরের দিকে তাকিয়ে।

খানিক পরে দেখি, ইয়াসিন ঘরে ঢুকলো চা নিয়ে। চা আর একটা গরম আলুর চপ।

জিজ্ঞাসা করলাম, দিদি কোথায় ইয়াসিন ?

ইয়াসিন বললে, দিদিমণি তো এখানে নেই বাবু।

সেকি ? তবে যে যতীন বললে—

কি বললে যতীন ? বলতে বলতে যতীন ঘরে ঢুকলো।

বললাম, দিদি এখানে নেই ?

যতীন বললে, না। চারদিন আগে চলে গেছে প্রসাদপুরে।

—তবে যে বললি, দিদি আমাকে ডেকেছে !

—যাবার আগে ডেকেছিল। বললাম তো তোকে বলতে ভুলে গেছি।

বললাম, কই, আগে তো সেকথা বললি না ?

যতীন বললে, বললে কি করতিস ? আসতিস না ?

—আসবো না কেন ? কিন্তু মনটা সত্যিই খুব খারাপ হয়ে গেল।

যতীন বললে, আসছে রবিবার আমি যাব দিদির কাছে। তুই যেতে পারিস আমার সঙ্গে।

সোম মঙ্গল দু'দিন কিসের যেন ছুটি ছিল। বললাম, যাব।

যতীন বললে, সকালে আসিস আমাদের বাড়িতে। সাতটায় ট্রেন।

সেই কথাই রইলো। রবিবার সকালে যতীনের সঙ্গে আমি প্রসাদপুর যাব।

সঙ্গে যদি নিয়ে যেতে পারি নজরুলকে তাহলে বেশ মজা হয়। বললাম গিয়ে নজরুলকে। তোমাকে যেতেই হবে।

নজরুল রাজি হয় না কিছুতেই। নানারকমের ওজর-আপত্তি। কখনও অ্যাল্‌জেবরাটা দেখিয়ে বলে, এই ছাখো, এই এতগুলো অঙ্ক কষতে হবে। কখনও বলে, ইংরেজীতে তিনটে 'এসে' লিখতে হবে ছুটিতে। 'হোম্‌ টাস্ক্‌' এই এ-তো !

বুঝলাম, সব বাজে কথা। যাবার ইচ্ছা নেই।

বাধ্য হয়ে আমাকে একাই যেতে হলো।

ভাগ্যিস একা গিয়েছিলাম ! সেখানে গিয়ে বুঝলাম সেকথা।

জংশন-স্টেশন থেকে মাত্র মাইলখানেক পথ।

আজকাল মোটর-বাস, সাইকেল-রিক্সা, কতরকমের কত যান-বাহন, যেখানে যাবেন পৌঁছে দেবে, পকেটে পয়সা থাকলেই হলো। কিন্তু তখনকার দিনে স্টেশনটাও এত বড় ছিল না, এত গাড়ি-ঘোড়াও ছিল না, লোকজন সব পায়ে হেঁটেই যাওয়া আসা করতো।

ট্রেন থেকে নেমে গল্প করতে করতে যতীন আর আমি কখন যে প্রসাদপুরে এসে গেছি বুঝতেই পারিনি।

দূরে গ্রাম দেখা যাচ্ছে। লোকালয় থেকে দূরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে চমৎকার একটি বাংলো-বাড়ি। কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। চারিদিকে বড় বড় আম আর অর্জুনের গাছ।

জায়গাটা যেমন নির্জন, তেমনি মনোরম। হাওয়া এসে লাগছে গাছের ডালে। কত রকমের কত পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে।

কাঁকর-পাথরের ডাঙ্গায়-ভরা এই কয়লাকুঠির দেশ। ফুল এখানে খুব কমই পাওয়া যায়। কিন্তু সবচেয়ে বিচিত্র ব্যাপার এই যে—বাড়িটার সামনে গেটের কাছাকাছি যেতেই ফুলের সমারোহ দেখে থমকে থামতে হলো। দেখলাম, সুমুখের অনেকখানা জায়গা জুড়ে বাগান, আর সেই বাগান আলো করে ফুটে আছে বড় বড় গাঁদা আর ডালিয়া।

—কিরে, তোরা ওখানে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? আয়!

মুখ ফিরিয়ে দেখি, দিদি এসে দাঁড়িয়েছে। এলো চুল পিঠের ওপর ফাঁস দিয়ে বাঁধা। পরনের শাড়িটা আঁটসাঁট করে কোমরে জড়ানো।

সেদিন চকমকির ডাঙ্গার সেই বড় বটগাছের তলায় সন্ন্যাসীর আস্তানায় যাকে দেখেছিলাম, এ যেন সে-মেয়ে নয়।

বললাম, ফুল দেখছি।

দিদি বললে, পরে দেখবি। আয়!

কাছে যেতেই বললে, সারাদিন একা-একা কি আর করবো, একটা মালি রেখে ওই-সব করেছি।

মনে হলো দিদি যেন কাজ করতে করতে উঠে এসেছে।

ঠিক তাই।

বললে, তোদের জন্যে রান্না করছিলাম।

বললাম, আমরা আসবো জানলেন কেমন করে?

—যতীন চিঠি লিখেছিল। দুখুকে আনতে পারলে না?

বললাম, এলো না।

দিদি বললে, জানি—আসবে না।

বাড়িতে অনেকগুলো ঘর। প্রতিটি ঘর এমনভাবে সাজানো, দেখলে মনে হয় মস্ত বড়লোকের বাড়ি। যে-ঘরে আমাদের নিয়ে গিয়ে বসালে সে-ঘরে ধুলোমাখা জুতো পায়ে দিয়ে বসতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকছিল :

দিদি আমার কাছে এগিয়ে এলো। বললে, তুমি এসেছ, আমার এত আনন্দ হচ্ছে! বোসো, তোমাদের আগে চা খাওয়াই।

দিদি বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে। যতীন বললে, রান্না করছিলে কেন? যোসেফ্ নেই? দিদি বললে, আছে। যোসেফ্ আছে, কালীচরণ আছে, আমি তাদের দেখিয়ে দিচ্ছিলাম। আজ তো আবার তিনি আসবেন।

যতীন জিজ্ঞাসা করলে, কখন?

—তার কি কোনও ঠিক-ঠিকানা আছে? দুখু যখন ছিল, ঠিক সময়ে টেনে আনতো। বলেই দিদি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

যতীনকে জিজ্ঞাসা করলাম, কার কথা হচ্ছে?

যতীন বললে, জামাইবাবুর কথা।

যাক, তাহলে দেখা হবে সেই মানুষটির সঙ্গে!

বাড়িতে ঢুকে অবধি কানে আসছিল পিয়ানোর আওয়াজ। মনে হচ্ছিল, কাছাকাছি কোনও ঘরে বসে কে যেন টুং টুং করে পিয়ানো বাজিয়ে চলেছে। মুখ হাত ধুতে গিয়ে একটা ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখি, পিয়ানোর সামনে পিছন ফিরে বসে আছে একটি মেয়ে। মুখখানা না দেখা গেলেও বুঝতে দেরি হলো না মেয়েটি ইংরেজ।

একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছি, যতীন আমাকে সেখানে দাঁড়াতে

দিলে না। তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে চলে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, কে এ মেয়েটি ?

বললে, পরে বলবো।

খাবার জন্য আলাদা ঘর। ঘরের মাঝখানে মার্বেল পাথরের টেবিল, চারিদিকে চেয়ার। ওইখানেই ওরা খায়। কিন্তু শুধু আমার জন্যে কিনা জানি না, সেদিন দেখলাম, মেঝের ওপর আসন বিছিয়ে দিদি আমাদের বসে বসে খাওয়ালে। সে আদর, সে যত্ন ভোলবার নয়।

আমারও ভাই নেই, বোন নেই, মা নেই, একটুখানি স্নেহ ভালবাসার ছোঁয়া পেয়ে ভাবপ্রবণ মন আমার গলে জল হয়ে গেল। যতীনের দিদি মনে হলো যেন আমারও দিদি।

দিদিও বললে, একটা ভাই ছিল, আজ মনে হচ্ছে যেন দুটো হলো।

সেকথা দিদি তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রেখেছিল। যতীনের মত আমিও তার ভাই হয়ে গিয়েছিলাম। আজ আর ইহজগতে তাদের কোথাও খুঁজে পাব না। যতীনও নেই, দিদিও নেই। কিন্তু এই দুটি মানুষের অবিচ্ছিন্ন সংস্পর্শে আমি যে অমৃতের আস্বাদ পেয়েছিলাম, আজও আমার কাছে তা অম্লান হয়ে আছে।

নজরুলের খবর নিতে গিয়ে আমি এই দিদিকে পেলাম। শুধু দিদির কথা নিয়েই বিরাট একটা উপন্যাস লেখা চলে। অসামান্য রূপ আর গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল এই নারী। কি বিচিত্র অদ্ভুত তার জীবনের কাহিনী। সময় পাই তো পরে বলবো সেকথা।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর দিদির ঘরে গিয়ে বসলাম। যতীন শুয়ে পড়লো দিদির খাটের ওপর। আমি বসে বসে একখানা বই পড়ছিলাম। দিদি খেয়ে এসে বললে, আজ আর তোমাদের যেতে দিচ্ছি না। তুমিও শুয়ে পড়।

বললাম, দিনে আমি ঘুমোই না।

যতীনের নাক ডেকে উঠলো। দিদি বললে, ওমা, যতীন ঘুমিয়ে পড়লো! ঘুমোক।

বলেই দিদি চলে যাচ্ছিল। কিন্তু যে-কথা জানবার জন্যে আমি এখানে এসেছি সেকথা জিজ্ঞাসা করবো কখন? এই তার উপযুক্ত সুযোগ ভেবে ডাকলাম, দিদি।

দোরের কাছে ফিরে দাঁড়ালো দিদি।—কি রে!

বললাম, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো আপনাকে?

—আপনি আপনি করিসনে বাপু, নে কি বলবি বল!

হাসতে হাসতে দিদি তার খাটের ওপর চেপে বসলো।

জিজ্ঞাসা করলাম, নজরুল—মানে তোমাদের দুখু, কি করতো এখানে?

দিদি সেকথার জবাব না দিয়ে আমাকেই পাল্টা জিজ্ঞাসা করে বসলো, ও আজকাল ইস্কুলে পড়ছে, না?

বললাম, হ্যাঁ, খুব ভাল ছেলে। ডবল প্রমোশন পেয়ে দুটো ক্লাশ ডিঙিয়ে একবারে সেকেণ্ড ক্লাশে চলে এসেছে। আমাদের সঙ্গে।

—ও তো শিয়াড়শোলে, আর তোরা—

—রাণীগঞ্জে।

—তোর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে বুঝি?

বললাম, হ্যাঁ। ওদের বোর্ডিং আমাদের বাগানের পাশেই। কি সুন্দর কবিতা লেখে দিদি, তুমি যখন যাবে রাণীগঞ্জে, তখন দেখাবো।

দিদি বললে, গানও গাইতে পারে।

বললাম, হ্যাঁ, নিজেই লেখে, নিজেই গায়।

দিদি বললে, গান প্রথমে সে গাইতে চাইতো না। গাইতে বললেই লজ্জায় মাথা হেঁট করে বসে থাকতো। বলতো, আমার গলা ভাল নয়। তারপর লজ্জা যখন ভেঙে গেল, তখন আবার থামতে চাইতো না।

কিন্তু যে কথাটি আমি জানতে চাই, সেটা যে দিদি বলতে চাইছে না কিছুতেই। যতবার জিজ্ঞাসা করি, ততবারই অন্য কথা বলে চাপা দেয়।

জানবার এইটেই উপযুক্ত সময়। যতীন নাক ডাকিয়ে

ঘুমোচ্ছে, দিদির হাতে কোনও কাজ নেই, জামাইবাবু এলে হয়ত কথাই বলতে পারবো না, তাই আবার আমি দিদিকে বললাম, বল-না দিদি, নজরুল কেমন করে এখানে এসেছিল আর চলেই-বা গেল কেন ?

দিদি বললে, ও কি ওই কাজ করবার জন্যে জন্মেছে ? আর আমরাই-বা রাখবো কেন ?

তারপর অনেক কষ্টে দিদির কাছ থেকে আমি যেটুকু জেনেছিলাম তা এই :

দিদির স্বামী ব্র্যাঞ্চ লাইনের গার্ড সাহেব, গাড়ি নিয়ে ডিউটিতে বেরিয়েছেন। শীতকালের রাত্রি। গাড়ি দাঁড়ালো গিয়ে একটা স্টেশনে। কয়লাকুঠির দেশ। কয়লা-ভর্তি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সাইডিং-লাইনের ওপর। সেগুলো টেনে এনে জুড়তে হবে গাড়ির সঙ্গে। তারপর গাড়ি ছাড়বে। অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে চুপচাপ।

লাইনের ধারে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা আম-কাঁঠালের বাগান। সেই বাগানেই একটা গাছের নিচে চট বিছিয়ে কতকগুলো লোক গানের আসর জমিয়েছে। হারমোনিয়াম বাজছে, ঢোল বাজছে, ঝুমুরের সুরে কবি গান হচ্ছে। মন্দ লাগছে না শুনতে। গার্ড সাহেব তাঁর কামরা থেকে নেমে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন সেইদিকে।

গোটাকতক লণ্ঠন জ্বলছে টিম টিম করে, আর দু'দিকে দুটো কাঁচা কয়লার গাদায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

একটা অর্জুন গাছে হেলান দিয়ে গার্ড সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনছেন। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেলেন। দেখলেন, দলের মাঝখানে বসে জোয়ান যে-ছেলেটি ঢোলক বাজিয়ে গান গাইছে, তারই কৃতিত্ব যেন সবচেয়ে বেশি। মাথায় ছোট ছোট চুল, গায়ে একটা হাত-কাটা জামা, পরনে খাটো ধুতি। হাসি যেন মুখে তার লেগেই আছে।

দুটো গান শেষ হলো। ছেলেটি উঠে দাঁড়ালো। বললে, চললাম।

সবাই তাকে ধরে বসলো, আর-একটু থাকো। ছেলেটি থাকলো না। পেরিয়ে যাচ্ছিল গার্ড-সাহেবের পাশ দিয়ে। গার্ড সাহেব তার হাতটা চেপে ধরলেন। ছেলেটি হকচকিয়ে থমকে থামলো। মাথাটা একটু তুলিয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো শুধু। সায়েবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। বড় বড় ঢলঢলে চোখ, চওড়া বুকের ছাতি! দেখে মনে হলো ছেলেটি রীতিমত ঘাবড়ে গেছে। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, সাহেব-ভীতি থাকা তখনকার দিনে স্বাভাবিক। যদিও গার্ড-সাহেবের গায়ের রং দেখলে সাহেব-সাহেব মনে হয় না।

সাহেব বললেন, তুমি এ-দলের নও তাহলে?

—না।

—কি নাম তোমার?

—দুখু মিঞা, ভাল নাম—নজরুল ইসলাম।

—মুসলমান?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সাহেব তার বুকে একটা থাপ্পড় মেরে বললেন, বাঃ!

বাসুদেব হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিল, ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছে ব্যাপারটা। দুখুকে সাহেবে ধরেছে। মানুষকে বাঘে ধরলেও মানুষ বোধ হয় এত বিচলিত হয় না! ধড়-মড় করে আসর ছেড়ে ছুটে এলো বুড়ো বাসুদেব। সাহেবের কাছে এসে হাতজোড় করে বললে, দল আমার হুজুর, ও শুধু গান লেখে পালা লেখে, আর সুর দিয়ে দেয়। যা বলতে হয় আমাকে বলুন। আমরা তো রেলের বাউণ্ডারী ছেড়ে দূরে বসেছি হুজুর।

বাসুদেব ভেবেছিল বুঝি কোনও বে-আইনী কাজ তারা করে ফেলেছে, যার জন্য সাহেব ধরেছে দুখু মিঞাকে।

সাহেবের বেশ মজা লাগলো। বললেন, তা গাঁ ছেড়ে এসে এখানে আসর বসালে কেন?

বসুদেব বললে, গাঁয়ের ছোঁড়াগুলো ভারি গোলমাল করে হুজুর। আর এ-জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। তবে সত্যি কথাটা বলি হুজুর আপনার কাছে, শুনুন। মদনের দোকান-ঘরের পাশে যে

টিনের চালা-ঘরটা আছে, ওইখানে আমরা আসর বসাচ্ছিলাম। বেশ চলছিল। মদন মাঝে-মাঝে বলছিল বটে—তোমরা অন্য কোথাও ছ্যাখো ভাই, আমার বৌ-বেটি ঘরের কাজ-কর্ম ছেড়ে তোমাদের গান শুনতে বসে যায়, রাত্তিরে ভাল করে রান্না পর্যন্ত করে না। কথাটা আমি গ্রাহ্যই করিনি। কিন্তু পরশু হলো কি, মদনের বড় মেয়েটা দু-খিলি পান আমাদের এই দুখু মিঞার হাতে গুঁজে দিয়ে বলে কিনা, এসো দুখু, মোড়ল-পুকুরের ঘাটে বসে আমাকে তোমার সেই গানটা শিখিয়ে দেবে এসো! ব্যাপারটা মদন দেখে ফেললে। বাস্, তাই না দেখে মেয়েটাকে মদন হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে লাগালে বেধড়ক্ মার। এর পর আর আমরা সেখানে যেতে পারি? কই, আপনিই বলুন হুজুর। অথচ দু'-দুটো বায়না, মহড়া না দিলেই নয়। তাই নিরিবিলি এইখানে এসে বসেছি হুজুর। আপনি একটু হুকুম দিয়ে দিন। আজকের দিনটা আর কালকের দিনটা। ব্যস্ তারপর আমরা জায়গা দেখে নেবো।

রেল-লাইন ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে বাগানে বসে গান গাইছে তারা। হুকুমের দরকার হয় না। তবু গার্ড সাহেব বললেন, আচ্ছা যাও, হুকুম দিলাম। কিন্তু তুমি এসো আমার সঙ্গে।

এই-না বলে নজরুলকে নিয়ে গার্ড সাহেব তাঁর ট্রেনের কামরায় এসে উঠলেন। বললেন, এই যে তুমি ওদের কাজ করে দাও এর জন্যে ওরা তোমাকে কি দেয়?

নজরুলের মুখে আবার সেই হাসি।—দেবে আবার কি? শখের দল তো!

তোমার বাড়ির অবস্থা বুঝি খুব ভাল।

মাথা হেঁট করে ঘাড় নেড়ে নজরুল বললে, না।

সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কাজকর্ম কিছু করবে?

নজরুল বললে, পেলে তো করি। দিন-না একটা!

সাহেব বললেন, আমার সঙ্গে থাকতে হবে।

—থাকবো।

—গান শোনাতে হবে।

—শোনাব।

ব্যস্। সেইদিনই কাজ পেয়ে গেল নজরুল। রাত্রে বাড়ি পর্যন্ত গেল না। বাসুদেবকে বলে দিলে, মাকে বলে দিও, আমি একটা কাজ পেয়েছি।

চমৎকার কাজ। রেল-স্টেশন থেকে প্রসাদপুরের বাংলো মাত্র মাইল-দেড়েক পথ। এই দেড় মাইল কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে গার্ড সাহেবকে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া। এই হলো প্রথম কাজ। দ্বিতীয় কাজ—টিফিন-ক্যারিয়ারে খাবার ভর্তি করে প্রসাদপুর থেকে নিয়ে আসা। তৃতীয় কাজ একদিন অন্তর ট্রেনে চড়ে আসানসোল যাওয়া আর সেখান থেকে বিলিতি মদ কিনে আনা।

আর-একটি কাজ তার ছিল। গার্ড সাহেবকে গান শোনানো। সে কাজ করবার সময় অবশ্য তার ছিল প্রচুর, কিন্তু গার্ড সাহেবের অবসর ছিল না শোনবার।

তবু এক-একদিন নেশার ঝোঁকে সাহেব বলতেন, শোনাও দেখি তোমার একখানা গান!

গান তো সে গাইতেই চায়, কিন্তু বাজাবার যন্ত্র কোথায়?

যন্ত্র আছে প্রসাদপুরের বাংলোয়। হারমোনিয়াম আছে, পিয়ানো আছে।

সাহেব বলেছিলেন, তাহলে কি প্রসাদপুরে গিয়ে তোমার গান শুনতে হবে নাকি?

গাইতে যখন বলেছেন, তখন গাইতেই হবে।

বুক বাজিয়ে টেবিল বাজিয়ে নজরুল শোনাতো তার গান। কিন্তু নাঃ, এরকম করে গান গেয়েও সুখ নেই, শুনেও সুখ নেই।

সাহেব কিন্তু তাইতেই খুশী!

নজরুলকে তখন তিনি সত্যিই ভালবেসে ফেলেছেন। বলতেন, ভাল করে বাজনা বাজিয়ে মেম-সাহেবকে একদিন শুনিয়ো তোমার গান। সেইদিন আমিও শুনবো।

একদিন কেন, মেম-সাহেব অনেক দিন শুনেছে তার গান। কিন্তু প্রসাদপুরের বাংলোয় প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সাহেবকে পাওয়া

গেল না কোনদিন, কাজেই বাজনার সঙ্গে নজরুলের গান তাঁর শোনাও হল না।

রেলের ফিরিঙ্গী কর্মচারীদের জন্মে কয়েকটি বাংলো ছিল জংশন স্টেশনে। তাদেরই একটিতে থাকতো এক আধবুড়ো সাহেব, আর তার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। এইখানেই ছিল গার্ড সাহেবের আড্ডা। রেলের ডিউটি শেষ হবামাত্র সাহেব একরকম ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হতেন এই বাংলোর ফটকে। ডাকতেন, পল!

ডাকবামাত্র ভেতর থেকে শোনা যেতো, কাম ইন!

বাংলোর ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতো হয় পল, নয় তার স্ত্রী নোরা।

নোরা আলু ভেজে ডিম ভেজে কোনদিন-বা মাংস রান্না করে টেবিল সাজিয়ে বসে থাকতো। গার্ড সাহেব গিয়ে বসতেন তাদের সঙ্গে। তারপর তাঁর চামড়ার স্যুটকেশটি খুলে বের করতেন বিলেতী মদের বোতল। শুরু হতো তাদের মদ্যপান।

নোরা দু এক পেগ খেয়েই উঠে পড়তো। পল অবশ্য তার চেয়ে একটু বেশি খেতো, কিন্তু আমাদের গার্ড সাহেবের খাওয়া আর শেষ হতে চাইতো না। একাই বসে বসে পেগের পর পেগ চালিয়ে যেতেন।

এখন যদি-বা একটু সংযত হয়েছেন, আগেকার দিনে কারও নিষেধ বারণ তিনি শুনতেন না। যতক্ষণ না বেহুঁশ হয়ে টেবিলের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন, ততক্ষণ সমানে চলতো তাঁর মদ্যপান। পল ও নোরা এক-একদিন ভারি বিপদে পড়তো। দু'জনে ধরাধরি করে অতি কষ্টে তাঁর সেই বিরাট দেহটিকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিত। সকালে ঘুম ভাঙতেই দিব্যি ভাল মানুষটির মত মুখ হাত ধুয়ে এক কাপ চায়ের জন্মে টেবিলের ধারে চুপটি করে বসে থাকতেন।

নোরা নিজের হাতে চা তৈরি করে এনে এক একদিন জিজ্ঞাসা করতো, আচ্ছা বলতে পারো মিস্টার গোস্, এই রকম করে মদ খেয়ে তুমি কি আনন্দ পাও?

গার্ড সাহেব বলতেন, ওসব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না নোরা, বলতে পারবো না।

নোরা অবশ্য কিছু কিছু জানতো। পলের কাছ থেকে শুনেছে।

গার্ড সাহেবের চার পুরুষ ধরে ক্রিশ্চান। তবু তাদের বংশের কেউ কোনদিন একটা ইংরেজ মেয়ে বিয়ে করে ঘরে আনেনি। খাস ইংরেজ না হোক অন্তত পক্ষে ফর্সা একটা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েও যদি আসতো তো গায়ের চামড়াটা তাদের এত কালো হতো না। তাই তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—বিয়ে যদি করতে হয় তো মেম বিয়ে করবেন। তাঁর পিতামহের ছিল বিরাট কাঠের কারবার। মৃত্যুর পর তাঁর সেই কারবার সমেত প্রচুর ধনসম্পত্তি রেখে যান তাঁর ছেলের জন্যে। গার্ড সাহেবের বাবা ছিলেন অন্য ধরনের মানুষ। কারবার তিনি চালাতে পারলেন না। নগদ টাকা নিয়ে বেচে দিলেন এক চীনা ভদ্রলোককে। বাপের মৃত্যুর পর গার্ড সাহেবের হাতে এলো অনেক টাকা। তখন তিনি যুবক। দামী দামী স্যুট পরেন, রেল কোম্পানীর ইউরোপীয়ান কোয়ার্টারের আশে-পাশে ঘুরে বেড়ান, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বখাটে ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে আড্ডা মারেন, আর নিজের গায়ের কালো রংটার জন্যে আফসোস করেন। দুটো জিনিস তখন তাঁর খুব ভালভাবে রপ্ত হয়ে গেছে। ভুল ইংরেজীতে ফড় ফড় করে কথা বলে যাওয়া, আর প্রত্যহ নিয়মিতভাবে একটু একটু করে মদ খাওয়া। তাঁদের আদি বাড়ি ছিল সাহেবগঞ্জে। সেইখানেই এক ইউরোপীয়ান রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার দয়া করে তাঁকে রেলের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতার সে ঋণ অবশ্য তিনি পরিশোধ করবার চেষ্টা যে করেননি তা নয়। সেই ইঞ্জিনীয়ারের যুবতী কন্যাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলেন আসানসোলে পলের বাসায়। পল তখন সেখানে সামান্য এক ফিটার মিস্ত্রির কাজ করতো। নিতান্ত নিরীহ বেচারা পল তার এই বন্ধুর মতলব বুঝতে পেরে সাবধান করে

দিয়েছিল মেয়েটিকে। সেই রাত্রেই, মেয়েটি আমাদের সাহেবের গালে একটি চড় মেরে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গিয়েছিল তার বাবার কাছে। সেই লজ্জায় তিনি জলের দামে বিক্রি করে দিয়েছিলেন সাহেবগঞ্জের বাড়িঘরদোর, যা কিছু সব। সাহেবগঞ্জের সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে তিনি বদলি হয়ে এলেন আসানসোলে। সেখান থেকে এই কোল্ ডিস্ট্রিক্ট অঞ্চলের এই ব্রাঞ্চ লাইনের গার্ড। ভেবেছিলেন এইখানে একটি বাড়ি তৈরি করে এবার ভাল মানুষের মত বাস করবেন। তৈরি করলেন প্রসাদপুরের এই বাংলো। গৃহ হলো কিন্তু গৃহিণী কোথায়? প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন গার্ড সাহেব। চেষ্টার ফল ফললো অচিরেই। ফিরিঙ্গী বন্ধু আর বান্ধবী জুটলো অনেকগুলি। জলের মত টাকা খরচ হতে লাগলো আর সেই টাকার লোভে গৃহিণী একজন এলেন সাদা চামড়া অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। কিন্তু বেশিদিন তিনি রইলেন না, তিন চার মাস পরেই শুরু হলো তাঁদের ঝগড়াঝাটি। ছ' মাসের ভেতরেই সব খতম।

এইখানেই শেষ নয়। তার পরেও এসেছিল, আরও দুটো মেয়ে। পল তাদের দেখেই বলেছিল, এরা পালাবে।

একটা পালিয়েছিল এক মাস পরে। আর একজন ছিল তিন মাস।

পল তখনই বলেছিল, তুমি একটি বাঙালী মেয়েকে বিয়ে কর গোস্। বাঙালী মেয়েরা অনেক ভাল।

সাহেব বলেছিলেন, তোমার নোরা তো বাঙালী নয় পল।

বাঙালী না হলেও নোরার জন্যে পল যা করেছে, আর কেউ তা করতো বলে মনে হয় না। পল যখন নোরাকে বিয়ে করে, নোরার সঙ্গে তখন তার প্রথম পক্ষের একটি মেয়ে। মেয়েটির বয়স তখন ন' বছর। মেয়েটি দেখতে সুন্দরী কিন্তু বিকলাঙ্গ। বসে যখন থাকে, তখন কিছু বুঝতে পারা যায় না। উঠে দাঁড়ালেই দেখা যায়—কোমরটি বাঁকা, পা-দুটি ঠিক জায়গায় পড়ে না, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। নোরা ভেবেছিল

এই মেয়েটি যতদিন তার সঙ্গে থাকবে, ততদিন কেউ তাকে বিয়ে করবে না। কেনই-বা করবে? একে পরের মেয়ে, তার ওপর বিকলাঙ্গ। তাই নোরা তখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে মেয়েটিকে অতিকষ্টে মানুষ করছিল। বিয়ের আগে নোরা তাই পলকে বলেছিল, 'বিয়ে তুমি আমাকে করছো বটে, কিন্তু আমার এই খোঁড়া মেয়েটাকে কতদিন তুমি সহ্য করবে জানি না।'

পল কিন্তু তাকে সত্যিই সহ্য করেছে। ন' বছরের ছোট সেই মেয়েটি আজ সতেরো বছরের যুবতী।

পলের ধারণা, নোরা সেই কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করছে। নইলে তার সংসারে এত কষ্ট সহ্য করে নোরা হয়ত এতদিন থাকতো না।

যদিও সে অনেক দিন আগেকার কথা, তবু পলের উপদেশ গার্ড-সাহেবের বোধ হয় মনে ধরেছিল। কিন্তু তাঁদের বাঙালী ক্রিশ্চান সমাজটাকে তিনি চেনেন। সুন্দর ছেলে যদি-বা পাওয়া যায়, সুন্দরী মেয়ে সেখানে দুর্লভ। কাজেই দু' এক জায়গায় চেষ্টা করে গার্ড সাহেব সে-আশা পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে সংবাদ পেয়ে গেলেন একটি পরমা সুন্দরী মেয়ের। তারপর কেমন করে কে জানে, হয়ত-বা তাঁর বাইরের চাকচিক্য আর টাকার জোরেই তাকে বিয়ে করে তিনি ঘরে নিয়ে এলেন।

প্রসাদপুরের বাংলোর চেহারা গেল ফিরে। কাউকে অবশ্য না জানিয়েই বিয়েটা তিনি করেছিলেন।

পল আর নোরা বৌ দেখতে চাইলে। লোলা জেদ ধরে বসলো সেও দেখবে।

কিন্তু লোলার পক্ষে প্রসাদপুর পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া অসম্ভব। সাহেব একখানা ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে এলেন রাণীগঞ্জ থেকে। সবাই গিয়ে বৌ দেখে এলো। নতুন করে আবার একটা উৎসবের আয়োজন করেছিলেন সাহেব।

তা উৎসব করবার মত বৌ তিনি এনেছেন বাড়িতে, তাতে আর সন্দেহ রইল না কারও।

পল বলেছিল, এবার তুমি মদ্যপানের অভ্যেসটি একেবারে ছেড়ে দাও মিস্টার গোস্।

গোস্ সেদিন বলেছিলেন ছেড়ে দেবেন। ভগবানের নামে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা তাঁর রইলো কোথায়?

পলের বাড়িতে প্রতিদিন নিয়মিত বসতে লাগলো তাঁর মদ্যপানের আসর।

গার্ড-সাহেবকে চটাতে ভয় হয়। অথচ মদ্যপানের কথা বললেই সাহেব চটে যান।

সাহেব বলেন, ওই তো একটা ছেলে আমার সঙ্গে যায় রোজ, আমি মাতাল হই কিনা ওকে জিজ্ঞাসা কর। দুখু! দুখু!

অন্য সময় না হোক অন্তত এই সময়টায় দুখু মিঞাকে কাছাকাছি কোথাও থাকতে হয়। সাহেবের চামড়ার ব্যাগটি হাতে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে প্রসাদপুরের বাড়িতে।

পলের বাংলোটি ছোট। কাছাকাছি থাকতে হলে বাংলোয় ওঠবার সিঁড়ির একটা ধাপে বসে থাকতে হয় দুখুকে।

তাই সে থাকতো। কিন্তু কয়েকদিন হলো বাইরে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। পাশেই লোলার ঘর। লোলা সেদিন নিজেই তাকে ডেকে বলেছে, বাইরে কেন বসে আছো দুখু, ভেতরে এসে বসো।

সেদিন থেকে নজরুল লোলার ঘরে গিয়ে বসে। লোলার সঙ্গে গল্প করে।

চমৎকার বাংলা বলে লোলা।

সাহেবের ডাক শুনেই নজরুল ছুটে বেরিয়ে গেল লোলার ঘর থেকে। জিজ্ঞাসা করলে, কি বলছেন?

সাহেব কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, পল তাঁকে থামিয়ে দিলে। বললে, না, কিছু বলেননি। তুমি যাও।

নজরুল ফিরে আসছিল, সাহেব বললেন, না, যেয়ো না তুমি।

মনিবের কথা, অমান্য করা চলে না। নজরুলকে থামতে হলো।

সাহেবের চোখে তখন রং ধরেছে। বললেন, তুমি তো রোজ আমার সঙ্গে থাকো। বল তো, আমি মাতাল হই?

নজরুল বললে, আজ্ঞে না।

সাহেব বললেন, পল, শুনলে তো! নাও, ঢালো এবার। বলেই তিনি তাঁর হাতের গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরলেন।

আর বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। নজরুল বললে, শেষ হলে ডাকবেন। আমি এইখানেই আছি।

এই বলে সে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসে ঢুকলো লোলার ঘরে।

লোলা বললে, মিছে কথা বললে যে?

নজরুল বললে, না, মিছে কথা আমি বলি না।

লোলা হাসতে লাগলো।—'সায়েব মাতাল হয় না, এই কথা তুমি বললে?'

নজরুল বললে, শুনবে তবে?

—বল।

নজরুল বললে, এখান থেকে প্রসাদপুর যেতে কত সময় লাগা উচিত, বলতে পারো?

লোলা বললে, আমি কি কোনোদিন গেছি যে, জানবো? তাছাড়া আমি খোঁড়া মানুষ, তোমাদের যদি এক ঘণ্টা লাগে তো আমার লাগবে পাঁচ ঘণ্টা।

নজরুল বললে, আধ ঘণ্টার পথ, আমাদের লাগে দু ঘণ্টা। সায়েব টলতে টলতে চলে, বারে বারে হোঁচট খায়, দড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়ে রাস্তার ওপর, হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলেই কিন্তু চেঁচিয়ে ওঠে, বলে, খবরদার বলছি গায়ে হাত দিও না, আমি মাতাল হইনি।

কথাটা শুনে লোলা হো হো করে হেসে ওঠে। নজরুল বলে, হাসছো কেন? বল, আমি মিছে কথা বলেছি?

হাসতে হাসতে লোলা মাথা নেড়ে বলে, না।

নজরুল বলে, এমনি রোজ। দেয়াল ধরে ধরে বাড়ি ঢুকে সোজা একেবারে বিছানায়।

হাসি থামিয়ে লোলা জিজ্ঞাসা করে, ওয়াইফ্ কিছু বলে না ?

কথাটার জবাব দিতে পারে না নজরুল। মাথা হেঁট করে খানিক চুপ করে থেকে বলে, জানি না।

পলের কোয়ার্টারের পেছন দিকে কিচেন-গার্ডেন করবার মত খানিকটা জায়গা ছিল কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা। নোরার ইচ্ছে ছিল সেখানে দুটো আনাজপাতির গাছ লাগাবার। কিন্তু সংসারের সবদিক একা দেখতে গিয়ে সময় পায় না বেচারা। মনের সাধ মনেই থেকে যায়।

লোলা তার মায়ের সেই অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করেছে। পাশের কোয়ার্টারের মালির কাছ থেকে গোটা চার-পাঁচ দোপাটি আর গাঁদা গাছ চেয়ে নিয়ে পুঁতেছিল সেই বাগানে। আর পুঁতেছিল একটি লাউ-এর বীজ।

সেই দোপাটি আর গাঁদার গাছে ফুল ফুটেছে। আর কাঁটা তারের বেড়া বেয়ে লাউ-এর লতা উঠেছে।

লোলার আনন্দের আর সীমা নেই। দেখা যায় প্রতিদিন ভোরে উঠে সে তার ক্যানভাসের চেয়ারটি টানতে টানতে বাগানের ধারে নিয়ে এসে চুপটি করে বসে থাকে।

একদিন সে নোরাকে ডেকে বললে, না মা, কাল থেকে আর আমি এখানে বসবো না।

—কেন রে ?

লোলা বললে, আজ ক'দিন থেকেই একজন সায়েব এসে আমাকে নানারকম কথা জিজ্ঞাসা করছে। বলছে, সৎ বাপের সংসারে তুমি কি সুখে আছ লোলা ? আমার সঙ্গে চলে এসো। আমি তোমাকে বিয়ে করবো।

নোরা বললে, কথাটা তক্ষুনি আমাকে বললি না কেন ?

লোলা বললে, আমি তো তার সুমুখে উঠে দাঁড়াতে পারি না মা।

—চেঁচিয়ে ডাকলেই তো পারতিস।

লোলা বললে, দু'বার ডেকেছিলাম, তুমি শুনতে পাওনি।

বলেই সে ঘন-ঘন তাকাতে লাগলো তার মুখের দিকে নোরা জিজ্ঞাসা করলে, কিছু বলবি ?

লোলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, প্রথমে ভেবেছিলান— ভাল কথা বলছে বলুক। তাই প্রথম দু'দিন তোমাকে ডাকিনি। তারপর ধীরে ধীরে আমার কেমন যেন মনে হতে লাগলো। মনে হলো, লোকটার সব মিছে কথা। লোকটা অভিনয় করছে। বললাম, আমার মাকে বল। তখন সে কি বললে জানো? বললে, না, তোমাকে আমার সঙ্গে পালাতে হবে। যদি না যাও, আমার লোক জোর করে তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে। তখন ভয় পেয়ে যেই ডাকলাম তোমাকে, লোকটা তক্ষুনি পালিয়ে গেল।

নোরা বললে, এবার এলে ডেকে দিস।

লোলা বললে, আমি আর বাইরে বেরুবোই না।

দিনকতক পরে, একদিন দুপুর বেলা পল তখন কাজে বেরিয়ে গেছে, নোরা আর লোলা—দুটো মেয়ে মাত্র বাড়িতে, এমন সময় এক বুড়ো সাহেব, হাতে লাঠি, চোখে চশমা, হঠাৎ এসে দাঁড়ালো নোরার কাছে।

লোকটাকে দেখে নোরা চমকে উঠেছিল প্রথমে।

—হ্যালো নোরা, হাউ ডু উ ডু !

গলার আওয়াজ শুনে চিনতে দেরি হলো না।

প্রথম যৌবনে ভালবেসে যাকে বিয়ে করেছিল, তার সেই প্রথম পক্ষের স্বামী বেট্‌স্। লোলার বাবা।

নোরা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো তার মুখের দিকে।—বললে, এত বুড়ো হয়ে গেছ তুমি ?

বেট্‌স্ বললে, বয়েসও ত কম হলো না।

গায়ের জামাটা ছেঁড়া, প্যাণ্টের হাঁটুর নীচে অনেকখানা সেলাই করা। নোরা জিজ্ঞাসা করলে, এরকম দুর্দশা তোমার হলো কেমন করে ? তোমার এত টাকা—

বেট্‌স্ বললে, আজ আর তার একটিও নেই।

গলার আওয়াজটা ধরে এলো।

নোরার কেমন যেন দয়া হলো লোকটির উপর। জিজ্ঞাসা করলে, কি খাবে বল।

নোরারও খুব স্বচ্ছল সংসার নয়। তবু তার মনে হলো বেট্‌স্‌কে যদি অন্তত একটা ডিমের ওমলেট আর এক পেয়ালা চাও সে খাওয়াতে পারে, মনে যেন একটু তৃপ্তি পাবে।

বেট্‌স্‌ কিন্তু কিছুতেই খেতে চাইলে না। বললে, নো। থ্যাঙ্কস্‌। খেতে আমি আসিনি। আমি যে-জন্যে এসেছি শোনো। লোলাকে আমি নিয়ে যাব।

এতদিন পরে এ আবার কিরকম কথা!

অনুনয় বিনয় নয়, কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটা বলিষ্ঠ দাবীর আভাস পাওয়া গেল। বললে, তাকে নিতেই আমি এসেছি।

হঠাৎ যেন সুর কেটে গেল নোরার মনের। লোকটির সাজসজ্জা, লোকটির চেহারার সঙ্গে কথার যেন কোনও মিল নেই। এর চেয়ে বিনীতভাবে যদি সে তার নিজের কন্যাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইতো, নোরা বিপদে পড়তো, সহজে জবাব দিতে পারতো না।

নোরাও কেমন যেন একটু কঠিন হয়ে উঠলো। বললে, খোঁড়া মেয়েটাকে এতদিন পরে হঠাৎ তোমার কেন মনে পড়লো বলতে পারো?

—সে কৈফিয়ত আমি দিতে পারবো না। তুমি তাকে দেবে কিনা তাই বল।

বেট্‌স্‌ তার মোটা লাঠিটা মেঝের ওপর বারকতক ঠুকলে খুব জোরে জোরে।

নোরা বললে, যদি বলি দেবো না!

—পারবে আটকে রাখতে?

নোরা বললে, দুপুর বেলা তুমি কি মদ খেয়েছো বেট্‌স্‌?

বেট্‌স্‌ বললে, হ্যাঁ, খেয়েছি।

নোরা বললে, মাতালের কথা আমি বিশ্বাস করি না। তুমি যেতে পারো।

—লোলাকে না নিয়ে আমি যাব না।

—নিয়ে যাবে কি জোর করে?

বেট্‌স্ বললে, হ্যাঁ। দরকার হলে আমি তাও পারি।

—বুঝেছি। যে-লোকটা লোলাকে বিয়ে করবে বলেছিল, সে তাহলে তোমারই লোক।

—হ্যাঁ, আমারই লোক। লোলাকে সে বিয়ে করতেই চায়।

—লোলাকে সে ভাল করে ছাখেনি নিশ্চয়ই।

—দেখেছে।

—সে-দেখা নয়। লোলাকে শুধু বসে থাকতে দেখলে মনে হয় খুব সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে দেখলে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয়।

বেট্‌স্ বললে, তবু সে তাকেই বিয়ে করবে।

নোরা বললে, তারপর? যখন তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে? তখন কি হবে?

বেট্‌স্ বললে, ছাড়াছাড়ি হবে কেন?

নোরা বললে, আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল কেন? আমি তো কদাকার কুৎসিত ছিলাম না, লোলার মত খোঁড়া ছিলাম না।

বেট্‌স্ সেকথার জবাব দিতে পারলে না। বললে, তোমার সঙ্গে তর্ক আমি করতে চাই না। লোলাকে তুমি এমনিতে ছাড়বে না এই কথাই আমি জেনে গেলাম। দেখি তুমি কেমন করে ওকে রাখতে পারো।

এই কথা বলে বেট্‌স্ উঠে দাঁড়ালো। তারপর কটমট করে নোরার দিকে একবার তাকিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

নোরার মাথাটা তখন ঘুরছে। কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। লোকটি কোন্‌দিকে যায় দেখবার জন্যে বাইরে বেরিয়ে এলো সে। কিন্তু যাকে দেখবার জন্যে সে বেরিয়ে এলো, তাকে দেখতে গিয়ে নজরে পড়লো, লোলা তার ঘরের চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার জন্মদাতা পিতার দিকে।

হতভাগী সবই শুনেছে তাহলে।

নোরার চোখ থেকে টস টস করে দু'ফোঁটা জল পড়লো তার জামার ওপর। চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে গেল।

বিকলাঙ্গ ওই খোঁড়া মেয়েটাকে নিয়ে সারাদিন সে একাই থাকে তাদের এই কোয়ার্টারে। দুপুরে আশ-পাশের কোয়ার্টারগুলোও ফাঁকা হয়ে যায়। বেট্‌স্ যদি সত্যিসত্যিই জোর করে নিয়ে যেতে চায় লোলাকে?

পলকে বলে কোনও লাভ নেই। বেচারা কষ্ট পাবে শুধু শুধু।

তার একমাত্র ভরসা গার্ড-সাহেব।

পুলিশে খবর দিলে কেমন হয়? নোরা ভাবলে, আসুক মিস্টার ঘোষ, তাকে জিজ্ঞাসা করবে—কি তার করা উচিত।

গার্ড-সাহেবের আসার আশায় বসে রইলো নোরা।

মোটা একটা শালকাঠের টুকরো পড়েছিল বাগানের কাছে। নোরা সেইটে হাতে নিয়ে লোলার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। লোলা হাসতে হাসতে বললে, একি? তুমি আমাকে মারবে নাকি মা?

এত দুঃখেও নোরার মুখে ম্লান একটু হাসি দেখা গেল। বললে, নে, এইটে রাখ্ হাতের কাছে।

ঘরের জানলাটা সে খুলে দিলে। দিয়ে বললে, ঘরে খিল বন্ধ করে বসে থাক লোলা। তোর বাবাকে আর আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

বলতে বলতে আবার তার চোখ দুটো সজল হয়ে এলো।

লোলা তার মাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলে। বললে, তুমি ভেবো না মা, তোমার কাছ থেকে কেউ আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না।

আরও কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু গলাটা তার ধরে এলো। কিছুই সে বলতে পারলে না। হরিণের মত জলে-ভরা দুটি চোখ তার মায়ের দিকে তুলে ধরে শুধু ডাকলে, মা!

ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজলো, আর দেখা গেল আপনমনে গান গাইতে গাইতে নজরুল আসছে। আজকাল রোজই সে

ঠিক এই সময়েই আসে প্রসাদপুর বাংলো থেকে। সাহেবের ডিউটির সঙ্গে সঙ্গে তারও ডিউটির সময় বদলে যায়।

নজরুলকে দেখে নোরা খানিকটা আশ্বস্ত হলো। তবু একজন জোয়ান ব্যাটাছেলে এলো বাড়িতে!

এইবার পল আসবে। তারপর আসবে গার্ড-সাহেবের গাড়ি।

লোলার ঘরের দোরটা বন্ধ দেখে নজরুল ফিরে আসছিল, নোরা ডাকলে, লোলা, দরজা খোল্!

উনোন ধরে গেছে। নোরা গিয়ে ঢুকলো রান্নাঘরে। খাবার তৈরি করতে হবে। এক্ষুনি এসে পড়বে সবাই।

ঠিক সময়ে পল এলো। তার সামনে খাবার ধরে দিয়ে নোরা বসলো তার সুমুখে। বেট্‌সের কথা একটি একটি করে সবই সে তাকে বললে।

পল বললে, ভেবো না। লোলাকে পারবে না নিয়ে যেতে। আইন তোমার দিকে। দরকার হলে আদালতে যাব।

নোরা ম্লান একটু হাসলে। বললে, দেখে যা মনে হলো আইন-আদালতের ধার-পাশ দিয়েও সে যাবে না।

পল বললে, বুঝতে পেরেছি। ভদ্রলোকের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে। এখন সে লোলাকে বিক্রি করে কিছু রোজগার করতে চায়।

কথাটা শুনে শিউরে উঠলো নোরা। আবার তার চোখে জল এলো। বললে, দুপুরে সবাই কাজে চলে যায়, চারিদিক খাঁ খাঁ করে, বাড়িতে থাকি তো আমরা দুই মা আর মেয়ে। দুটো জোয়ান গুণ্ডা নিয়ে যদি এসে দাঁড়ায় তো কি করতে পারি আমরা?

পল একটু ভেবে বললে, কালই আমি পুলিশে একটা ডায়েরী করে রাখবো।

কথাটার নিষ্পত্তি হবার আগেই গার্ড-সাহেব এলেন।

তিনিও শুনলেন সব কথা।

শুনে তাঁর বড় বড় চোখ দুটো লাল হয়ে উঠলো। টেবিলের ওপর সজোরে এক কিল মেরে চেঁচিয়ে উঠলেন, দুখু!

নজরুল এসে দাঁড়ালো: বলুন!

—তুমি একটি কাজ করতে পারবে ?

—সব কাজই তো করছি।

সাহেব বললেন, তাহলে কোমর বাঁধো। লোলাকে নিয়ে চলে যাও আমার প্রসাদপুরের বাংলোয়। মেম-সাহেবকে বোলো, দক্ষিণদিকের ঘরখানা ওকে ছেড়ে দিতে। যে-ঘরে পিয়ানো আছে। তারপর দেখি লোলাকে কে নিয়ে যেতে পারে!

নজরুল বললে, লোলা কি পারবে অতখানি পথ হেঁটে যেতে ?

নোরা বললে, পারবে। তবে তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারবে না। দেরি হবে।

সাহেব বললেন, তা হোক। আমি রইলাম এইখানে। লোলাকে রেখে তুমি ফিরে এসো। লোলার জিনিসপত্র পরে নিয়ে যাবে।

সাহেবের যে-কথা সেই কাজ! নোরাও ভাবলে সেই ভালো। লোলাকে কিছুদিনের জন্যে সরিয়ে দিলে সব ঝঞ্ঝাট চুকে যায়।

কিন্তু যাবার সময় নোরা কি ভাবলে কে জানে। বললে, আমিও যাচ্ছি লোলার সঙ্গে। ওকে ওখানে রেখেই আমি আবার ফিরে আসছি।

এই বলে লোলার জামা-জুতো একটা স্যুটকেসে ভরে নিয়ে নোরাও বেরিয়ে পড়লো তাদের সঙ্গে।

পরের দিন দুপুরে বেট্‌স্‌ আবার এলো।

জামা ইস্ত্রি করছিল নোরা। লোলাকে রেখে এসেছে প্রসাদপুরে। বাড়িটা তার একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। চোখের জল কিছুতেই মানা মানছে না।

ঠিক এমনি সময় বেট্‌স্‌ এসে দাঁড়ালো তার কাছে। বললে, কি ঠিক করেছ বল। কাঁদছো কেন ?

নোরা বললে, কেন কাঁদছি শুনবে ? লোলা কাল রাত্রে পালিয়েছে।

কথাটা শুনেই দপ্‌ করে জ্বলে উঠলো বেট্‌স্‌। বললে, পালিয়েছে না তুমিই সরিয়ে দিয়েছ ?

—কোথায় সরাবো ? আমার সরাবার কোনও জায়গা আছে ?

এই বলে নোরা কাঁদতে লাগলো।

কি জানি কেন বেট্‌সের বিশ্বাস হয়ে গেল কথাটা। বললে, পালাবেই তো ! এতদিন পালায়নি এই যথেষ্ট। বয়েসটাও তো তার কম হয়নি !

নোরা বললে, না। পালালো তোমার জন্যে। তুমি যদি কাল চীৎকার করে ওই-সব কথা না বলতে তাহলে হয়ত এমন করে আমাকে ছেড়ে চলে যেতো না।

বেট্‌স্ জিজ্ঞাসা করলে, কার সঙ্গে পালিয়েছে জানো ?

নোরা হঠাৎ বলে ফেললে, একজন মুসলমান বয়ের সঙ্গে।

কথাটা বলেই তার মনে হলো—বলা তার উচিত হলো না।

বেট্‌স্ জিজ্ঞাসা করলে, কি নাম তার, কোথায় বাড়ি ?

নোরা বললে, তা আমি কেমন করে জানবো ?

—কার বয় তা তো জানো !

নোরা ভয়ে-ভয়ে বলে ফেললে, ব্র্যাঞ্চ লাইনের একজন গার্ড-সাহেবের বয়। তার নাম ঠিকানা জানবার জন্যে পাঠিয়েছি পলকে।

বেট্‌স্ বললে, আমি দেখছি।

এই বলে সে উঠে দাঁড়ালো।

নোরা তখন ভয়ে থর্ থর্ করে কাঁপছে। এ কি করলে সে ? এতখানি তাকে না বললেই হতো !

গার্ড-সাহেবের হদিস পেয়ে যদি সে প্রসাদপুরে চলে যায় ?

বেট্‌স্ চলে গেল। নোরা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কোনও কাজেই তার মন বসলো না।

গার্ড-সায়েব আসতেই নোরা তাকে বললে সব কথা। বললে, একটা মিথ্যা কথা বলতে গিয়ে আমার মাথার ভেতরটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল। আমি যা তা বলে ফেললাম।

সাহেব বললেন, বলেছ—বেশ করেছ। কি করবে ও ? আমার ওখান থেকে লোলাকে বের করবার সাধ্য ওর নেই।

নোরা বললে, কিন্তু, 'গার্ড-সাহেবের মুসলমান বয়' কথাটা বলা আমার অন্যায় হয়েছে।

কথাটা সাহেব হেসে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, কিছু অন্যায় হয়নি। আমার সঙ্গে বেট্‌সের দেখা হলে বলতাম—তুমি গুণ্ডা নিয়ে এসে হাঙ্গামা করতে পারো, এরা গরীব মানুষ, সহায়সম্বল কিছু নেই, তাই আমি লোলাকে নিয়ে গিয়ে রেখেছি আমার বাড়িতে। তোমার ক্ষমতা থাকে তো একবার চেষ্টা করে দেখতে পারো।

এই কথা বলবার পরেও, সাহেবের কি মনে হলো কে জানে, পরের দিন সকালে চায়ের পেয়ালাটি হাতে নিয়েই ডাকলে, দুখু!

নজরুল এসে দাঁড়াতেই বললেন, দিনকতকের জন্যে তুমি গা-ঢাকা দিতে পারো?

—পারি।

সাহেব বললেন, তাহলে আজই তুমি খেয়েদেয়ে চলে যাও।

এই বলে পঞ্চাশটি টাকা তিনি তার হাতে গুঁজে দিলেন।

টাকাগুলো হাতে নিয়ে নজরুল বললে, এত কেন?

সাহেব বললেন, এত নয়। পঁচিশ টাকা হিসেবে তোমার দু'মাসের মাইনে।

নজরুলের চাকরি এইখানেই খতম!

সেই যে সে গা-ঢাকা দিয়েছিল, জীবনে আর কোনোদিনই সে প্রসাদপুরের বাংলোয় ফিরে যায়নি।

সাত

রবিবার বিকেল। বাড়ি থেকে বেরুবো বেরুবো করছি, এমন সময় একজন ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। চেনা-চেনা মুখ, অথচ ঠিক চিনতে পারছি না। তুমি শৈল? বলেই তিনি সোজা ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লেন। ঘর-জোড়া নীচু তক্তাপোশের ওপর শতরঞ্জি পাতা। আমাদের পড়বার ঘর।

হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। জুতো খুলে তক্তাপোশের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় তিনি নিজেই দিলেন।

—শিয়াড়শোল ইস্কুলের টিচার আমি। নজরুল আমার ছাত্র।

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। দেয়ালে ঠেস দিয়ে ভাল করে চেপে বসলেন তিনি।

বিপদে পড়লাম। নজরুল ওদিকে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। মাস্টারমশাই বললেন, দেখি কি লিখেছ তুমি!

সর্বনাশ! কে বললে আপনাকে?

—নজরুল বললে, তুমি নাকি খুব ভাল পদ্য লিখতে পারো।

বললাম, ভুল বলেছে। নজরুল আমার চেয়ে অনেক ভাল কবিতা লেখে।

ভদ্রলোক কিছুতেই বিশ্বাস করেন না, খালি-খালি বলতে থাকেন, বাংলায় ভাল 'এসে-টেসে' লেখে শুনেছি। আমি তো বাংলা পড়াই না। তবে তোমার কথা শুনলাম আমি নজরুলের কাছে—চণ্ডীর কাছে…। কই দেখি, নিয়ে এসো তোমার খাতাটা।

খুব মুশকিলে পড়ে গেলাম। কবিতা লেখা, গল্প লেখা—এ-বাড়িতে অমার্জনীয় অপরাধ। খাতাটা আমি লুকিয়ে রাখি অন্য ঘরে। এনে যদি দিই, এক্ষুণি উনি জোরে জোরে পড়তে

আরম্ভ করবেন, আর সেই পড়া যদি সীতু-চাকরটা শোনে তো যেমন করে হোক ওপরে গিয়ে রায়-সাহেবকে জানিয়ে আসবে।

তার চেয়ে কবিতার খাতাটা পকেটে নিয়ে মাস্টারমশাইকে বাগানে নিয়ে গিয়ে বসাই ভালো। বাগানের পাশেই নজরুলের বোর্ডিং। ছুটে গিয়ে তাকেও ডেকে আনবো।

চট্ করে জামাটা গায়ে দিয়ে বললাম, আসুন স্যার আমার সঙ্গে।

—কোথায় ?

ওঠবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। বললেন, তার চেয়ে তোমার খাতাটা আমাকে দাও, কাল আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

—খাতা নিয়েছি, আপনি আসুন।

বলেই তাড়াতাড়ি তাঁকে তুলে নিয়ে গেলাম।

আমার খাতাটা তাঁকে দেখাতে লজ্জা করছে।

বাগানের দিকে যেতে যেতে মাস্টারমশাইকে বললাম, আপনি স্যার নজরুলের কবিতা পড়েননি তাই বলছেন। আমার খানিকটা মুখস্থ আছে, শুনবেন ?

এই বলে নজরুলের 'রাণীর গড়' কবিতার আরম্ভটা তাঁকে শুনিয়ে দিলাম।

> ওই—ঝাউএর পাহাড়ে নীরব চিতাটি রাণীমার !
> ও যে—দপ্ দপ্ জ্বলে, লোকে বলে আলো আলেয়ার।
> এই নিবে যায় এই জ্বলে ওঠে
> থমকি চমকি পিছু দিকে ছোটে,
> মিশে যায় শেষে রাজ-গড়ে উঠে
> আবার তেমনি আঁধিয়ার !
> ওই শোনা যায় দু'পহর রাতে
> ঝটিকার মুখে হাহাকার।
> ওগো রাণীমার—আহা রাণী-মার !
> ওই ঝাউএর পাহাড়ে
> নীরব চিতাটি রাণী-মার !

আরও বলতে যাচ্ছিলাম মাস্টারমশাই আমাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, তাহলে নজরুলকেই বলি। না কি-বল ?

—কি বলবেন ?

এতক্ষণ পরে তিনি তাঁর মনের কথা খুলে বললেন। বললেন, শিয়াড়শোল ইস্কুলের একজন পুরনো টিচার এখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথায় যেন চলে যাবেন। তার জন্য ছাত্রদের তরফ থেকে দুঃখুটুঃখু জানিয়ে বেশ ভাল করে একটি পদ্য লিখে দিতে হবে। সেই পদ্যটি তাঁরা ছাপবেন। তারপর একটি বিদায়সভা আহ্বান করে তাঁর গলায় ফুলের মালা দিয়ে সেই ছাপা পদ্যটি তাঁর হাতে দেবেন—এই তাঁরা স্থির করেছেন।

বললাম, তাহলে তো আপনাদের উচিত নজরুলকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া। নজরুল শিয়াড়শোল ইস্কুলের ছাত্র আর আমি রাণীগঞ্জের।

বলতে বলতেই দেখা গেল, বাগানের পথ ধরে নজরুল আমাদের দিকেই আসছে হাসতে হাসতে।

বললাম, বেশ মজা তো! মাস্টারমশাইকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছ ?

নজরুল তখনও হাসছে।

বললাম, তোমাদের টিচারের বিদায়-অভিনন্দন আমি কেন লিখবো ? তুমি লিখবে।

কবিতা লিখতে পারে না বলে প্রথমে সে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমিই তাকে রাজী করালাম। মাস্টার-মশাই-এর ওপর রইল আদায় করবার ভার।*

আমি বেঁচে গেলাম। আমার কবিতার খাতা আমার পকেটেই রয়ে গেল।

মাস্টারমশাই চলে যেতেই নজরুল বললে, এ তুমি কি করলে বল তো ?

—কি করলাম ?

*এই কবিতাটি নজরুল লিখেছিল। বিলি করবার জন্যে একটি কাগজের এক পৃষ্ঠায় তা ছাপাও হয়েছিল জানি। তার কপি কিন্তু আমার কাছে নেই। যদি কারও কাছে থেকে থাকে তো তিনি দয়া করে' আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

নজরুল বললে, এইবার লেখো বানিয়ে বানিয়ে যত-সব মিথ্যে কথা!

তা হোক! এ আর তোমার লিখতে কতক্ষণ!

নজরুল বললে, না না এইগুলো লিখতেই দেরি হয়। তা ছাড়া আমি এখন অন্য কথা ভাবছি।

ফার্স্ট ক্লাশে উঠেছি আমরা। হাতেই কোয়ার্টার্লি পরীক্ষা। ভাবলাম বুঝি পরীক্ষার পড়ার কথা বলছে।

বললাম, তুমি তো ভাল ছেলে, তোমার পরীক্ষার জন্যে ভাবনা কিসের?

নজরুল বললে, না, পরীক্ষার ভাবনা নয়। চল একটা মজা দেখিয়ে আনি তোমাকে।

এই বলে সে আমাকে টেনে নিয়ে চললো রাস্তা দিয়ে।

পথের ধারে দাঁড়িয়েছিল বংশী আর দ্বারকা। রাণীগঞ্জ ইস্কুলের ছাত্র। নজরুলকে খুব ভাল করেই চেনে। ধরে বসল, চা খেয়ে যাও।

বসতে হলো তাদের বাইরের ঘরে।

বংশী বলছে, চা খাও, আর দ্বারকা বলছে, একটি গান গাও।

নজরুল উস্‌খুস্‌ করছে। দেয়ালের বড় ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছে আর আমাকে চিমটি কাটছে। বংশী বাড়ির ভেতরে গেল চা আনতে, আর দ্বারকা হারমোনিয়াম আনবার জন্য প্রস্তুত।

দ্বারকা আমাদের চেয়ে বয়সে ছোট, পড়েও ছু'ক্লাশ নীচে। তবু সে আমাদের অনেক দিনের বন্ধু। বন্ধু হলেও তাকে তিরস্কার করতে আটকায় না। ধমক দিতেই সে চুপ করে বসল।

চা আনতে দেরি হলো না বংশীর। চা খেয়েই উঠলাম।

বললাম, খুব জরুরী একটা কাজ আছে নজরুলের।

জরুরী কাজটা যে কী, তখনও আমি জানি না কিন্তু।

পথে যেতে যেতে আবার ডাক পড়ল পেছনে।—শোনো! শোনো! যাচ্ছ কোথায়?

এই রে! গোপেশ্বর ডাকছে। সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর গোপেশ্বর

পাল। বিলেত থেকে যিনি যথেষ্ট সম্মান নিয়ে এসেছিলেন। ভারতজোড়া খ্যাতি লাভ করেছিলেন যে প্রতিভাবান শিল্পী—স্বর্গীয় সেই গোপেশ্বরের জীবনের একটি অজানিত অধ্যায় আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর সেই হতভাগ্য শিল্পী জন্মগ্রহণ করেছিল ইংরেজের বাজত্ব ভারতবর্ষের এই বাংলাদেশে। তাই তার যৌবনদিনে 'আপন গন্ধে ফিরি মাতোয়ারা কস্তুরীমৃগ সম' ছুটে বেড়াচ্ছিল যেখানে-সেখানে। যে-বিদ্যায় ছিল তার জন্মগত অধিকার, তার কোনও সম্মান নেই, স্বীকৃতি নেই, কি করবে সে, কোথায় যাবে—কিছুই ঠিক করতে না পেরে একদিন একটি স্যুটকেস হাতে নিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছিল আমাদের সেই কয়লাকুঠির দেশে—রাণীগঞ্জে। আমাদের সঙ্গেই হলো তার প্রথম পরিচয়। আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম তার কাজ দেখে। আমাদের ইস্কুলের খাতা টেনে নিয়ে তারই একটা সাদা পাতায় পেন্সিল দিয়ে যাকে দেখলে তারই চেহারা এঁকে দিলে এক মিনিটে। অর্জুনপটির রাস্তার ধারে ছোট একটি ঘর ভাড়া নিয়ে আস্তানা গাড়লে। তারপর আরম্ভ হলো তার মাটির কাজ। আমাদের যাকে হোক একজনকে টুলের ওপর বসিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে মাটি দিয়ে তার এমন মূর্তি গড়ে দিলে—আমরা দেখে তো অবাক! ঘড়ি ধরে মাত্র পাঁচ মিনিট! তার ভেতরেই মূর্তি শেষ! নির্ভুল, নিখুঁত একেবারে হুবহু প্রতিমূর্তি! কিন্তু বিনামূল্যে এরকম বন্ধু-কৃত্য আর কতদিন চলে? টাকা কোথায়? গোপেশ্বর বললে, দশটা টাকা পেলেই এইরকম মূর্তি গড়ে দেবো। আমরা প্রচার করে দিলাম সর্বত্র। সারা শহর ভেঙে লোকজন আসতে লাগল। কিন্তু টাকা দিয়ে কেউ কাজ করাতে চাইলে না। আমরা যাই, বসি, গল্প করি, কত রকমের কত জল্পনাকল্পনা চলতে থাকে। আমরা বলি, ইস্কুল কর, আমরা সবাই তোমার ছাত্র হব। গোপেশ্বর হাসে আর বলে, সেরকম ইস্কুল এখানে চলবে না। বড় বড় মূর্তি গড়বার কিছু অর্ডার যদি পাই তো আরও কিছুদিন থাকি তোমাদের কাছে।

কিছু না পেয়েও সে রইল।

আমরাও তাকে ছাড়তে চাইতাম না, সেও আমাদের ছাড়তো না।

নজরুল একদিন গিয়েছিল আমার সঙ্গে। শিয়াড়শোল ইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। আমার বন্ধু। এই তার পরিচয়। গোপেশ্বর তার মুখের পানে বার-কতক তাকালে। তারপর আমরা যখন উঠে আসছি, গোপেশ্বর আমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, রবিবার দুপুরে তোমার এই বন্ধুটিকে নিয়ে এখানে আসবে?

মুণ্ডু তৈরি করবে বুঝি?

গোপেশ্বর বললে, হাঁ।

বললাম, তবে যে সেদিন বললে, টাকা পয়সা না পেলে ও-কাজ আর করবে না?

আজও আমার বেশ মনে আছে—গোপেশ্বর বলেছিল, তোমার এই বন্ধুটি একদিন মস্ত বড় হবে। সে চিহ্ন আমি দেখেছি ওর মুখে।

নজরুলকে আমি সেকথা বলেছিলাম। বলা বোধ হয় আমার উচিত হয়নি।

বলেছিলাম বলেই বোধ হয় কোনও রবিবার দুপুরেই তাকে আনতে পারিনি গোপেশ্বরের কাছে।

আজ সেই গোপেশ্বর ডাকছে।

নজরুল বললে, বল আর-একদিন আসবো।

পেছন ফিরে সেই কথাই বলে গেলাম গোপেশ্বরকে।

কি মজা দেখাবে নজরুল—দেখেই আসা যাক!

একটু তাড়াতাড়ি হাঁটতে হলো। নজরুল বললে, তুমি দেরি করে দিলে। অর্থাৎ বংশীর বাড়িতে চা খাওয়ার অপরাধে অপরাধী আমি।

বললাম, মজা দেখা তাহলে হলো না বল।

নজরুল কিন্তু তখনও ছাড়েনি। বললে, চলই-না!

গেলাম স্টেশনে। ওভার-ব্রিজের ওপর দিয়ে দাঁড়ালাম গিয়ে ডাউন প্ল্যাটফর্মে।

হাওড়া থেকে একখানা ট্রেন আসবে। লোকজনের যাওয়া-আসা শুরু হয়ে গেছে। এসময় এখানে আসা আমাদের উচিত হয়নি। তবে স্টেশনের কর্মচারীরা সবাই আমাদের চেনে—এই যা ভরসা। নজরুলকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ আসবে নাকি ?

ডিস্ট্যান্ট সিগনালের দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে নজরুল। জবাব দিলে না।

দেখতে দেখতে প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে ট্রেন এসে দাঁড়াল।

সামনের কামরায় বাঙালী পল্টনের দল। খাকি পোশাকপরা নানান বয়সী ছেলেরা যুদ্ধে চলেছে। নজরুল প্রথমেই হাত তুলে বলে উঠলো, 'বন্দে মাতরম্‌!'

তারাও সমস্বরে জবাব দিলে, 'বন্দে মাতরম্‌!'

গাড়ি থেকে নেমে যে-সব যাত্রী চলে যাচ্ছিল, তারাও দাঁড়িয়ে পড়ল আমাদের পেছনে। দল আমাদের ভারি হয়ে গেল। বুঝুক না বুঝুক তারাও চেঁচাতে লাগল আমাদের সঙ্গে। সারা স্টেশন মুখরিত হয়ে উঠল 'বন্দে মাতরম্‌' ধ্বনিতে। লোকজন সব দাঁড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

গাড়ি ছেড়ে দিলে। জানলায় মুখ বের করে হাত নেড়ে—রুমাল নেড়ে পল্টন-ছেলেরা চলে গেল। নজরুল একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে রইল।

যারা দাঁড়িয়ে পড়েছিল তাদের ভেতর থেকে কে-একজন যেন জিজ্ঞাসা করলে, এরা কে ভাই ? কোথায় যাচ্ছে ?

জবাব আমাকে দিতে হলো না। তাদেরই একজন বললে, বাঙালী পল্টন। লড়াই করতে যাচ্ছে।

তার পরেই শুরু হলো মন্তব্য।

—এরা লড়াই করবে কি বলছেন ? কামান-বন্দুকের আওয়াজেই দাঁত লেগে যাবে যে !

আর-একজন বললে, অকালে মৃত্যু আছে কপালে, তাই চললো মরতে।

—সবগুলোই তো ছেলেমানুষ। বাপ-মা ছেড়ে দিলে কেমন করে ?

এমনি-সব কথা শুনতে শুনতে আমরা বেরিয়ে এলাম স্টেশন থেকে।

নজরুল এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। আমিই প্রথমে তার নীরবতা ভঙ্গ করলাম। বললাম, এই মজা তুমি আমাকে দেখাতে নিয়ে এলে?

জবাবে সে শুধু আমার হাতখানা চেপে ধরে বললে, যাবে?

কি সে বলতে চায় বুঝলাম।

কেন জানি না, সেদিন তার এই প্রশ্নের জবাব দিতে আমার একমুহূর্ত দেরি হয়নি। বললাম, হ্যাঁ যাব।

পথের ধারে কেরোসিনের বাতি জ্বলছে। মাথার ওপর প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছের পাতায় পাতায় একটানা আওয়াজ উঠছে। পথের ধুলোর ঝাপ্টা এসে লাগলো মুখে। চোখ মুখ বন্ধ করে দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরলাম।

শহরে তখন নিত্য নতুন পোস্টার পড়ছে। নানারকম রঙ-বেরঙের বড় বড় পোস্টার আঁটা হচ্ছে শহরের অলিতে গলিতে। কত বিচিত্র তার ছবি, কত বিচিত্র তার ভাষা।

বাঙালী যুবকদের উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা চলছে ক্রমাগত। 'কে বলে বাঙালী যোদ্ধা নয়? কে বলে বাঙালী ভীতু? জাতির এই কলঙ্ক মোচন করা একান্ত কর্তব্য, আর তা পারে একমাত্র বাংলার যুবশক্তি। ঝাঁপিয়ে পড় সিংহ-বিক্রমে। বাঙালী পল্টনে যোগ দাও!'

ইংরেজ যুদ্ধ করছে জার্মানীর সঙ্গে। আমরা তখন এইটুকুমাত্র জানি। ইংরেজের প্রতি আমরা কেউ প্রসন্ন নই, তার ওপর রাজার প্রতি ভক্তি যেটুকু থাকা প্রয়োজন তাও নেই। তবু আমরা ইংরেজের হয়ে তার শত্রু জার্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে কেন যাচ্ছি জিজ্ঞাসা করলাম নজরুলকে।

নজরুল বললে, যুদ্ধ একটা বিদ্যা তা জানো?

বললাম, জানি।

—সেই বিদ্যেটা আমরা শিখে নেবো।

বললাম, শেখা শেষ হলেই তো দেবে ঠেলে।

—দিক না!

—তখন জার্মানীর একটি গুলি, ব্যস্, সেইখানেই খতম।

—মরে যাব? বেশ তো! যুদ্ধ করতে করতে মরে যাওয়া—ভারি মজা। মারতে মারতে মরবো।

নজরুলের সে কি উল্লাস!

কিন্তু সত্যি বলতে কি, যতই ভাবছি আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে। নজরুল মারতে পারবে কিনা জানি না, কিন্তু আমি জানি, আমি পারবো না। হাতে বন্দুক আছে বলেই জলজ্যান্ত একটা মানুষকে শত্রু কল্পনা করে নিয়ে মেরে ফেলবো—সেটা বোধ হয় আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।

নজরুল বললে, তোমার দ্বারা না হলেও তার দ্বারা হবে। সে মেরে দেবে তোমাকে। আত্মরক্ষা করবার জন্যে মারতে হয়, নইলে নিজে মরবে।

সেকথা আমি কিন্তু ভেবে দেখিনি।

নজরুল যুদ্ধবিদ্যা শিখে এসে ভারতবর্ষে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করে দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াবে—তার এই গোপন মতলবের কথা আমাকে সে বলেছিল একদিন।

আমার কিন্তু কোনও মতলব ছিল না।

আমি যেতে চেয়েছি সঙ্গসুখে।

নজরুল চলে যাবে রাণীগঞ্জ ছেড়ে, আর আমি এইখানে একা পড়ে থাকবো, রোজ দশটার সময় বই খাতা নিয়ে ইস্কুলে যাব, আর বিকেলে ফিরে আসবো—একঘেয়ে নির্বান্ধব এই নিরানন্দ জীবন আমি চাইনি।

তার ওপর যুদ্ধ কথাটার একটা উত্তেজনা আছে। আমি তখন অপরিণতবয়স্ক এক কিশোর। সে উত্তেজনা, সে উন্মাদনার হাত থেকে নিস্তার পেলাম না।

নজরুলের সঙ্গে নিভৃতে বসে পরামর্শ করলাম—কেমন করে যেতে হবে। ছিনু চলে গেছে তার দেশের বাড়িতে বিয়ে-সাদি করতে, নইলে নজরুলের বোর্ডিং-এর খাটে বসে এই নিয়ে জল্পনা

কল্পনা সম্ভব হতো না। তাও বেশির ভাগ দিন আমরা চলে যেতাম ক্রিশ্চানদের কবরখানায়। শহরের এত কাছে এমন নির্জন জায়গা সচরাচর পাওয়া যায় না।

বাঙালী পল্টনের পোস্টারের নীচে ছাপা থাকতো, মহকুমার সাব-ডিভিস্যনাল-অফিসারের (এস. ডি. ও.) সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

রাণীগঞ্জের মহকুমা-শহর আসানসোল। বেশি দূরে নয়। যাওয়াও সহজ। স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চড়ে বসলেই হলো। টিকিটের দাম তখন কত ছিল আজ আর ঠিক মনে নেই।

শুধু মনে আছে এস্-ডি-ও যিনি ছিলেন তিনি সাহেব। খাস বিলেত থেকে সবে এসেছেন বাংলা দেশে আই-সি-এস্ পাশ করে।

তাঁরই সঙ্গে দেখা করতে হবে।

সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো তাঁর ইংরেজী যদি আমরা বুঝতে না পারি তাহলে কি হবে? তবে ভরসা এই যে, পুরো দুটি বছর ধরে আমাদের রাণীগঞ্জ ইস্কুলে প্রতি শনিবার খাস বিলেতী এক পাদরী-সাহেব আমাদের বাইবেল পড়াচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলে বলে আর ইংরেজী নভেল পড়ে পড়ে ইংরেজী খানিকটা রপ্ত করে ফেলেছি।

নজরুল বললে, চল তো যাই আসানসোলে, দেখা করি সায়েবের সঙ্গে, তারপর যা হয় হবে।

হাতে কোয়ার্টার্লি পরীক্ষা। বললাম, পরীক্ষার কি হবে?

নজরুল তখন মরীয়া হয়ে উঠেছে। বলে, রেখে দাও তোমার পরীক্ষা! কী হবে পরীক্ষা দিয়ে?

আমি কিন্তু পরীক্ষা না দিয়ে কিছুতেই আসানসোল যেতে চাইলাম না। কাজেই কয়েকটা দিন আমাদের দেরি হয়ে গেল।

আমার মনের ভেতর তখন দুটো প্রশ্ন। কিছুতেই তার মীমাংসা করে উঠতে পারছি না। আমরা যুদ্ধে চলে যাচ্ছি— সে-কথা যতীনকে আর দিদিকে জানাবো কিনা। এ গেল প্রথম প্রশ্ন। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো—এই সর্বনাশা সংবাদ আমি জানাবো কিনা আমার মাতামহীকে। অতি শৈশবে আমার মা

মারা গেছে। তারপর থেকে তিনি আমাকে মানুষ করে তুলেছেন। এ-পৃথিবীতে আমিই তাঁর একমাত্র অবলম্বন। পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা মেয়ে—তাঁর কাছে যুদ্ধে যাওয়া মানেই চিরজীবনের জন্য যাওয়া।

যতীনকে বলতে পারি, দিদিকে বলতে পারি, কিন্তু তাঁকে আমি বলবো কেমন করে?

রাত্রে ঘুম হলো না।

পরীক্ষার ভাবনা তোলা রইলো, এখন এই ভাবনাটাই সবচেয়ে বড় ভাবনা হয়ে উঠলো।

সকালে কোনোদিন বাড়ি থেকে বেরোই না, পরের দিন কিন্তু চা খেয়েই চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। সোজা চলে গেলাম নজরুলের বোর্ডিং-এ। গিয়ে দেখি, নজরুল তখনও তার বিছানায় শুয়ে। ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ আগে। মুখ হাত ধুয়ে এসে চাও খেয়েছে একবার। আবদুল বললে, কাল অনেক রাত পর্যন্ত কি যেন লিখছিল। তাই বোধ হয় ঘুম ভাঙেনি, আবার গড়িয়ে নিচ্ছে।

মাথার বালিসটা বুকের নীচে জাপ্‌টে ধরে উপুড় হয়ে শুয়েছিল নজরুল। গায়ে হাত দিতেই চোখ চেয়ে আমাকে দেখেই লাফিয়ে উঠলো। উঠে বসেই চেঁচাতে লাগলো, আবদুল, আবদুল, দে ভাই দু' পেয়ালা চা। ধেৎ তেরি, ছিনু নেই, থাকলে এতক্ষণ পাঁচ পেয়ালা খাইয়ে দিত।

জিজ্ঞাসা করলাম, ছিনুর কথা ভাবছিলে বুঝি?

নজরুল বললে, সে হতভাগা বোধ হয় আর আসবে না। এলে দেখা হতো।

—তবে কার কথা ভাবছিলে?

বুঝতে পারলে বোধ হয়। কথাটা একটু জোরে জোরেই বলেছিলাম, কিংবা আবদুল এসেছিল চা নিয়ে।

নজরুল বললে, চা খাও।

আবদুল চলে যেতেই নজরুল বললে, আর দেরি কেন, চল, কালই যাই আসানসোল।

বললাম, না, কাল থেকে পরীক্ষা আরম্ভ।

নজরুল বললে, পরীক্ষা আর দিতে হয় না! কি হবে পরীক্ষা দিয়ে! আমি তো আজ ইস্কুলেই যাব না।

পরীক্ষা না দিলে দাদামশাই জানতে পারবে। জানাজানি হয়ে গেলেই বিপদ! লুকিয়ে পালাতে হবে। বললাম, তুমি কি জানিয়ে যাবে তোমার বাড়িতে?

—পাগল হয়েছ? আমি আর বাড়িই যাব না।

চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেছিলাম নজরুলকে, তোমার মন কেমন করছে না?

নজরুল বলেছিল, না। মন কেমন করবার মত কেউ আমার নেই।

এর ওপর আর কথা চলে না।

আমার পরীক্ষা আরম্ভ হলো। নজরুলের ইস্কুলে পরীক্ষার দিন ধার্য হয়েছিল তারও পরে।

কি রকম পরীক্ষা দিলাম জানি না। সে ক'দিন নজরুলের সঙ্গে দেখাও করিনি।

পরীক্ষা যেদিন শেষ হলো, ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরছি, দেখলাম নজরুল দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে। বললে, কাল আসানসোল যাব।

বেলা এগারোটায় ট্রেন। কথা হলো, নজরুল আসবে আমার কাছে। আমরা দু'জনে একসঙ্গে বেরিয়ে যাব বাড়ি থেকে।

পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে দু'জনে গিয়ে তো নামলাম আসানসোল স্টেশনে। স্টেশন থেকে কোর্ট অনেক দূরে। আবার একটা ট্রেনে চড়ে যেতে হয়। আমাদের কিছুই জানা ছিল না। হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে হাজির হলাম।

দেখা করলাম এস-ডি-ও সাহেবের সঙ্গে। বললাম, আমরা যুদ্ধে যাব। বেঙ্গলী রেজিমেন্টে নাম লেখাতে চাই।

এস-ডি-ও সাহেব ভারি খুশী। আমাদের দু'জনের কাঁধে দুটো হাত রেখে, নিয়ে গেলেন তাঁর বাংলোর ভেতর। খুব সমাদর করে

বসালেন আমাদের। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। খুব ধীরে ধীরে স্পষ্ট পরিষ্কার করে ইংরেজী বললেন। বুঝতে এতটুকু কষ্ট হলো না।

দু'জনকে দু'গ্লাস লেমনেড খাওয়ালেন। আমরা বসে বসে লেমনেড খাচ্ছি, সাহেব আমাদের নাম-ঠিকানা জিজ্ঞাসা করছেন আর কি যেন লিখছেন।

লেখা শেষ হলে বিলিতী বিস্কুটের বড় দুটি টিন আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এই বিস্কুট তোমরা পথে যেতে যেতে খাবে। খাবার সময় আমাকে মনে পড়বে। এই বলে হো হো করে হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, এখান থেকে তোমরা বাড়ি যাবে। তারপর তোমাদের যেতে হবে কলকাতায়। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, এই চিঠি নিয়ে তোমরা যাবে। সেখান থেকে তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে করাচীতে। চিঠিখানা টাইপ করতে হবে। এসো আমার সঙ্গে।

আমাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি এলেন আদালতে। সাহেব মাঝখানে। তাঁর দু'পাশে আমরা দু'জন।

পথের দু'পাশে লোকজন সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। দুটি বাঙালী ছেলের হাতে ধরে সাহেব চলেছেন হেঁটে। দেখবার মত দৃশ্যই বটে!

আদালতের সুমুখে যখন এসেছি, একখানা মোটর এসে দাঁড়ালো আমাদের পাশে। তাকিয়ে দেখি, মোটর থেকে নামছেন রায়-সাহেব। আমার মাতামহ।

যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যে হয়। যাঁকে না জানিয়ে পালিয়ে যেতে চাচ্ছি, তিনিই একেবারে চোখের সুমুখে। রায়-সাহেব তখন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। কে জানতো আজই তাঁর এজলাসের দিন।

এস-ডি-ও সাহেবের দিকে তাকিয়ে রায়-সাহেব মনে হলো যেন আমাকে দেখেই চমকে উঠলেন। বললেন, গুড মর্নিং! বলেই আঁর অপেক্ষা না করে ভেতরে চলে গেলেন।

আমি নজরুলের দিকে তাকালাম, নজরুল তাকালো আমার

দিকে। কি যে হলো আমরাই বুঝলাম। এস-ডি-ও সাহেব কিছুই বুঝতে না পেরে বললেন, He is Mr. Chatterji, Rai Sahib, very very influential man of my sub-division. Do you know him ?

আমার তখন গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। বললাম, ইয়েস।

নজরুলটা এ-সব ব্যাপারে একেবারে নাবালক। হঠাৎ বলে বসলো—হিজ্ গ্রাণ্ড ফাদার।

সাহেবের চক্ষু ছানাবড়া! আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, হোয়াট ?

আট

বলেছি তো—দ্বার্কা (দ্বারকা) আমাদের চেয়ে বয়সে ছোট হলে কি হবে, আমাদের ইয়ার-বন্ধুর সামিল। বাপ-ঠাকুর্দার লোহা-লক্কড়ের দোকান, আমাদের বাড়ির কাছেই বাড়ি। পড়ে আমাদের নীচের ক্লাসে, কিন্তু সমানে আড্ডা মারে আমাদের সঙ্গে। সাদা ধপ্‌ধপ্ করছে গায়ের রং, সুন্দর চেহারা, হাসতে হাসতে আমার পাশে এসে বসে। চুপিচুপি বলে, চিঠি এসেছে।

জিজ্ঞাসা করি হয়ত—কার চিঠি ?

এবার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে আরও চুপি চুপি বলে, বৌ-এর।

বণিক-ব্যবসাদার মানুষ, বিয়ে ওদের একটু সকাল-সকালই হয়। ওর বিয়েতে আমরা সবাই গিয়েছিলাম বরযাত্রী হয়ে। ব্বারো-তেরো বছরের দিব্যি ফুটফুটে সুন্দরী একটি বৌ—মস্ত বড়লোকের মেয়ে।

সেই বৌ তার বাপের বাড়ি থেকে চিঠি লিখেছে।

চিঠিখানি পড়ে বেশ ভাল করে তার একটি জবাব লিখে দিতে হবে।

প্রথম-প্রথম রাজী হইনি লিখতে। ধমকে তাড়িয়ে দিয়েছি দ্বার্কাকে।

কিন্তু তাড়ালেও যাবার ছেলে সে নয়।

—তাহলে দিলাম তোমার এই জামাটা ছিঁড়ে !

জামা ছেঁড়া বন্ধ করি তো মোটা একখানা বই টেনে নিয়ে বলে, এই অ্যাল্‌জাব্রাটা নিয়ে গেলাম। কুয়োর ভেতর ফেলে দেবো।

তখন বাধ্য হয়ে বলতে হয় : দে, দেখি তোর বৌ-এর চিঠি।

দেখবার একটা লোভও তো আছে! আমাদের বয়েসই-বা তখন কত !

চিঠি দেখে নজরুলের হাসি আর থামে না কিছুতেই!

বানান ভুলের ছড়াছড়ি আর উল্‌টো-পাল্‌টা কথা।—'তুমি ভাল আছ। আমি কেমন আছি।'

দ্বার্কা এবার রাগ করে। সত্যি তার রাগ করবার কথাই। বলে, হাসি থামাবে? তোমাদের বিয়ে হোক, দেখব কেমন পণ্ডিত-বৌ হয়!

চিঠি লিখবার কাগজ একখানি দ্বার্কা সঙ্গে এনেছিল। রঙিন কাগজখানি দেখতে ভারি সুন্দর। বাঁদিকের কোণে একটি পাখির ছবি। পাখির ঠোঁটে একটি খাম, আর তার নীচে সোনালী অক্ষরে ছাপা দু'লাইন কবিতা—

যাও পাখি বোলো তারে—
সে যেন ভোলে না মোরে।

নজরুল বললে, এবার লেখো তুমি। আমি চললাম।

বলেই সে আবার ফিরে দাঁড়াল হাসতে হাসতে। হাত বাড়িয়ে বললে, দেখি দেখি চিঠির কাগজটা।

দ্বার্কা দেবে না, নজরুলও ছাড়বে না। দেখবেই।

শেষ পর্যন্ত কাগজটা কেড়ে নিয়ে নজরুল পড়লে—

যাও পাখি বোলো তারে
সে যেন ভোলে না মোরে।

এর নীচে লিখে দাও—

—চিঠিখানা লিখে দেছে শৈল,
বোলো না কাউকে যেন এ-দিব্যি রইল।

বলেই সে হাসতে হাসতে চলে গেল।

দ্বার্কা বললে, বাঁচা গেল। নাও এবার লেখো।

লেখো বললেই লেখা যায় না। নব-বিবাহিতা স্ত্রীর কাছে লিখবে তার যুবক স্বামী। অথচ স্বামী কিছুই বলছে না।

বলবে না জানি। কারণ এ আজ নতুন নয়। এই দুঃসাধ্য কর্ম এর আগেও আমাকে বারকতক করতে হয়েছে।

হতভাগা কপি পর্যন্ত করবে না। তার হাতের লেখা নাকি তার বৌ-এর চেয়েও খারাপ। বৌ পড়তে পারবে না।

—তারপর ? যখন ধরা পড়বি ?

—পড়ি পড়ব। তুমি লেখো তো !

এই আমাদের দ্বার্কা।

সেদিন এস-ডি-ও'র চিঠি নিয়ে আসানসোল থেকে ফিরছি নজরুল আর আমি। রাণীগঞ্জ স্টেশনে ট্রেন থেকে নামতেই দেখি—দ্বার্কা দাঁড়িয়ে আছে বেরিয়ে যাবার গেটটার পাশে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তুই এখানে কি জন্যে এসেছিস ?

সে-কথার জবাব না দিয়ে দ্বার্কা বললে, তোমরা যুদ্ধে যাবে ?

—তুই জানলি কেমন করে ?

দ্বার্কা বললে, শহরের সবাই এতক্ষণ জেনে গেছে। তোমাদের বাড়ি থেকে তিনজন চাকর বেরিয়েছে তোমাকে খুঁজতে। বাড়ি-বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে। রায়-সাহেব তোমাদের দেখে এসেছেন আসানসোলে।

নজরুলের মুখের দিকে তাকালাম। সে হাসছে।

বললাম, তুমি হাসছো ?

নজরুল বললে, তোমার এখনও ভয় করছে ? কিন্তু এখন আর তোমাকে কেউ কিছু বলবে না—এই আমি বলে রাখলাম—দেখো।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলাম। সুমুখে শহরে ঢোকবার পথ। পথের দু'পাশে তখন আলো জ্বলেছে। সবে সন্ধ্যা নেমেছে আমাদের সেই কয়লাকুঠির দেশে।

পাশাপাশি চলেছি আমরা তিন বন্ধু। দ্বার্কা কথা বলছে না। তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কিরে, কথা বলছিস না যে ?

কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম তার মুখের দিকে তাকিয়ে। চোখ দুটো তার জলে ভরে এসেছে। আর সেই জলের ওপর রাস্তার আলো পড়ে চিক্ চিক্ করছে।

আলোর খুঁটিগুলো একটু দূরে দূরে। আবার আমরা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে চলেছি। এই অবসরে কোঁচার খুঁট দিয়ে দ্বার্কা তার চোখ দুটো চট্ করে মুছে নিলে। তার সে অশ্রুসজল চোখ আর

দেখতে পেলাম না। কিন্তু যা দেখলাম তারও মূল্য বড় কম নয়।

খানিক বাদে পথ চলতে চলতে দ্বার্কা আমার হাতটা চেপে ধরলে। বললে, কি এমন দুঃখু তোমার মনে, যার জন্যে তুমি এমনি করে চলে যাচ্ছ ?

বলতে বলতে গলাটা তার ধরে এল।

বললাম, দুঃখু না থাকলে কি যেতে নেই ?

কোনও জবাব পেলাম না তার কাছ থেকে।

—তুই কি ভেবেছিস আমরা আর ফিরবো না ?

তারও কোনও জবাব নেই।

ভাবছিলাম আজ আর বাড়ি ফিরব না। যেখানে হোক রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে দিয়ে কাল সকালেই পালাব রাণীগঞ্জ থেকে। নজরুলকে বললাম, চল—কালই চলে যাই কলকাতা।

নজরুল বললে, কলকাতায় থাকবে কোথায় ?

থাকবার জায়গা অবশ্য আছে। কিন্তু সেখানে যাওয়া চলবে না।

বংশীর বাড়ির কাছাকাছি যেতেই দেখি, বংশী দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে। বংশী বললে, চল আমিও যাব। দ্বার্কা নতুন বিয়ে করেছে, নইলে তাকেও সঙ্গে নিতাম।

দ্বার্কা চুপচাপ একপাশে দাঁড়িয়ে। সে যেন বোবা হয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে লোক জড়ো হয়ে গেল বিস্তর। পানের দোকান ছেড়ে ভজুয়া পর্যন্ত এসে দাঁড়াল আমাদের দেখবার জন্যে।

ভজুয়া বললে, দুগিয়াকে সঙ্গে নিয়ে যাও বাবু, ব্যাটা আমাদের ভারি জ্বালাচ্ছে।

সত্যিই তো। যে-লোক জ্বালাচ্ছে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার এত সহজ উপায় আর কি হতে পারে ? যুদ্ধে যারা যাচ্ছে তারা স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করছে—এই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এরা যখন আর ফিরে কোনোদিনই আসবে না, তখন দুগিয়াকে কোনো-

রকমে এদের সঙ্গে ঠেলে দিতে পারলেই—ব্যস্‌, জ্বালা-জঞ্জাল চুকে যাবে চিরদিনের জন্যে। মরে তো ওই ব্যাটাই আগে মরবে।

তুগিয়াকে দেখেছেন আপনারা শেকার-সাহেবের বাংলোয়। অস্থিচর্মসার লম্বা লিক্‌লিকে একটি ছোকরা। চেহারা দেখে বয়স অনুমান করা শক্ত। সেই তুগিয়া-ব্যাটাই আগে মরবে।

নজরুল হাসতে লাগল তুগিয়ার নাম শুনে। বললে, ওকে নেবে কেন ভজহরি?

ভজহরি বললে, নিতেও পারে বাবু, ব্যাটা দেখতে অমনি, কিন্তু ওর হাড়গুলো ঠিক লোহার মত শক্ত। আপনাদের আর কি, নিয়ে যান সঙ্গে করে, নিজের পয়সায় যাবে, না নেয় তো ফিরে আসবে।

তুগিয়ার কথা নিয়ে হাসাহাসি করছি, এমন সময় যা ভয় করেছিলাম তাই হলো। আমাদের বাড়ির দু'জন চাকর—সীতুয়া আর নান্নু এসে দাঁড়াল। বললে, চলুন। বড়বাবু ডাকছেন।

আমি একাই যাচ্ছিলাম, নান্নু নজরুলের দিকে তাকিয়ে বললে, আপনিও আসুন বাবু, আপনাকেও নিয়ে যেতে বললেন।

গিয়ে দাঁড়ালাম রায়-সাহেবের কাছে। ভয়ে ভয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা দু'জনে—নজরুল আর আমি।

দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে। মার্বেল ফ্লোরের ওপর কাশ্মীরী কার্পেট পাতা। জানলার কাছটিতে যেমন তিনি প্রত্যহ বসে বসে কাজকর্ম করেন, সেদিনও তেমনি বসেছিলেন। নজরুলের দিকে তিনি মুখ তুলে তাকালেন। বললেন, বোসো।

দু'জনেই বসলাম কার্পেটের ওপরে।

রায়-সাহেব কথা খুব কম বলেন। সেদিন মনে হলো যেন আরও বেশি গম্ভীর। তাঁর গায়ের রং ছিল খুব ফরসা। বুক পর্যন্ত লম্বা দাড়িতে তখন সবেমাত্র পাক ধরেছে। আমার দিকে তিনি তাকাচ্ছেন না।

আবার তিনি নজরুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, শুনেছি তুমি খুব ভাল ছেলে, কিন্তু লেখাপড়া তো তোমার এইখানেই শেষ।

নজরুল জবাব দিলে না। তিনি আবার বললেন, তোমার

বাড়ির অবস্থা ভাল নয় আমি শুনেছি। তার ওপর তুমিই বাড়ির বড় ছেলে। যাক্-গে, সে-সব ভাবনা তোমার।

এই বলে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, এই যে যুদ্ধে চলে যাওয়া—এটি বেরুলো কার মাথা থেকে?

নজরুল বলতে যাচ্ছিল, তার মাথা থেকে বেরিয়েছে। আমি তাকে থামিয়ে দিলাম, বললাম, আমার।

আমি চাইনি—নজরুলের ওপর রায়-সাহেবের ধারণা খারাপ হোক। চাইনি যে তিনি ভাবুন—এ-ব্যাপারে নজরুলের উৎসাহ আমার চেয়ে বেশী।

কি তিনি ভাবলেন বুঝলাম না।

বললেন, তাহলে কবে তোমরা যাচ্ছ কলকাতায়?

নজরুল বললে, পরশু।

বলেই নজরুল তার জামার পকেট থেকে এস-ডি-ও সাহেবের লেখা খামের চিঠিখানা বের করে বললে, এই যে, দেখুন না, সাহেব লিখে দিয়েছে।

খামখানি রায়-সাহেব নিলেন হাতে করে। খামের মুখ বন্ধ। ম্লান একটু হেসে সেখানি তিনি আবার ফিরিয়ে দিলেন নজরুলের হাতে।

বললেন, হাওড়ায় নেমে সোজা তোমরা চলে যাবে সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে। আমি একখানি চিঠি লিখে দেব। সেজবাবু সেখানে আছেন। তিনি তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন রিক্রুটারের আপিসে।

বেঁচে গেলাম। রায়-সাহেব নিজেই সব ব্যবস্থা করে দিলেন।

বললেন, যাও। লেখাপড়া তো চুকিয়ে দিলে। এখন তোমরা স্বাধীন। যা খুশি তাই করগে।

বুঝতে পারছি মেয়েরা উঁকিঝুঁকি মারছে।

বুক ফুলিয়ে হাসতে হাসতে আমরা নীচে নামছি, পেছন থেকে মনে হলো যেন মামীমা ডাকছেন। বলে গেলাম, আসছি।

মেয়েদের সুমুখে গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা করছে। পাশ কাটিয়ে

ভাবলাম পালিয়ে যাই নজরুলের বোর্ডিং-এ। কিন্তু রাস্তায় গিয়ে নামতেই দেখি—সুমুখে দুগিয়া। দু'হাত বাড়িয়ে আমাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে। এমন পান খেয়েছে যে, মুখের দু'কস্ বেয়ে রস গড়াচ্ছে। হাসতে হাসতে বললে, আমি শুনেছি।

—কি শুনেছিস ?

দুগিয়া বললে, আমাকে নিয়ে যেতেই হবে।

—তোকে নেবে না যে !

—না নেয়, আমি ফিরে আসবো।

তার পরেই চললো তার পায়ে ধরা আর কান্না। নিয়ে তাকে যেতেই হবে। আমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি সে আদায় করে নিলে তবে ছাড়লে।

নজরুল চলে গেল তার বোর্ডিং-এ, আর আমি গেলাম বাড়ির ভেতর। মামীমা ডেকেছেন—যেতেই হবে।

চুপি চুপি গিয়ে দাঁড়ালাম মামীমার কাছে। আমার একখানা হাত চেপে ধরে তিনি বললেন, এ কী করলি বল্ দেখি ?

হাতটা তাঁর থর্ থর্ করে কাঁপছে। আমিও তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাব বলেই পালাতে চেয়েছিলাম কাউকে কিছু না জানিয়ে।

হঠাৎ আমার হাতটা মামীমা ছেড়ে দিলেন। মুখ তুলে চাইতেই দেখি রাঁধুনি বামনী মোক্ষদা এসে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েছে দোর আগলে।

মামীমা আমার হাতটা কেন ছেড়ে দিলেন—বুঝতে দেরি হলো না।

বাংলা দেশের অনেক কবি অনেক সাহিত্যিক নারীজাতির গুণ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাঁরা বোধহয় আমাদের এই মোক্ষদাকে দেখেননি, দেখলে কলম তাঁদের নিশ্চয়ই থেমে যেত, অতখানি প্রাণ খুলে লিখতে পারতেন না।

মোক্ষদা বলতে আরম্ভ করলে, আহা বাছা রে ! নড়াই-এ নাম নেখাতে গেলি কোন্ দুঃখে বল্ দেখিনি ? মাঠে-ঘাটে মরে পড়ে থাকবি, শেয়াল-শকুনিতে ছিঁড়ে খাবে !

মামীমা বললেন, আঃ, থামো না! ছি!

কিন্তু থামা দূরে থাক, মোক্ষদা এবার সত্যি-সত্যিই চোখে কাপড় চাপা দিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল।—এই এতটুকু ছেলেকে এত বড়টি করে তুললে গা, আর সেই ছেলে কিনা - আজ জন্মের মতন চলে যাচ্ছে সবাইকে ছেড়ে—

আমি ছাড়া সকাল-সকাল ভাত খাবার লোক বাড়িতে কেউ ছিল না। আমাকেই শুধু ইস্কুলের ভাত ওকে রান্না করে দিতে হতো। তাই আমি ছিলাম মোক্ষদার দু'চক্ষের বিষ। ইস্কুলের ভাত আর রাঁধতে হবে না—এই আনন্দেই বোধহয় সে এই মড়াকান্নার অভিনয় করে লোক জড়ো করে ফেললে।

মামীমা আর আমি দু'জনেই ঘরের ভেতর আট্‌কা পড়ে গেছি। কারণ মোক্ষদা তার বিরাট দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দোরের ঠিক মাঝখানটিতে।

মামীমাই প্রথমে তাকে একটু সরিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তার পিছু পিছু আমি পথ করে নিলাম একটুখানি।

রাণীগঞ্জে রইলাম মাত্র একদিন। এই একটি দিনের স্মৃতি আমি কখনও ভুলবো না। পৃথিবীতে থাকবার মেয়াদ আমাদের শেষ হয়ে গেছে—এই কথাটি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে সকলেই। বুঝবার প্রয়োজন ছিল না, কারণ ওইটিই আমি চেয়েছিলাম। কেন চেয়েছিলাম—জীবনের প্রতি এ বিতৃষ্ণা আমার কেন এসেছিল—সে কাহিনী এখানে অবান্তর।

নজরুলের জীবনের নিগূঢ়তম বেদনার কাহিনীও আমি জানি। সেই বেদনার সঙ্গে মিশেছিল কৈশোরের দুর্দমনীয় অ্যাডভেঞ্চার-প্রীতি। তাই সব-কিছু হাসিমুখে পরিত্যাগ করে সেও ঝাঁপ দিয়েছিল এই মারণ-যজ্ঞে।

আমাদের দু'জনের প্রীতির বন্ধন নিবিড়তর হয়েছিল বুঝি সেই কারণেই। এই সহানুভূতির জন্যই বোধকরি এক আর একের যোগফল দুই না হয়ে হয়েছিল এক।

আমার পাতানো দিদি আর যতীন, নজরুলের ছিনু আর আমার দ্বারকা—পেছনে টেনে রাখতে পারলে না আমাদের।

যারা পারত, আমার মাতামহী আর নজরুলের মা—তারা রইল দূরে। নিষ্ঠুরতম ঔদাসীন্যে তাদের সঙ্গে দেখা না করে শুধু তাদের স্মৃতির আগুন বুকে জ্বালিয়ে নিয়ে আমরা একদিন ট্রেনে চড়ে বসলাম সন্ধ্যার অন্ধকারে। ভুগিয়া হাসতে হাসতে এসে বসলো আমাদের সঙ্গে। তার মা দাঁড়িয়ে রইল ল্যাম্প-পোস্টের নীচে। ভুগিয়ার মত এক সর্বহারা পাষাণের চোখেও দেখলাম অশ্রুর ধারা।

আমাদের চোখ ছিল শুকনো। পাশাপাশি বসে হাসছিলাম আমরা—নজরুল আর আমি। সে হাসিও শুকনো। জীবন-দেবতার প্রতি নিদারুণ অভিমানে যে আগুন জ্বালিয়েছিলাম আমাদের বুকে, তারই উষ্ণ উত্তাপে বোধকরি উত্তাল অশ্রুসমুদ্র শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

কলকাতায় পৌঁছলাম পরের দিন সকালে। এর আগে নজরুল কখনও কলকাতা দেখেনি। বললাম, ছাখো। আর হয়ত দেখতে পাব না।

নজরুলের কেন জানি না দৃঢ় বিশ্বাস সে আবার ফিরে আসবে। বললে, না না এত তাড়াতাড়ি মরব না আমরা।

আমাদের যেতে হবে সুকিয়া স্ট্রীটে। (আজকাল কৈলাস বোস স্ট্রীট) একাত্তোর নম্বর বাড়িখানি উখরার জমিদারদের। রায়-সাহেবের কোনও বাড়িই তখন হয়নি কলকাতায়। উখরা এস্টেটের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কাজেই ওই এক বাড়িতেই আমাদের দু'বাড়ির কাজ চলতো।

কলেজ স্ট্রীটে ট্রাম বদল করবার জন্যে নেমেছি, দেখি আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে লোক দাঁড়িয়ে আছে। রায়-সাহেবের টেলিগ্রাম এসে পৌঁচেছে আমাদের আগেই।

সেখানে গিয়ে দেখি আমার মামা, উখরার সেজমামা ইত্যাদি অনেকেই বসে আছেন আমাদের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে।

উখরার সেজমামা (শৈলবিহারী লাল সিং হাণ্ডে) আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, খুব দেখালি বাবা!

আমার মামা একটি কথাও বললেন না। শুধু একবার আমার

মুখের দিকে তাকালেন। আমার মা আর এই মামা—রায়-সাহেবের দুই ছেলেমেয়ে! আমার মা অনেকদিন আগেই চলে গেছে আমাকে রেখে। আমি তখন নিতান্তই ছোট—আমার সেকথা মনে নেই, কিন্তু মামা বোধকরি ভুলতে পারেননি সেকথা।

অনেকক্ষণ পরে কথা বললেন তিনি। বললেন, সব দিলে তো শেষ করে! খুব বাহাদুর! কই, এস-ডি-ওর চিঠি কার কাছে?

নজরুল তার পকেট থেকে খামের চিঠিখানি বের করে দিলে।

মামা বললেন, রাত জেগে ট্রেনে এসেছ, যাও এবার স্নান করে খেয়েদেয়ে ঘুমোওগে। বিকেলে নিয়ে যাব রিক্রুটিং আপিসে।

রাত জেগে এসেছি, সত্যিই তো, চোখ জ্বালা করছে। ভেবেছিলাম, স্নান করলেই ঘুমে চোখ ভেরে আসবে। কিন্তু কোথায় ঘুম?

দুগিয়া বসে বসে পা টিপছে। বারণ করলেও শোনে না। বলে, আমাকে ফেলে যেন তোমরা চলে যেও না।

দুগিয়ার সঙ্গে মজার মজার গল্প করেই সময়টা আমাদের কেটে গেল।

হেদোর উত্তর দিকের লাল বাড়িতে মল্লিক-সাহেবের রিক্রুটিং আপিস। মামা আর সেজবাবু আমাদের সেখানে নিয়ে গেলেন।

খাতায় মাম লেখানো হলো। দুগিয়াও বাদ গেল না। তার নাম উঠলো 'সুইপারের' খাতায়। দুগিয়ার তাতে আপত্তি নেই। শুধু একবার জিজ্ঞাসা করলে, 'সুইপার' মানে কি?

আমি বললাম, ঝাড়ুদার।

নজরুল হাসতে হাসতে বললে, মেথর।

তা হোক, তবু সে যাবে।

তার পরেই পরীক্ষার পালা।

আর একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো নজরুলকে আর আমাকে। দুগিয়ার পরীক্ষার দরকার নেই।

পরীক্ষা যৎসামান্যই। কত ফুট লম্বা, কত ওজন, বুকের ছাতির মাপ কত।

প্রথমেই নজরুল পাশ হয়ে গেল।

যিনি মাপ নিচ্ছিলেন তিনি বললেন, বসুন ওই বেঞ্চে। এক্ষুণি আপনাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে ফোর্ট উইলিয়ামে। সেখানে সাজ-পোশাক, বিছানা আর কিড্-ব্যাগ দেওয়া হবে। তারপর যেদিন টার্ন আসবে, সেইদিন যাবেন নওশেরা।

মামা এইবার আমাকে এগিয়ে দিলেন।

ভদ্রলোক লিখে চলেছেন খাতায়। লম্বা—ঠিক আছে। ওজন—ঠিক আছে। শেষে এসে দাঁড়ালাম, ফিতে দিয়ে যিনি বুকের মাপ নিচ্ছিলেন, তাঁর কাছে। একবার মাপলেন, দু'বার মাপলেন, তারপর বললেন, আধ-ইঞ্চি কম। আন্‌ফিট্।

যিনি খাতা লিখছিলেন, তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন। বললেন, বাড়ি চলে যান। দিন কতক খুব সাঁতার কাটুন, তারপর বুকের মাপ ঠিক হয়ে গেলে আবার এপ্লাই করবেন।

বলেই আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। হাঁকলেন, নেক্সট্।

মামা তখন আমার হাতখানা চেপে ধরেছেন। ওদিকে নজরুল উঠে দাঁড়িয়েছে।

এ কি হলো?

নজরুল এগিয়ে এসে বললে, সে কি? তোমার বুকের ছাতি তো—

মামা বললেন, তোমার চেয়ে অনেক ছোট।

তারপর যা হলো তা আর লিখবার নয়। নজরুলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে ছিলাম মনে আছে।

তার সে শুকনো চোখেও সেদিন একটুখানি জল দেখেছিলাম। আর আমার চোখে তখন অশ্রুর ধারা নেমেছে।

মামা আমাকে সেখান থেকে জোর করে টেনে আনলেন। বললেন, খুব হয়েছে! এসো।

নয়

যার যাবার কথা নয় সেও চলে গেল। তালপাতার সেপাই চুগিয়া চলে গেল সুইপার হয়ে!

পেছনে পড়ে রইলাম শুধু আমি।

দুঃখ যত-না হলো লজ্জা হলো তার চেয়ে বেশি। রাণীগঞ্জে আমি ফিরে যাব কোন্ মুখে?

সুকিয়া স্ট্রীটের বাসায় এসে নিশ্বাস টেনে টেনে বুকের ছাতিটা বার-বার ফুলিয়ে ফুলিয়ে দেখতে লাগলাম।

দর্জির কাছে গিয়ে একটা ফিতে দিয়ে মেপে দেখলে হয়!

উখরার সেজমামার মুখে হাসি দেখে মনে কেমন যেন সন্দেহ হলো। এঁদের কারসাজি নয় তো?

কিন্তু তখন আর কোনও উপায় নেই। আমি তখন সন্দেহাতীতভাবে নজরবন্দী।

বারান্দায় বসে বসে রাস্তার লোক দেখছি। পাশের ঘরে তুমুল হট্টগোল চলছে। তিন জায়গায় টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে। —তার ভাষা নিয়ে উঠেছে তর্ক। Sailaja exempted হবে, না released হবে, disqualified হবে, না unfit হবে—ঠিক হচ্ছে না কিছুতেই।

সেই ফাঁকে ভাবলুম পালাই। তখনও যদি নজরুলকে ফোর্ট উইলিয়ামে না পাঠিয়ে দিয়ে থাকে তো চট্ করে একবার দেখা করে দুটো কথা বলে আসি। বলে আসি—একা একা তোমার যদি ভাল না লাগে তো পালিয়ে এসো ওখান থেকে। পালিয়ে যদি না আসতে পারো তো রোজ একখানা করে চিঠি লিখো। আমিও লিখব।

পা টিপে টিপে বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়িতে যেই পা দিয়েছি, পিছন থেকে ডাক শুনে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

—কোথায় যাচ্ছিস ?

বললাম, রাস্তায়। একটু ঘুরে আসি।

সেজবাবু বললেন, না। বিকেলে আমাদের সঙ্গে বেরুবে। বায়োস্কোপ দেখিয়ে আনব।

তাই হলো শেষ পর্যন্ত। সারাদিন বন্দী হয়ে রইলাম বাড়ির ভিতর। বিকেলে ট্রামে চড়ে চললাম চৌরঙ্গীর দিকে। চারিদিকে সতর্ক প্রহরী। জানলার ধারে চুপটি করে বসে আছি। রাস্তার ধারে বড় বড় বাড়ি, বড় বড় দোকান। লোকজনের যাওয়া-আসা দেখছি। কলকাতায় তখন এত লোকও ছিল না, এত গাড়িও ছিল না। তবু ক্রমাগত মনে হতে লাগল—এই জনারণ্যে আমি যেন আমার প্রিয়তম বন্ধুকে হারিয়ে ফেলেছি।

ট্রাম গিয়ে দাঁড়াল চৌরঙ্গীতে। আমাদের নামতে হবে।

সুমুখে গড়ের মাঠ। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গটা শুনেছিলাম এইদিকেই কোথায় যেন আছে। সেজবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, দুর্গটা কোথায় ?

তিনি জবাব দিয়েছিলেন, সেখানে গেলেও এখন আর দেখা করতে দেবে না। কড়া মিলিটারি আইন।

এই বলে তিনি আমাকে অনেককিছু বোঝালেন। বললেন, এখন তোমার লেখাপড়া শেখবার বয়েস। রাণীগঞ্জে ফিরে যাও, গিয়ে যাতে ভাল করে পাশ করতে পার, তার চেষ্টা করগে।

লিণ্ডসে স্ট্রীট ধরে চলেছি। যাব গ্লোব থিয়েটারে। তখন 'বিজু' না ওইরকম কি-একটা নাম ছিল। মামা একটু দূরে দূরে চলছিলেন। গ্লোবে ঢোকবার দোরের কাছটাতে দাঁড়িয়ে একটা কথা তিনি বলেছিলেন—যা আমার আজও মনে আছে। বলেছিলেন, ইংরেজ আমাদের যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়ে দেবে—এই কথাটা কে ঢোকালে তোদের মাথায় ?

জবাব দিতে পারিনি। মাথা হেঁট করে তাঁদের পিছু পিছু ছবিঘরে গিয়ে ঢুকলাম। মনে আছে—ছবিটা ছিল নাজিমোভার। আর ছিল তখনকার দিনের টাইটেল্ ভারাক্রান্ত নীরব ছবি। সবকিছু লং-শটে তোলা।

পা-কাটা ছবি চলে-ফিরে বেড়াবে, কাটামুণ্ডু কথা বলবে—তখনকার মানুষ সেকথা ভাবতেও পারতো না। ক্লোজ্-আপ্ মিড্শটের যুগান্তকারী আবিষ্কর্তা গ্রিফিথের আবির্ভাব তখনও হয়নি।

এক বর্ণও বুঝতে পারিনি ছবিটা। বুঝবার চেষ্টাও করিনি। আমার মন তখন পড়ে আছে ফোর্ট উইলিয়ামে। বারম্বার শুধু সৈনিকের বেশে কল্পনা করছি নজরুলকে। ভাবছি রাণীগঞ্জ স্টেশনে একখানা ট্রেন গিয়ে দাঁড়াল। ছুটো কামরা বাঙালী পল্টনে ঠাসা। তাদের ভেতর থেকে খাকি হাফ্প্যাণ্ট-পরা নজরুল বেরিয়ে এল। বন্ধুরা এসেছে বিদায় অভিনন্দন জানাতে। হয়ত-বা সারা রাণীগঞ্জ শহর ভেঙে পড়েছে সেখানে।

কিন্তু আর-একজন কোথায়? রাণীগঞ্জ ছেড়ে যে চলে গেল বুক ফুলিয়ে?

কী জবাব দেবে নজরুল?

বলবে হয়ত তার বুকের ছাতি আমার মত চওড়া নয়, তাই সে পড়ে রইল পিছনে। আমি একাই চললাম। সে আবার ফিরে আসবে, রাণীগঞ্জে।

আমি কিন্তু রাণীগঞ্জে আর ফিরলাম না। ফিরতে পারলাম না।

কলকাতা থেকে আমাকে একা আসতে দিলে না। সঙ্গে একজন লোক এলো।

যে এলো তাকে আমি হাওড়া স্টেশন থেকে ফিরিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না ফেরাতে। সে যাবেই। রাণীগঞ্জে আমাকে পেঁ‌ৗছে দিয়ে তবে ফিরবে।

ট্রেনে চড়ে বসলাম ছু'জনে। লোকটি আমাকে খুব তোয়াজ করতে লাগল।—'বিড়ি-সিগ্রেট খাও যদি তো খেতে পারো, আমি কাউকে কিছু বলব না।'

কিছুই তখন আমার ভাল লাগছে না। পৃথিবীটা কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছে।

রাণীগঞ্জে গাড়িটা পেঁ‌ৗছোবে বিকেল চারটেয়। দিনের বেলা

কিছুতেই আমি সেখানে যেতে পারব না। সুতরাং যে-লোকটি আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব?

শেষ পর্যন্ত সম্ভব একটা করে বসলাম। রাণীগঞ্জের আগের স্টেশন অণ্ডাল। গাড়িটা অণ্ডালে এসে যেই দাঁড়িয়েছে, চট্ করে আসছি বলে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম।

সঙ্গী ভদ্রলোক বললে, দেরি কোরো না। গাড়ি বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না।

সত্যিই দাঁড়াল না। গাড়ি যখন চলতে আরম্ভ করেছে, তখন আমি প্ল্যাটফর্মের ওপর একটুখানি দূরে দাঁড়িয়ে।

দোরের কাছে মুখ বাড়িয়ে ভদ্রলোক চীৎকার করতে লাগল: ওঠো, ওঠো, তাড়াতাড়ি ওঠো।

চেঁচিয়ে বললাম, উঠবো না। আমি অণ্ডাল গ্রামে যাচ্ছি। আপনি বলে দেবেন।

তার মুখের চেহারা কিরকম হলো দেখবার অবসর পেলাম না। গাড়িটা ধীরে ধীরে অনেক দূরে চলে গেল।

আমার টিকিটখানা রয়ে গেল তার পকেটে। কালেক্টার টিকিট চাইলে কি বলব ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চললাম। অণ্ডাল স্টেশন তখন এত বড় ছিল না। কখন যে স্টেশনের বাইরে চলে এসেছি বুঝতেও পারিনি।

নিঃসঙ্গ একাকী এক তরুণ বালক—মহাযুদ্ধের সৈনিক হবার বাসনা নিয়ে কলকাতা গিয়েছিল তিনদিন আগে। ফিরে এলো আশাভঙ্গের বেদনা নিয়ে। সেই বেদনার সুস্পষ্ট চিহ্ন বোধ হয় পড়েছিল তার সর্ব অবয়বে।

—কি গো, কি ভাবতে ভাবতে চলেছ?

তাকিয়ে দেখি, অণ্ডাল গ্রামের একজন লোক। বললে, ফিরে এলে তাহলে?

বুঝলাম খবরটা গ্রামেও এসে পৌঁছেছে!

বললাম, হ্যাঁ গোবিন্দ, ফিরে এলাম।

গোবিন্দ বললে, জানি তুমি ফিরে আসবে। অত বড় দাদামশাই, যেমন করে হোক ছাড়িয়ে আনবে জানি।

যে যা ভাবে ভাবুক। কথাটার জবাব দিলাম না।

নীরবে পথ চলছিলাম। দেখি না গোবিন্দ আমার পিছু নিয়েছে। তার কৌতূহলের সীমা নেই। বললে, ইংরাজরা নিশ্চয়ই যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে। না, কি বল ?

কথা বলতে হলো। বললাম, না। হারবে কেন ?

আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় গোবিন্দ। আমাকে জন্মাবধি চেনে। জাতে ময়রা। আমার কথাটা সে বিশ্বাস করলে না। বললে, লেখাপড়া জানি না, কিন্তু বুঝি সব। মানুষের টান পড়েছে বাবু, জার্মানীরা মেরে সব সারাড় করে দিয়েছে। তা নইলে তোমাদের মতন কচি ছেলেগুলোকে ইস্কুল থেকে টেনে টেনে নিয়ে যায় কখনও ?

অনেক করে তাকে বুঝিয়ে বললাম, তুমি ভুল বলছ গোবিন্দ, আমাদের টেনে নিয়ে যায়নি। আমরা নিজেরাই গিয়েছিলাম।

কিন্তু কাকে বোঝাব সেকথা ?

পরাধীন জাতির মর্মমূলে ইংরেজ-বিদ্বেষ তখন এমনি পুঞ্জীভূত যে, গোবিন্দের মত নিতান্ত সাধারণ গ্রামের একজন অশিক্ষিত মানুষও মনে মনে কল্পনা করছে—জার্মানীর হাতে ইংরেজের লাঞ্ছনার অন্ত নেই। আমাদের কি হবে সে-সব পরের কথা, এখন ইংরেজ তো মরুক !

সারাটা পথ গোবিন্দ আমাকে নানান তত্ত্বকথা শোনাতে শোনাতে চললো। ইংরেজ যে আমাদের ভাল কিছু করতে পারে, বাঙালী যে পল্টন হতে পারে—সে-সব কথা তার ধারণার অতীত। রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা সে রামায়ণে শুনেছে। শ্রীরামচন্দ্রের হাতে রাবণের গুষ্টিকে গুষ্টি যখন সাবাড় হয়ে গেছে, যুদ্ধ করবার মত একটি লোকও যখন আর লঙ্কায় পাওয়া যাচ্ছে না, নিতান্ত নিরুপায় হয়ে রাবণ তখন তার চোদ্দবছরের ভাইপো তরণীসেনকে যুদ্ধে পাঠিয়েছিল।

গোবিন্দর কাছে আমাদের যুদ্ধে যাওয়াটাও ঠিক তেমনি।

তার পরেই এলো তার অভাব-অভিযোগের কথা। ভারতবর্ষ তখন ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড় পরছে। আমেদাবাদ তখনও জন্মগ্রহণ করেনি। গোবিন্দ বললে, রেলি ব্রাদার্সের একজোড়া শাড়ির দাম যখন ছ' টাকায় উঠেছে, তখনই জানি ইংরেজ আমাদের ন্যাংটো না করে ছাড়বে না।

গোবিন্দর ধারণা, ইংরেজ যে মরছে, সে শুধু এই পাপে। আমাদের মত ধর্মপ্রাণ একটা জাতিকে বিনা অপরাধে কষ্ট দিলে ভগবান সহ্য করবেন না। ইংরেজ মরবে।

ইংরেজ মরবে কিনা জানি না, তবে আমি যে মরেছি সেকথা বুঝতে দেরি হলো না।

পরের দিন সকালেই দেখি, কালো ঘোড়ার জুড়ি-গাড়িটা অণ্ডালের বাড়ির সদরে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামলেন রায়-সাহেব।

দোতলার ঘরে বসে গল্প করছিলাম অবনীর সঙ্গে। অবনী রায়-সাহেবের ছোট ভাই-এর ছেলে। সম্পর্কে মামা হলেও জীবনে কোনোদিন তাকে মামা বলে ডাকিনি। এক বয়স দু'জনের, একই সঙ্গে পাশাপাশি মানুষ হয়েছি, এক সঙ্গে এক ক্লাসে পড়েছি।

অবনী বললে, ওই এলেন! তোকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে। চল পালাই।

পালিয়ে গেলাম সেখান থেকে। প্রকাণ্ড বাড়ি। ছাতের সিঁড়িতে গিয়ে বসে রইলাম। রায়-সাহেব কি বলেন শুনতে হবে।

অবনী বললে, কেন মরতে গেলি ওইসব করতে? আমি বাবা রায়-সাহেবের সঙ্গে মুখোমুখি বসে যেতে পারব না এক গাড়িতে। তুই যাবি তো যা।

আমি বললাম, আমি যাব না রাণীগঞ্জে।

—পড়বি না?

—না। পড়তে হয় অন্য কোথাও পড়ব।

সিঁড়ির একপাশে গায়ে গা দিয়ে বসে আছি দু'জনে। চুপি

চুপি কথা বলছি ফিস্ ফিস্ করে। এমন সময় রায়-সাহেবের জুতোর আওয়াজ শোনা গেল সিঁড়ির ওপর। দোতলায় উঠছেন।

হঠাৎ রায়-সাহেব চীৎকার করে উঠলেন, কোথায় সে নবাব-সাহেব, কোথায় গেলেন?

বুঝলাম, দিদিমা'র সঙ্গে দেখা হয়েছে।

রায়-সাহেবকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছি। বলছেন, শুনেছ তো নাতির কীর্তি-কাহিনী?

দিদিমা কি বললেন শুনতে পেলাম না। হয়ত-বা কিছুই বলেননি। হয়ত-বা তিনিও ভয় পেয়ে গেছেন।

রায়-সাহেব বললেন, ইস্কুলের টিচাররা বলে ছেলেটা ভাল। ভেবেছিলাম, লেখাপড়া শেখে তো বিলেত পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আর কোনও আশা নেই। কতকগুলো বখাটে বন্ধুর পাল্লায় পড়ে একেবারে মাটি হয়ে গেল।

অবনী বলে উঠল, ঠিক বলেছ। আমিও ঠিক সেই কথাই বলি।

অবনী আমাকে হাসাবার চেষ্টা করছে। বললাম, চুপ কর। হেসে ফেলবো।

বলেই আবার কান পেতে রইলাম রায়-সাহেবের কথাগুলো শোনবার জন্যে। তিনি বললেন, কলকাতা থেকে আসছিল, সঙ্গের লোকটাকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে অণ্ডালে নেমে পড়েছে। ভাবলাম বুঝি আবার পালালো। তাই সকালেই ছুটে এলাম ওকে নিয়ে যাব বলে।

বলতে বলতে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লেন তিনি। আর একটি কথাও শোনা গেল না।

অবনী তখন আবার আরম্ভ করেছে আমাকে খোঁচা মারতে। —এবার কি করবি? যাব না বলছিলি যে!

বললাম, সত্যি বলছি আমি যাব না। চল্ এখান থেকে পালাই।

পা টিপে টিপে সত্যিই পালিয়ে গেলাম সেখান থেকে। বললাম, গাঁয়ের ভেতর কারও বাড়িতে লুকিয়ে বসে থাকিগে চল্। খুঁজে পাবে না তাহলে।

অবনী তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল। কারণ আমাকে যেতে হলে

তাকেও যেতে হবে। অথচ কিছুদিন থেকে পড়াশোনা সে একদম করছে না। একদিন ইস্কুলে যায় তো দশদিন যায় না। থার্ড মাস্টার একদিন বলেছিলেন, কানে হাত দিয়ে বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে থাকো। ব্যস্, সেইদিন থেকে স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে সে অগুালে বসে আছে।

সেদিন আমরা বাড়ি যখন ফিরলাম, রায়-সাহেব তখন চলে গেছেন। রায়-সাহেব চলে গেছেন, কিন্তু বাড়ির ভিতর একটা হৈ-চৈ কাণ্ড!

যার সঙ্গে দেখা হয় সেই বলে, সব্বনাশ হয়ে গেছে। রায়-সাহেব নাকি আমার ওপর এমন রাগ রেগেছেন যে, দেখতে পেলে কেটে ফেলবেন।

সত্যি খবরটা পেলাম দিদিমা'র কাছে গিয়ে। বলসেন, পালিয়ে না গেলেই পারতিস!

জিজ্ঞাসা করলাম, উনি খুব রেগেছেন?

—রাগবে না? একবার দেখা পর্যন্ত করলি না।

বললাম, দেখা করলে যে ধরে নিয়ে যেত!

দিদিমা বললেন, তবে কি তুই ভেবেছিস রাণীগঞ্জে য্যাবি না? লেখাপড়া করবি না?

না না তা কেন, তুমি কি বললে তাই বল।

দিদিমা বললেন, বললাম, এখন ওর মনের অবস্থা ভাল নয়, দু'দিন পরে বুঝিয়ে-সুজিয়ে পাঠিয়ে দেবো।

বাঁচা গেল।

কিন্তু সেই দু'দিন আর পার হতে চায় না কিছুতেই।

রাণীগঞ্জ যেতে আর মন চাইছে না। অথচ পড়া ছেড়ে দেবো সেকথা ভাবতেও পারছি না।

অবনীর সঙ্গে হৈ হৈ করে দিনগুলো কাটছিল মন্দ নয়। এমন দিনে হঠাৎ একদিন দুপুরে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে পিওন আমার হাতে একখানি চিঠি দিয়ে গেল। খামের ওপরে হাতের লেখা দেখেই চিনতে পারলাম। নজরুলের চিঠি। টিকিটের ওপর কোন্ পোস্টাপিসের ছাপ ঠিক পড়তে পারলাম না।

চিঠিখানা পড়লেই তো ফুরিয়ে যাবে। খুললাম না। চিঠিখানা পেয়েছিলাম স্নান করবার আগে। ভাবলাম স্নান করে খেয়েদেয়ে নিশ্চিত হয়ে একা বসে বসে পড়বো।

তখন আমার একমাত্র সঙ্গী ছিল রবীন্দ্রনাথের একখানি কবিতার বই। অণ্ডালের বাড়িতেই সেখানি রেখে দিয়েছিলাম। সেই বই-এর ভেতর চিঠিখানা রাখতে গেলাম।

রাখতে গিয়ে আর লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। স্নান করব, তারপর খাব, তারপর অবনীর কাছ থেকে চুপি চুপি সরে গিয়ে একা বসে বসে পড়ব, অনেক দেরি হয়ে যাবে।

খামের মুখখানা ছিঁড়তে গিয়ে দেখি, রাণীগঞ্জের ঠিকানায় চিঠি না দিয়ে সে সোজা অণ্ডালের ঠিকানা লিখেছে খামের ওপর।

নজরুল জানলে কেমন করে যে আমি অণ্ডালে আছি ?

জানা অবশ্য শক্ত কিছু নয়। সেও যদি ঠিক আমার মত ফিরে আসতো, রাণীগঞ্জে থাকা তার পক্ষেও সম্ভব হতো না। হয় সে তার চুরুলিয়া গ্রামে গিয়ে বসে থাকত, আর নয়-তো কোথাও পালাতো।

খামটি খুলেই দেখি—বেগুনী রঙের কালিতে লেখা এক চিঠি।

প্রতিদিনের প্রতিটি কথা সে রসিয়ে রসিয়ে লিখেছে। প্রথমেই লিখেছে, তোমার অভাবে ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে সত্যি, কিন্তু ভালই হয়েছে তুমি আসনি। মিলিটারি আইন-কানুন ভারি কড়া। তুমি সহ্য করতে পারতে না। আমার কথা ভাবছ ? এর চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট পেয়েছি আমার জীবনে। এ আমার গা-সওয়া হয়ে যাবে দু'দিনেই।

ভারি সুন্দর একটা গল্পের প্লট এসেছে আমার মাথায়। কখন লিখব এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। লেখা হলেই তোমাকে জানাবো।

তারপর অনেক কথার পর লিখেছে হুগিয়ার কথা। ব্যাটা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। ওকে দেওয়া হয়েছে কিচেনে। ভাব করে ফেলেছে সবাইকার সঙ্গে। কিন্তু যেদিন চুরি করবে, সেইদিন বুঝবে মজা ! দাঁত বের-করা হাসি ওর বেরিয়ে যাবে।

শেষে লিখেছে—জায়গাটা কিন্তু ভারি সুন্দর।

দশ

নজরুলের প্রথম চিঠির জবাব দিলাম।

জবাবটি লিখতে আমার চারদিন লেগেছিল। চারদিন না বলে চার রাত্রি বলাই উচিত। কারণ দিনের বেলা নজরুলকে চিঠি লিখতে আমার ভাল লাগতো না। নিশুতি রাত্রে সারা গ্রাম যখন ঘুমিয়ে পড়ত, অণ্ডালের বাড়ির দোতলায় শিয়রের কাছে বড় জানলাটা খুলে দিয়ে লণ্ঠনের আলোয় শুয়ে শুয়ে চিঠি লিখতাম।

এবার সবই আমার নিজের কথা। সে-সব কথা নাই-বা শুনলেন! পরে যদি কোনোদিন শুনতে চান তো শোনাব সে ছন্নছাড়া জীবনের এক রহস্যময় ইতিকথা। এখন যতটুকু না বললে নয়, ততটুকু বলি।

রাণীগঞ্জ থেকে ক্রমাগত তাগিদ আসছে। লেখাপড়া ছেড়ে দিলাম কি না সেই কথাই জানতে চান রায়-সাহেব—আমার দাদা-মশাই।

সুতরাং এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই।

নজরুলের চিঠির জবাব আসবে অণ্ডালে। অণ্ডাল ছেড়ে যেতেও ইচ্ছে করছে না। পড়াশোনার কি হবে—সেও এক দারুণ দুশ্চিন্তা। মূর্খ হয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না।

শেষে একদিন দিদিমা'র কাছ থেকে পাঁচটি টাকা নিলাম। বললাম, কয়েকটা দিনের জন্যে আমি গা-ঢাকা দেবো। কিচ্ছু ভেবো না তুমি।

দিদিমা জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাবি?

বললাম যেখানেই যাই তোমাকে চিঠি লিখে জানাব। আমি নিজেই জানি না কোথায় যাব।

মিথ্যে কথা বললাম। কোথায় যাব আমি জানি। আর এও জানি, যেখানে যাচ্ছি সেখানের নাম শুনলে দিদিমা দুঃখিত হবেন।

তাঁর দুঃখিত হবার কারণটা অবশ্য অবহেলা করবার মত নয়। তবু নিরুপায় হয়ে আমি স্থির করলাম—সেইখানেই যাব।

যাব রূপসীপুর গ্রামে। বীরভূম জেলার পশ্চিম প্রান্তে সাঁওতাল-পরগণার গায়ে-গায়ে লাগা ছোট্ট একখানি গ্রাম। রেল-স্টেশন থেকে অনেক দূরে—ঢেউ-খেলানো মাঠের ওপর দিয়ে, পায়ে-হাঁটা আঁকা-বাঁকা পথ ধরে, ছোট ছোট শুকনো নদী আর শাল-মহুয়ার জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হয়। ছেলেবেলায় দু'একবার গেছি সেখানে। স্বপ্নের মত মনে আছে তার স্মৃতি। মনে হয় যেন গরুর গাড়িতে চড়ে দূর অতীতের কোন্ এক বসন্ত-সন্ধ্যায় অতিক্রম করেছিলাম ওই সুদীর্ঘ পথ। জোড়া তালগাছের মাথায় দেখেছিলাম একফালি চাঁদ। বনের গায়ে নেমেছিল কুয়াশার মত ঝাপসা জ্যোৎস্না, আর কেমন যেন একটা নেশা-ধরিয়ে-দেওয়া গন্ধ পেয়েছিলাম মহুয়া-ফুলের। দূরের কোন্ সাঁওতালপল্লী থেকে আসছিল মাদলের আওয়াজ আর শেয়াল ডাকছিল পথের ধারে।

শেয়ালের ডাক শুনে ভয়ে আমি জড়িয়ে ধরেছিলাম আমার বাবাকে। তিনিই আমাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

রূপসীপুর আমার পৈতৃক বাসস্থান।

অথচ আমার দিদিমা এই রূপসীপুরের নাম শুনলে চটে যান।

নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবু আমাকে বলতে হবে। না বললে আপনারা খেই হারিয়ে ফেলবেন।

আমার মা যখন মারা যান তখন আমি নিতান্ত শিশু। মাতৃহীন সেই শিশুকে আমার মাতামহী পুত্রাধিক স্নেহে মানুষ করে তুলেছেন। তাই রূপসীপুরের নাম শুনলেই তাঁর ভয় হয়—আমার বাবা পাছে আমাকে নিয়ে চলে যায়, পাছে আমি আমার বাবার দিকে ঢলে পড়ি!

অবনীকে চুপি চুপি বলেছিলাম, আমার নামে চিঠিপত্র এলে রূপসীপুরের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিস।

—তোকে চিঠি কে লিখবে? নজরুল?

বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু দিদিমাকে এখন বলিস না যেন আমি কোথায় যাচ্ছি।

অবনীর ইচ্ছা নয়—আমি কোথাও যাই। বললে, ওখানে কি জন্যে যাবি মরতে? যাস না।

কিন্তু কিছুতেই যখন সে আমাকে বুঝিয়ে উঠতে পারলে না, তখন একসময় চুপি চুপি গিয়ে দিদিমাকে দিলে বলে। যা বারণ করেছিলাম তাই করলে।

দিদিমা ডেকে বললেন, লেখাপড়া তোর কিছু হবে না তা আমি জানি। বাপ যার সাপ ধরে ধরে ঘুরে বেড়ায়, তার ছেলে কখনও মানুষ হয় না। আবার শুনলাম নাকি সেইখানেই তুই যেতে চাচ্ছিস।

চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলাম, দিদিমা বলে যেতে লাগলেন, বাপ আবার বিয়ে করেছে, সৎ-মায়ের সংসার, ছু'বেলা ছু'মুঠো খেতে পাবি কি না কে জানে। আর এখানে আছিস রাজার ছেলের মত। সেটা তোর সহ্য হচ্ছে না। সেইখানেই যাবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করছিস।

যে-বাপকে আমি সচরাচর দেখি না, যাকে আমি ক্বচিৎ কখনও দেখতে পাই—তার প্রতি আমার কোনও আকর্ষণ নেই বললে ভুল বলা হবে। কিন্তু সত্যি যে আমি বাবার কাছে যাবার জন্যই সেখানে যাচ্ছি তা নয়, আমি যাচ্ছি অন্য কারণে।

প্রথমত এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া দরকার। এবং পালিয়ে যাবার মত আর কোনও জায়গা আমার জানা নেই। দ্বিতীয়ত আমার এই আবাল্য পরিচিত কুঠি-কারখানার দেশ থেকে কয়েকটা দিনের জন্য যাব এমন একটা দেশে যেখানকার আকাশের দিকে তাকালে কল-কারখানার চিমনি দেখা যায় না, হেড্‌-গিয়ারের চাকা ঘোরে না, গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোডের ওপর মোটর ছোটে না। সেই যে কবে কখন দেখেছি—জোড়া তালগাছের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছিল, কুয়াশার মত জ্যোৎস্না নেমেছিল শালবনের পথের বাঁকে, সেই কোন্‌ শেয়াল-ডাকা প্রান্তর থেকে শুনেছিলাম সাঁওতালদের মাদলের আওয়াজ, আর পেয়েছিলাম মহুয়াফুলের মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ—যার কথা আমি আজও ভুলিনি। সব-কিছু মনে হয় যেন স্বপ্নে-দেখা। সে স্বপ্ন যেন আবার একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।

কিন্তু সে-কথা আমি দিদিমাকে বুঝাই কেমন করে? বুঝিয়ে বললেও তিনি বুঝতে চাইবেন না।

শেষে একদিন চলেই গেলাম।

চলে গেলাম সেই অচেনা পথ ধরে। স্টেশনে নেমেই দেখি কাঁকর-পাথরের শুকনো ডাঙা। একটা গাছ পর্যন্ত নেই। এ আমি কোথায় এলাম? কোথায় আমার সেই স্বপ্নলোক?

স্বপ্নভঙ্গের নিরাশা নিয়ে তবু চলেছি সেই শুষ্ক রুক্ষ নিষ্পাদপ প্রান্তরের ওপর দিয়ে। শুনেছি পশ্চিমদিকে গ্রাম। কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে দিকভ্রম হয়ে গেছে। কোন্‌টা পূর্ব, কোন্‌টা পশ্চিম বুঝতে পারছি না। জনমানবহীন প্রান্তরে এমন কেউ নেই যাকে জিজ্ঞাসা করব।

ডাঙাটা পেরিয়েই দেখি, ঢেউ-খেলানো মাটি অকস্মাৎ নীচে নেমে গেছে। তারপর আবার উঠেছে ওপরে। আর সেই নাবাল্‌ জমির ধার ঘেঁষে নীলাঞ্জনবর্ণ বনরেখা দূরদূরান্তে গিয়ে মিশেছে পশ্চিম দিগন্তে। বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত পশ্চিমের আকাশে রক্তবর্ণ সূর্যকে দেখে আমার দৃষ্টিবিভ্রম ঘুচে গেল। ঢালু জমিতে নেমে আঁকা-বাঁকা পথ ধরে এগিয়ে চললাম। দু'দিকে স্নিগ্ধশ্যাম শস্যক্ষেত্র। তারই মাঝখান দিয়ে পায়ে-চলা পথের নিশানা। সুমুখে শালের বন। বনের একপ্রান্তে কয়েকটি ছোট ছোট মাটির বাড়ি।

এতক্ষণ পরে মানুষের সঙ্গে দেখা। ক্ষেতের ধারে বসে বেড়া বাঁধছে একজন সাঁওতাল। তাকেই জিজ্ঞাসা করলাম, রূপসীপুর কোন্‌দিকে যাব?

উঠে দাঁড়াল লোকটি। মাথায় বাবরি চুল। সুন্দর সুগঠিত দেহ। বললে, ইদিকে কুথা চলে এসেছিস তুঁই? উ গাঁ-টো তো হোই বাগে।

বলেই সে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে। তাকাতেই দেখি— সেই আমার আগের-দেখা জোড়া তালগাছ।

লোকটি বললে, বুনের ভিতরে ভিতরে একটো পথ আছে। হা ত্যাখ্‌ ভাল্‌—হোই আম-বাগানের উদিকে তুদের গাঁ।

ধন্যবাদের কোনও প্রয়োজন নেই। ধন্যবাদের মানেও বোঝে না এই অনার্য সাঁওতাল।

এগিয়ে গেলাম বনের দিকে। স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশ। মহুয়ার গন্ধে মাতাল হাওয়া বইছে এলোমেলো। কিন্তু বনের ভেতর গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হলো। দু'দিকে দুটো পথ। কোন্‌দিকে যাব?

দাঁড়িয়ে ভাবছি। হঠাৎ শুনলাম, চল্‌!

চমকে তাকালাম।

ফিরে দেখি, সেই আদিবাসী অনার্য—সেই সাঁওতাল যুবক এসে দাঁড়িয়েছে আমার পেছনে। বললে, চল্ তুখে পথটো ধরাঁই দিয়ে আসি-গা।

একেই ধন্যবাদ না জানিয়ে চলে এসেছিলাম।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম কি মাঝি?

—আমার নাম জেনে তুর কি হবেক্? চল্‌।

নাম-না-জানা সেই মানুষটি আমাকে গ্রামে পৌঁছে দিয়ে গেল।

তাকে আমি আজও ভুলতে পারিনি। সেই অসভ্য নিরক্ষর সাঁওতাল যুবককে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিতান্ত ছোট্ট একখানি গ্রাম।

রাজবাড়ির মত মস্ত বড় এক বাড়ি থেকে গিয়ে পড়লাম বহুদিনের পুরনো একটি দালানবাড়ির দোতলার দু'খানি ঘরে। সাত ভাই-এর একান্নবর্তী পরিবার। বৃদ্ধ পিতামহ তখনও বেঁচে। দালানবাড়িতে সকলের কুলোয় না, তাই আরও অনেকখানা জায়গা জুড়ে ছোট-বড় অনেকগুলো মাটির ঘর। ঘরের পর গোয়াল, গোয়ালের পর খামার, খামারের পর পুকুর।

মস্ত বড় চাষী গৃহস্থ। দেখলেই মনে হয়, এককালে অবস্থা খুব ভাল ছিল। এখন যেন একটু পড়ে এসেছে।

বুড়ো একা আর সামলাতে পারে না। ছেলেদের প্রত্যেকের একটি করে সংসার। অথচ বাপকে কেউ একটি পয়সা দিয়েও সাহায্য করে না।

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে

সে এক অদ্ভুত সংসার।

অতি প্রত্যুষে সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণের শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। দেখি, বৃদ্ধ পিতামহ—ধপ ধপ করছে সাদা গায়ের রং—গলায় শুভ্র যজ্ঞোপবীত, পুকুরে স্নান করে এসে বসেছেন বড়-বাড়ির উঠোনে একটি বেলগাছের তলায়। সুমুখে পূজা-আহ্নিকের নানাবিধ উপকরণ এনে নামিয়ে দিয়েছে যে-বৌ-এর যেদিন পালা।

আহ্নিকও তেমনি বিচিত্র।

একদিকে তামার পাত্রে ফুল বেলপাতা, কোষাকুষি, গঙ্গাজল, আর একদিকে একটি বোতলে কারণ-বারি, পানপাত্র, হুঁকো-কলকে।

আহ্নিক শেষ হয়ে যাবার পর ঘন ঘন তামাক সেজে হাতে ধরিয়ে দেবার জন্য তাঁর একজন দৌহিত্র বসে আছে একটু দূরে।

বড় বড় ছেলেদের মধ্যে একজন দেখি প্রত্যহ সকালে কাঠের একটি টুল নিয়ে ঘরের দোরের কাছে বসে বসে 'বঙ্গবাসী' পড়ছেন। বঙ্গবাসী সাপ্তাহিক পত্রের তিনি গ্রাহক। একখানি কাগজ তিনি সাতদিন ধরে পড়েন রোজ এক ঘণ্টা করে। একদিন তিনি আমাকে তাঁর কাছে ডেকে সেকথা বলেছেন। আর বলেছেন, তিনি নাকি আমার কাকাবাবু হন। আমার যুদ্ধে যাবার খবরটা তিনি অবশ্য শুনেছিলেন। আমার মুখ থেকে আর একবার শুনলেন। কিন্তু সংবাদটাকে মনে হল তিনি যেন সত্য বলে স্বীকার করে নিতে পারলেন না। ঠোঁট উল্টে বললেন, কি জানি বাবা, আমার 'বঙ্গবাসী'তে তো ওঠেনি।

আর-একজন দেখি ছোট একটি ঘরের ভেতর দিনরাত কাঠের কাজ করছেন। কৌতূহলবশে একদিন সেই ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছিলাম। ঢুকেই দেখি, ছোট-খাটো একটি কারখানা। নানারকমের যন্ত্রপাতি ইতস্তত ছড়ানো, আর গৃহস্বামী চোখে চশমা পরে একাগ্রমনে একটি কাঠের ওপর বাটালি দিয়ে কি যেন তৈরি করছেন। স্পিরিটের একটা তীব্র গন্ধ নাকে আসছে।

নানা রকমের ছোটখাটো কাঠের আসবাবপত্র আর খেলনা তিনি তৈরি করেছেন। ছোট্ট একটি বুককেস দেখলাম সদ্য তৈরি

হয়েছে। অপরাধের মধ্যে হাত দিয়ে নেড়ে দেখতে চেয়েছিলাম জিনিসটে। চট্ করে পিঠের ওপর এক বাড়ি পড়তেই পিছন ফিরে দেখি, হাতের হাতুড়িটা ফেলে দিয়ে একটা কাঠ তুলে নিয়েছেন তিনি। বলছেন, দিলি তো বার্নিশ চটিয়ে? বেরো, বেরো এখান থেকে।

বলেই তিনি বোধ করি চিনতে পারলেন। নাকের চশমাটা একটু তুলে দিয়ে বললেন, কে তুই? ধরণীর ছেলে?

মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

—তা বলতে হয়। আমি ভাবলাম বুঝি আন্নাকালীর ব্যাটা!

বলেই তিনি হি হি করে হাসলেন। বললেন, এই ছাখ্ এইসব আমি তৈরি করেছি। নিজের হাতে।

বললাম, তা এ-সব আপনি শহরে বিক্রি করেন না কেন?

মুখখানা তাঁর গম্ভীর হয়ে গেল হঠাৎ। কোনও জবাব না দিয়ে আবার হাতুড়ি বাটালি তুলে নিয়ে কাজ করতে করতে তিনি আপনমনেই বলতে লাগলেন, ইচ্ছে ছিল একটা কিছু করবার, কিন্তু টাকা কোথায়?

বলেই তিনি তাড়াতাড়ি চেপে গেলেন কথাটা। মুখ তুলে বললেন, আমি তোমার কে হই জানো তো? জ্যেঠামশাই। ন' জ্যেঠাবাবু। হ্যাঁ। আমি কাঠের কাজ করি, আর তোমার বাবা মাটির কাজ করতে পারে খুব ভাল। আমাদের বড় দাদা ছিল ডাক্তার, মেজদাদা আদালতের পেস্কার আর বাকি সব আমরা এক-একটি ওস্তাদ। হরিদাস খুব সুন্দর তবলা বাজায়, আর আনন্দময় বাজায় বেহালা।

ঠুক্ ঠুক্ করে কাজ করেন আর বলে চলেন তাঁদের বংশের ইতিহাস।

সে ইতিহাস অবশ্য আমারও।

আমারও রক্তের মধ্যে তার সন্ধান যে পাই না তা নয়। তবে এখানে এসে যেন সেটা আরও বেশি করে অনুভব করছি।

বাড়ির দোতলায় মাত্র দু'খানি ঘর। বাকিটা সব খোলা ছাত।

মনে হয় যেন বাড়িটা তৈরি হতে হতে অসমাপ্ত রয়ে গেছে। ছাতের ওপর খাড়া কয়েকটা দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু ছাত পড়েনি।

সবটা আমার বাবার দখলে।

পাকা ইটের সেই দেয়ালগুলোর ওপর কাঠ আর খড় দিয়ে ছাদন করিয়ে নিয়ে সে এক অদ্ভুত রকমের ঘর তৈরি করে নিয়েছেন তিনি।

লম্বা লম্বা সেই ঘরগুলো হয়েছে তাঁর বিচিত্র কর্মশালা।

এগারো

একটা ঘরে দেখছি নানারকমের মাটির তৈরি জন্তু জানোয়ার। চট্ করে দেখলে চমকে উঠতে হয়। মনে হয়—জীবন্ত।

ছোট্ট একটি ভেড়ার ছানাকে ধরবার জন্যে একটা শেয়াল পা টিপে টিপে এগুচ্ছে। তার পেছনে তিনটে তিন রকমের কুকুর ছুটছে শেয়ালটাকে ধরবার জন্যে।

ঘরের এক কোণে একটি ছাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার চারটি বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে।

ওদিকে একটি ছেলে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

দেয়ালের গায়ে একটি টিক্‌টিকি ছুটেছে একটা বিছে ধরবার জন্যে।

এটা হল নির্জীব মাটির পুতুলের ঘর।

তার পাশের ঘরে সব জীবন্ত জীবের সমারোহ। দেয়াল-জোড়া পাতলা জাল-দেওয়া কাঠের র‍্যাক। আর সেই পাঁচতলা র‍্যাকের ভেতর প্রায় শ'খানেক গিনিপিগ্ ছুটে বেড়াচ্ছে। র‍্যাকের ওপর তিনটে বড় বড় সাপের ঝাঁপি।

মুখপোড়া একটি বাঁদর খেলা করছে ঘরের ভেতর। তার গলায় একটি ঘুঙুর বাঁধা।

বাঁদরটিকে বেঁধে রাখা হয়নি। সম্পূর্ণ স্বাধীন সে। ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। তবু সে পালায় না।

সবচেয়ে বিচিত্র দেখলাম একটি বক।

পরের দিন দুপুরে দেখলাম আমার বিমাতা বাড়ির খোলা ছাতের ওপর দাঁড়িয়ে ডাকছেন, টুল্‌টুল্! টুল্‌টুল্!

প্রথমটা বুঝতে পারিনি। দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম শুধু। দেখলাম, সাদা একটি বক কোত্থেকে উড়ে এসে বসল ভাঙা ছাতের আলসের ওপর।

মা বললেন, এসো, আমাকে কৃতার্থ করবে এসো। খেতে

দিইনি শুনলে তোমার বাবু এসে আমার অপমানের কিছু বাকি রাখবেন না।

বকটি দেখলাম, লম্বা লম্বা পা তুলে তুলে মার পায়ের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। মা হাতে করে একমুঠো ভাত এনেছিলেন তার জন্যে। সেগুলি তিনি ছড়িয়ে দিলেন। বকটি নাচতে নাচতে খুঁটে খুঁটে ভাত খেতে লাগল।

ভারি মজা লাগল দেখতে। বকের নাম টুল্‌টুল্। বকের নাকে একটি নোলক। দু-পায়ে দুটি ছোট ছোট রিং।

খাওয়া শেষ হতেই টুলটুল্ উড়ে চলে গেল।

মা'র নজর পড়ল আমার দিকে। বললে, কি দেখছিস? এই সব তোর বাপের কীর্তি।

বাবার সঙ্গে তখনও আমার দেখা হয়নি। জিজ্ঞাসা করলাম, বাবা কখন আসবেন?

মা বললেন, কি জানি বাবা, যিনি আসবেন তিনিই জানেন।

এই বলে তিনি আরম্ভ করলেন কথা বলতে।—সেদিন তখন খেতে বসেছিল তোর বাবা, খবর এল লোকপুরের একটি ছেলেকে গোখ্‌রো সাপে কামড়েছে। ব্যস্, যেমন বসেছিল তেমনি উঠল, খাওয়া আর হলো না। কি-সব জড়িবড়ি পকেটে নিয়ে ছুটল সেই লোকটার সঙ্গে।

জিজ্ঞাসা করলাম, এর জন্যে বাবাকে ওরা টাকা দেবে?

মা বলেলন, দিলেও নেবে না তোর বাবা। বলে, এর জন্যে টাকা নাকি নিতে নেই।

—ছেলেটা যদি বেঁচে যায়, তবু নেবে না?

—মরে আবার কখন? সবাই তো বাঁচে।

বলতে বলতেই বাবা এলেন।

একটা ছেলে এসে খবর দিলে।—'ফুলবাবু এলো।'

আমার বাবাকে বুঝি এখানে সবাই ফুলবাবু বলে। তিনি তাঁর বাবার চতুর্থ সন্তান।

খবরটা পেয়ে মা আমাকে বললেন, দেখবি আয়!

খোলা ছাতের দক্ষিণদিকের আল্‌সের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

নীচে তাকিয়ে দেখলাম, একটা গরুরগাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। বাবা নামলেন সেই গাড়ি থেকে। দুটো ঝুড়ি-ভর্তি নানা রকমের তরিতরকারি আনাজ নামানো হল। ছোট একটি চুপড়িতে অনেকগুলি হাঁসের ডিম। আর সবার শেষে দড়ি দিয়ে বাঁধা সরা-ঢাকা একটা মাটির হাঁড়ি।

হাঁড়িটা গাড়োয়ান কিছুতেই হাত দিয়ে ছোঁবে না। বাবা নিজেই সেটা নামিয়ে রাখলেন পথের পাশে।

মা বললেন, হয়েছে!

তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। মুখখানা কেমন যেন হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে?

মা বললেন, সেই সাপটাকে ধরে এনেছে।

—কোথায়?

বললেন, ওই যে ওই হাঁড়ির ভেতর।

এই বলে তিনি সেইখান থেকেই বোধ করি বাবাকে উদ্দেশ করে বললেন, ও-হাঁড়ি আর ওপরে তুলো না। যেখানে হোক রেখে এসো।

বাবা জবাব দিলেন, অতি উৎকৃষ্ট কালীয় নাগ। দেখবে না? বড় ভাল জাতের সাপ।

মা বললেন, তুমি দেখেছ তো? তাহলেই হবে। আমাদের আর দেখে কাজ নেই।

সাপের হাঁড়িটা নীচে কোথায় যেন রেখে দিয়ে বাবা ওপরে এলেন। বললেন, সাপটা আমি নিয়ে এলাম ইয়াসিন ওস্তাদের জন্যে। ওর বিবি বলেছিল, সাপ কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না বাবু, যদি একটা সাপ-টাপ পাও তো ওকে দিও।

মা বললেন, ইয়াসিনের সাপ তো আছে।

বাবা বললেন, দুটো সাপ ছিল। দুটোই মরে গেছে।

—কি বিপদ যে কোন্‌দিন হবে কে জানে! সাপ-টাপগুলো আর ধরো না। চা খাবে এসো।

এই বলে স্টোভ জ্বেলে মা চা করতে বসলেন, আর বাবা বলতে লাগলেন সাপটাকে কেমন করে ধরলেন, তার গল্প।

বললেন, যে-ছেলেটাকে কামড়েছিল, আমি যখন গেলাম, তার আর কিছু ছিল না। অনেক কষ্টে বাঁচিয়েছি। তাই তো এত দেরি হলো।

আর ঠিক সেই সময় ওদিকে আবার আর-এক বিপদ। হৈ হৈ করে একদল ছেলে ছুটে এলো—হাতে লাঠি, সাবল, বর্শা। এসেই বললে, আপনি একবার আসুন চট্ করে।

সাপটাকে তারা নাকি খোঁচা মেরে মেরে আর ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে তেঁতুল গাছ থেকে নামিয়েছে। কিন্তু কেলে গোখ্‌রো সাপটা এত বড় আর এত তেজী যে, কেউ তার কাছে যেতে পারছে না। দূরে থেকে যতবার তাকে মারবার চেষ্টা করা হয়েছে, ততবারই সাপটা ফণা তুলে রুখে দাঁড়িয়েছে। ভয়ে আর কেউ কাছে যায়নি। অত অত লোক দেখে সাপটাও তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়েছে রমণ মোড়লের খামারে। খামারের একদিকে গরুর গোয়াল, আর একদিকে দুটো বড় বড় খড়ের গাদা। কোথায় যে সে ঢুকেছে কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। রমণ মোড়ল সবাইকে গালাগালি করছে। বলছে, মারতেই যদি না পারবি তো ওকে নামাতে গেলি কেন গাছ থেকে?

কাঁদ-কাঁদ হয়ে একটা লোক আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরতে এলো। শুনলাম সে রমণ মোড়লের ছোট ভাই। বললে, আমাকেই ওই সাক্ষাৎ যমের সামনে যেতে হবে হুজুর। গরু বাঁধতে হবে। গাই দুইতে হবে। খড়ের গাদা থেকে খড়ও টানতে হবে। এখন আপনি না বাঁচালে আমি তো গেলাম।

অনেক করে বোঝালাম তাদের। বললাম, মানুষের ভয়ে ওরা লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ায়। তার ওপর আজ ও দেখেছে এতগুলো মানুষ ওকে তাড়া করেছে। প্রাণের ভয়ে এখন ও যেখানে গিয়ে লুকিয়েছে, সেখান থেকে সহজে ও বেরুবে না। তোমার কোনও ভয় নেই।

লোকটার বোধ হয় বিশ্বাস হলো না। বললে, ওই তো রুগী আপনার উঠে বসেছে। আপনি চলুন হুজুর। সাপটাকে আপনি

শুধু বের করে দেবেন। আপনি কড়ি চালতে জানেন। আমরা জানি।

মনে মনে হাসলাম। কড়ি চেলে সাপ বের করেছি অনেক। কিন্তু কড়ি চালা-টালা সব বাজে কথা। মন্ত্র-তন্ত্র, কড়ি চালা, হাত চালা—সব-কিছু লোকজনের বিশ্বাসের জন্যে। তবু বললাম, সবই জানি মোড়ল, কিন্তু ও সাপ আজ যদি কাউকে কামড়ায় তো আমি তার জীবনের জন্যে দায়ী রইলাম। সাপ আর বাঘ কখনও এক জায়গায় বেশিদিন থাকে না। তাড়া-খাওয়া সাপ তো থাকবেই না। এতক্ষণ ছ্যাখোগে হয়ত তোমাদের খামার থেকেও সে পালিয়েছে।

মোড়ল বললে, আজ্ঞে না, পালাতে পারবে না। খামারের আশে-পাশে আমরা লোক রেখে এসেছি।

এই কথা বলতে না বলতেই একটা ছেলে ছুটে এসে খবর দিলে—সাপটা বেরিয়েছিল, আমাদের দেখে আবার ঢুকে পড়লো। কোথায় ঢুকেছে আমরা দেখেছি।

ছেলেরা শুনলে না কিছুতেই। আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিলে। তাদের দিয়ে প্রথমে একটা হাঁড়ি আনালাম। আর হাঁড়ির মুখে ঢাকা দেবার জন্যে একটা সরা। বললাম, কেউ তোমরা মারতে পারবে না ওকে। সাপটাকে আমি জ্যান্ত ধরে নিয়ে যাব।

ইয়াসিনের কথা তখন আমার মনে হয়েছে।

তারা যে জায়গাটা দেখিয়েছিল, আমি জানি সাপ সেখানে নেই। কান পেতে শুনতেই তার নিশ্বাসের আওয়াজ পাওয়া গেল ঠিক তার উল্টো দিকে। পুরনো একটা খড়ের গাদার পাশে অনেকগুলো খোয়া ইট জড়ো করা ছিল। সাপটা গিয়ে ঢুকেছিল তারই তলায়। ছেলেদের বললাম, তোমরা আস্তে আস্তে এই দিকের ইটগুলো সরাও।

মস্ত এক লাঠি হাতে নিয়ে একজন জোয়ান ছোকরা ইট সরাবার জন্যে এগিয়ে এলো। কিন্তু ইটে হাত দিতে গিয়ে সাপটার ফোঁস ফোঁস আওয়াজ যেই তার কানে গেছে, অমনি সে সেখান

থেকে ছিট্‌কে একেবারে দশ হাত দূরে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, বাপ্‌স্! যে রকম গর্জন করছে, এক্ষুনি ও তেড়ে এসে কামড়ে দেবে। আমি পারবো না ইট সরাতে।

ছেলেদের অনেক করে বোঝালাম। বললাম, ওটা ওর রাগের গর্জন নয়, ওটা ওর ভয়ের দীর্ঘনিশ্বাস। খুব যখন ভয় পায়, তখন ওরা ওইরকম করে। আমি রয়েছি, তোমাদের কোনও ভয় নেই। আমি ওকে ধরে ফেলব।

হাতে আমার ছোট্ট একটা কাঠের টুকরো ছাড়া আর কিছু নেই। ওরা বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারলে না।

আমি চাই ইটগুলো এমনভাবে সরিয়ে ফেলতে যেখানে সাপটা একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে যাবে। না পারবে মুখটাকে কোথাও গুঁজে ফেলতে, না পারবে লেজ দিয়ে কোনও কিছু জড়িয়ে ধরতে।

ছেলেরা কেউ এগিয়ে এলো না। লাঠি-সোঁটা নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আস্ফালন করতে লাগল।

মা এই সময় আমাদের দু'জনের মুখের সামনে দু'কাপ চা নামিয়ে দিলেন। বললেন, সাপ ধরার গল্প আর শুনিসনি বাবা। ও-সব শুনলে আমার গা ঘিন ঘিন করে।

বাবা বললেন, তোমাকে তো শোনাইনি।

মা বললেন, শুনতে আমি চাই না। কিন্তু ওকেই-বা শোনাচ্ছ কেন? ওকেও কি নিজের পাটে বসাবে নাকি?

—না না, সব কিছু জেনে রাখা ভাল।

মা বললেন, তোমার ওই বিদ্যেগুলো ওর না জানলেও চলবে। এই বলে তিনি চলে গেলেন সেখান থেকে।

আমি কিন্তু তখন শোনবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছি। জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর? ইটগুলো কে সরালে?

চা খেতে খেতে বাবা বলতে লাগলেন, আমাকেই সরাতে হলো। একটি একটি করে সরাতে সময় লাগল অনেক। মাটির হাঁড়িটা হাতের কাছে এনে রাখলাম। ছেলেদের সাবধান করে দিলাম —কেউ যেন ঢিলটিল না ছোঁড়ে। নিজের বসবার দাঁড়াবার সুবিধে

করবার জন্যে অনেকগুলো ইট সরিয়ে ফেললাম। সাপটাকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। ভেবেছিলাম, সেখানকার খান-দুই ইট সরাবো শেষে। কিন্তু সাপটাকে দেখতে পেয়েই বোধ করি একটি ছেলে চীৎকার করে উঠল—সরে যান। মুখ বাড়িয়েছে।

কালীয় নাগ খুব তেজী সাপ। ছেলেটা যেই চীৎকার করেছে, সাপটাও দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে ইটের ফাঁকে ফণা তুলে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই মারলে এক ছোবল। ছোবলটা ফট্ করে লাগলো গিয়ে একটা ইটের ওপর। ভালই হলো। ইট দুটো আগে সরিয়ে ফেললে সাপটা খেলবার জায়গা পেতো। আমি আর এক সেকেণ্ডও দেরি করলাম না। ধরে ফেললাম সাপটাকে। ধরবার ভারি একটা মজার কায়দা আছে। ডান হাত দিয়ে মুখখানা চেপে ধরেই সঙ্গে সঙ্গে লেজটা ধরতে হয় বাঁ-হাত দিয়ে। নইলে লেজটা যদি একবার সে হাতে জড়াতে পারে তো ব্যস্, আর রক্ষা নেই। এমন জোরে চাপ দেবে যে, যত বড় জোয়ানই হোক, হাতের মুঠো তার আল্‌গা হয়ে যাবেই। আর সঙ্গে সঙ্গে ছোবল মেরে দেবে বিষ-দাঁত দুটো বসিয়ে।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি করলেন ?

—লেজে ধরে তুলে ওদের মাথাটা নীচের দিকে করে বারকতক ঝাকানি দিলেই ওদের সর্বাঙ্গ শিথিল হয়ে যায়, সহজে আর মাথা তুলতে পারে না। সেইরকম করেই ওকে হাঁড়িতে পুরে নিয়ে এসেছি। কাল ইয়াসিনকে দিয়ে আসব। বিষ-দাঁত ভেঙে ও খেলা দেখাবে।

পরের দিন সকালে বাবা নিজেই যাচ্ছিলেন ইয়াসিনের বাড়ি। আমি বললাম, আমি সঙ্গে যাব। সাপটাকে দেখবো।

বাবা বললেন, চল।

মা এসে দাঁড়ালেন আমাদের কাছে। বললেন, লেখাপড়া কি তুই ছেড়ে দিয়ে এসেছিস নাকি ?

বললাম, না তো !

মা বললেন, কতদিন পরে বাপের বাড়ি এসেছিস, ভেবেছিলাম

দু'চারদিন থাকতে বলব, কিন্তু যে-রকম দেখছি তাতে তো বলতে ইচ্ছে করছে না।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

মা বললেন, বুঝতে পারছো না? বাপ-ব্যাটায় চললে সাপের হাঁড়ি নিয়ে ইয়াসিন-সাপুড়ের বাড়ি। লোকে দেখলে কি বলবে বল তো? আর এই কথা যদি রায়-সাহেবের কানে গিয়ে ওঠে!

—উঠুকগে। আয়!

বাবা জুতো পায়ে দিলেন। আমিও চললাম তাঁর পিছু পিছু।

সাপের হাঁড়িটা হাতে করে নিয়ে যেতে রাজী হলো না কেউ। এক টুকরো দড়ি দিয়ে হাঁড়ির মুখটা বেঁধে বাবা নিজেই সেটা হাতে ঝুলিয়ে নিলেন। বললেন, বেশিদূর নয়। চল।

পায়ে-চলা মেঠো পথ ধরে মস্ত বড় একটা পুকুরের পাড়ে গিয়ে উঠলাম। ঘাটের কাছে একটুখানি পরিষ্কার জল। বাকিটা সব ঢলা ঢলা পদ্মপাতা আর পদ্মফুলে ভরা। ওদিকে পাড়ের ওপর সারি সারি তালের গাছ। পদ্মপাতার ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটা পানকৌড়ি সাঁতার কাটছে, আর কয়েকটা শুধু ডুবছে আর উঠছে। বেশ লাগছিল দেখতে। দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।

বাবার ডাক শুনে তাকিয়ে দেখি, তিনি তখন অনেক দূরে চলে গেছেন।

ছুটতে ছুটতে তাঁর কাছে গিয়ে দেখি সুমুখে ছোট্ট একটি নদী। নদী না বলে খাল বলাই ভাল। বালির ওপর দিয়ে কাঁচের মত স্বচ্ছ জলের ধারা ঝির ঝির করে বয়ে চলেছে। ওপারে কয়েকটা বড় বড় গাছ ছায়া ফেলেছে সেই জলের ওপর।

এপারে গাছ নেই, সারি সারি শুধু ফসলের ক্ষেত। আর সেই ক্ষেতের পাশ দিয়ে আমরা চলেছি আঁকা-বাঁকা পথ ধরে। কিছুদূর গিয়ে দেখি, খালের একটা দিকে প্রচুর জল জমা হয়ে আছে, আর কয়েকজন চাষী সেই জল তুলে নালা কেটে ক্ষেতে নিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের দেখেই একজন বললে, পেন্নাম গো মুখুজ্যেমশাই। কোথায় ধরলেন ওটা?

বাবা বললেন, লোকপুরে।

কে একজন বলে উঠল, এখানে ছেড়ে দেবেন না যেন।

—না। এটা ইয়াসিনকে দিতে যাচ্ছি।

সামনেই ইয়াসিনদের গ্রাম। পরিচ্ছন্ন একটি আম-বাগানের ভেতর খান-পঁচিশেক মাটির ঘর। খালের একেবারে ধার ঘেঁষে ইয়াসিনের বাড়ি।

উঠোনে একটি নিমগাছের তলায় ছোট ছোট মুরগীর বাচ্চাগুলিকে বাঁশের একটি চুপড়ি চাপা দিচ্ছিল ইয়াসিন। বাবাকে দেখেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললে, সেলাম গুরুজী।

হাঁড়িটা বাবার হাত থেকে নিয়ে বললে, খবর পেলে আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসতাম বাবু, আপনি কেন এত কষ্ট করলেন আমার জন্যে?

ঘরের কোণে একটা ন্যাড়া প্রাচীরের কোলে একটুখানি ছায়া পড়েছিল, সেইখানে গিয়ে হাঁড়িটা ইয়াসিন নামিয়ে রাখলে।

—সেলাম গো বাবুজী!

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, ভিজে কাপড়ে থমকে দাঁড়িয়েছে একটি মেয়ে। কাঁখে মাটির কলসীতে এক কলসী জল নিয়ে খাল থেকে সদ্য স্নান করে উঠে এসেছে বলেই মনে হলো। পিঠে একপিঠ ভিজে চুল, ফরসা গায়ের রং। আঁটসাঁট গড়ন।

এই কি ইয়াসিনের বৌ নাকি?

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, ওষুধটা খেয়েছিলে? কেমন আছ এখন?

টানা টানা চোখ দুটি তুলে মেয়েটি এক গাল হেসে বললে, খুব ভাল আছি। আপনার ওষুধ খেয়ে আমার সব ভাল হয়ে গেছে। কেন, মিঞা-সাহেব আপনাকে বলে নাই?

বাবা বললেন, না, বলেনি।

মেয়েটি বললে, কি গো তুমি যে সাপ নিয়ে একেবারে মশগুল হয়ে গেলে? মোড়া দুটো বের করে দাও। ওঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন যে!

—এই দ্যাখো, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।

বলেই ইয়াসিন ঘরের ভেতর থেকে বাঁশের দুটি মোড়া বের করে এনে নিমগাছের ছায়ায় পেতে দিয়ে বললে, বসুন।

ইয়াসিনের বিবিসাহেবা ঘরের দিকে যেতে যেতে ফিরে তাকালো একবার থমকে থামল। মনে হলো কি যেন জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও আর করলে না ডাকলে, মিঞাসায়েব, শোনো!

বলেই সে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বাবার সুমুখে মাটিতে উবু হয়ে বসলো ইয়াসিন। জিজ্ঞাসা করলে, সাপটাকে তো এখনও কামানো হয়নি?

বাবা বললেন, না। বিষদাঁত ভাঙবার সময় পাইনি। খুব ভাল জাতের কালীয় নাগ। অনেকদিন তুমি খেলা দেখাতে পারবে।

ইয়াসিন বললে, বিষদাঁত আমি এক্ষুনি ভেঙে দিচ্ছি। এলেন যখন এত কষ্ট করে আর-একটু বসুন গুরুজী।

বাবা বললেন, তোমার বিবি কি জন্যে ডাকছে তোমাকে। যাও শুনে এসো কি বলছে।

ইয়াসিন বললে, যাই। ভিজে কাপড়টা ছাড়ুক।

এই বলে সে উঠে গেল তার বিবিসাহেবার কাছে।

বিবিসাহেবা কি বললে শোনা গেল না, কিন্তু ইয়াসিন বললে, গাঁয়েরই কেউ হবে। ওঁর তো শিষ্য-সাক্‌রেদের অভাব নাই।

বলেই সে আমাদের কাছে এসে বললে, শুধোচ্ছে—আপনার সঙ্গের উটি কে?

এই বলে সে আমাকে দেখিয়ে দিলে।

বাবা বললেন, আমার ছেলে।

—আরে!

ইয়াসিন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো, আর তার বিবিসাহেবা ঘরের ভেতর থেকেই বলে উঠল, ওমা! তাই নাকি?

বিবিসাহেবা বেরিয়ে এলো।

—ছাখো দেখি, আজ আমার কত ভাগ্যি! এসো এসো তুমি এইখানে এসো।

বললাম, এই তো বেশ আছি। নিমগাছের তলায় সুন্দর হাওয়া বইছে।

হাওয়া ওখানেও বইবে তুমি এসো। বলে সে আমার কাছে এসে বললে, ওঠো।

উঠে দাঁড়ালাম। যে মোড়াটায় বসেছিলাম সেই মোড়াটা সে তুলে নিয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। বাধ্য হয়ে যেতে হলো তার সঙ্গে। বললে, ওরা এখন সাপটার বিষদাঁত ভাঙবে। ও-সব দেখো না। খুব খারাপ লাগবে।

বললাম, সাপটাকে দেখবো যে!

ঘরের সুমুখে পরিচ্ছন্ন ঢাকা-দেওয়া বারান্দার ওপর মোড়াটি পেতে দিয়ে বললে, বেশ তো, কামানো হয়ে যাক, ভাল করেই দেখবে। কথা কইবার লোক পাই না, বোসো না, দুটো কথা কই। আমি একটু চা তৈরি করি, মুরগীর ডিম খাও তো?

সর্বনাশ! এ বলে কি?

বললাম, না না—ও-সব কেন?

—আমার হাতে খাবে না বুঝি?

মেয়েটি তার সেই আয়ত দুটি কালো চোখ তুলে আমার মুখের দিকে তাকালে। টানা টানা দুটি ভুরুর মাঝখানে কাঁচপোকার একটি টিপ জ্বল্ জ্বল্ করছে।

আমি বোধকরি বাবার দিকে তাকিয়েছিলাম। মেয়েটি বুঝতে পারলে। বললে, ভয় নেই, বাবাটি তোমার মহাদেব, নীলকণ্ঠ। ওঁর জাত-বিচের নাই।

বলেই সে জোরে জোরে বোধকরি আমার বাবাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, ও মুখুজ্যেবাবু, শুনছেন? ছেলে যে চা খেতে চাচ্ছে না।

ওরা তখন সাপের হাঁড়িটা গাছের তলায় নিয়ে গেছে। ইয়াসিন একটা ন্যাকড়ায় জড়ানো কি-সব যন্ত্রপাতি যেন বের করছে।

বাবা বললেন, ইচ্ছে হয়তো খা। আর ইচ্ছে যদি না হয় তো খাস্‌নি।

চালার একদিকে দড়ির একটি শিকে ঝুলছিল। সেই শিকেয়-টাঙানো চুপড়ি থেকে কয়েকটি মুরগীর ডিম বের করলে বিবিসাহেবা। বললে, কি? ইচ্ছে হবে?

বললাম, হবে।

কয়লার উনোনটা গন্ গন্ করে জ্বলছিল।

সেই উনোনের কাছে এসে বসল সে। পরনে একরঙা একটি শাড়ি—কোমরে বেশ আঁট করে জড়ানো। পিঠের চুল মাটিতে লুটোচ্ছে। চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েই সে ডিমগুলি পরিষ্কার করে ধুতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলে, তুমি তো বাবুর প্রথম পক্ষের ছেলে? তোমার আর ভাই-বোন আছে?

বললাম, না। আমি একা।

—তোমার নাম কি?

বললাম, আমার দুটো নাম। এখানে সবাই আমাকে শ্যামল বলে ডাকে।

মেয়েটি ফিক্ করে একবার হাসলে। হাসলে আরও সুন্দর দেখায় তাকে। মুক্তোর মত দাঁতের সারি। তার ওপর গালে দুটি টোল পড়ে দেখলাম। ইয়াসিনের চেয়ে বয়স ওর অনেক কম।

জিজ্ঞাসা করলাম, হাসলে যে?

মেয়েটি মাথা নীচু করে বললে, আমারও দুটো নাম। একটা নাম শিবানী, একটা নাম নূরজাহান।

শিবানী? মুসলমান মেয়ের নাম তো শিবানী হয় না।

মেয়েটি মুখ তুললে। চাপা হাসি তার মুখে যেন লেগে রয়েছে। বললে, কে বললে আমি মুসলমান? আমি হিন্দুর মেয়ে।

মেয়েটিকে দেখেই আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল। বললাম, ইয়াসিন মিঞা তাহলে তোমাকে বিয়ে করেনি?

মেয়েটি ঘাড় কাত করে বললে, হ্যাঁ। বিয়ে করেছে। বিয়ে না করলে আমি আসি কখনও?

—হিন্দুর মেয়ে হয়ে মুসলমানকে বিয়ে করলে? কেন করলে?

মুখ নামিয়ে কাজ করতে করতে মেয়েটি আবার মুখ তুলে হাসলে। বললে, তুমি এখনও ছেলেমানুষ। কেন বিয়ে করে জানো না? থাক, তোমাকে সেসব আর শুনতে হবে না। তুমি তোমার কথা বল। আমি শুনি। সৎ-মা কেমন ভালবাসে?

আমি কিন্তু কিছুতেই তাকে ছাড়লাম না। বললাম, বল তুমি কেন বিয়ে করলে। তোমাকে বলতেই হবে।

—যদি না বলি ?

—আমি খাব না কিছু। চললাম। বলেই ওঠবার ভান করলাম একটুখানি।

শিবানী বললে, বোসো বোসো, রাগ করো না। বলছি।

বলেছিল সে তার জীবনের ইতিহাস। বলবার আগে সে কিন্তু আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল, তার আগে বল তুমি আমাকে ঘেন্না করবে না।

বলেছিলাম, না ঘৃণা করব না। তুমি বল।

—বল তুমি এখানে আসবে মাঝে-মাঝে।

বলেছিলাম, যদি এখানে থাকি তো আসব।

—ও মা, তুমি এখানে থাকো না বুঝি ?

—না। আমি থাকি আমার মামার-বাড়িতে।

তবু সে বলেছিল। বলেছিল, সে নাচতে জানে, গাইতে জানে। এই নাচ-গানের জন্যেই সে ঘর ছেড়েছিল। মুর্শিদাবাদের একটা গ্রামে তার বাড়ি। ছেলেবেলায় বাপ-মা মরে গিয়েছিল। বুড়ী এক পিসিমা তাকে মানুষ করেছে। তার রূপ ছিল, যৌবন ছিল, ছিল না শুধু তাকে ধরে রাখবার মানুষ। তাই সে কম বয়সেই পালিয়েছিল ঘর ছেড়ে। কত দেশ কত জায়গা সে ঘুরেছে, কোথাও বেশিদিন টিঁকতে পারেনি। শেষে অনেক ঘাটের জল খেয়ে পান্না দাসীর ঝুমুরের দলে চাকরি নিয়েছিল। সেরা গাইয়ে সেরা নাচিয়ে বলে তখন তার খুব নাম। পান্না দাসী নিজের মেয়ের মতন ভালবাসতো তাকে। বেশ শান্তিতে ছিল তার কাছে। কিন্তু শান্তিতে থাকতে ভগবান তাকে দিলে না। একদিন অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দিলে ওই মিন্‌সে ইয়াসিন। ইয়াসিনের তখন ছোকরা বয়েস। মাথায় বাবরি চুল, ইয়া চওড়া বুকের ছাতি, হাত দুটো লোহার মত শক্ত। ঝুমুরের দল এখান-ওখান ঘুরতে ঘুরতে বীরভূম জেলার ছোট একটি শহরের মতন জায়গায় বাসা বেঁধেছে। রাত্তিরে কাজ করে দুপুরে খেয়েদেয়ে ঘুমোচ্ছিল সে দলের আরও তিনটে মেয়ের সঙ্গে পাশাপাশি শুয়ে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল সাপ-খেলানো তুব্‌ড়ি বাঁশীর আওয়াজ শুনে।

সবাই ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। শিবানীও গেল তাদের পিছু পিছু। দেখলে সাপের দুটো ঝাঁপি সামনে নামিয়ে রেখে বাড়ির উঠোনে ছোট একটা পেয়ারা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইয়াসিন তুব্ড়ি বাঁশী বাজাচ্ছে। মেয়েদের দেখে বাঁশী থামিয়ে বললে, সাপের খেলা দেখাবো।

শিবানী এগিয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলে, কি নেবে?

বলে যেই সে তার চোখের দিকে তাকিয়েছে, মাথাটি তার ঘুরে গেল। ইয়াসিনও তাকিয়ে রইল তার দিকে। বললে, যা দেবে।

শিবানীর মনে হলো লোকটা যেন তার কতকালের চেনা।

সাপের খেলা দেখানো হলো।

কিন্তু কে দেখবে তখন সাপের খেলা? শিবানী তাকিয়ে আছে ইয়াসিনের দিকে। ইয়াসিনও ঘন ঘন তাকাচ্ছে শিবানীর দিকে।

সেই সুযোগে একটা সাপ পালিয়ে যাচ্ছিল ঝাঁপি থেকে বেরিয়ে।

মেয়েগুলো চেঁচিয়ে লাফিয়ে জাপ্টা-জাপ্টি করে একটা বিশ্রী কাণ্ড করে তুললে সাপের ভয়ে। ইয়াসিন সাপটাকে ধরে ফেললে। সাপটাকে হাতে নিয়েই সে এগিয়ে এলো শিবানীর কাছে। শিবানী তখন বাঁহাত দিয়ে চালার একটি খুঁটি জড়িয়ে ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। বললে, সাপটাকে রেখে এসো আগে।

ইয়াসিন হাসতে হাসতে সাপটাকে ঝাঁপিতে ঢোকালে। শিবানীর আঁচলের খুঁটে বাঁধা ছিল একটা রুপোর টাকা। সেইটে সে ছুঁড়ে ফেলে দিলে ইয়াসিনের গায়ে। বললে, আর এসো না।

বলেই সে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো গিয়ে তার বিছানায়।

সেদিন রাত্রে ঝুমুরের আসরে গান যখন খুব জমে উঠেছে, শিবানী হঠাৎ তাকিয়ে দেখে, আসরের একপাশে বসে আছে ইয়াসিন। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সে অসভ্যের মত। ইয়াসিনের গায়ে জামা, পরনে ফরসা ধুতি। তাকে আর তখন সাপুড়ে বলে চেনবার জো নেই।

প্যালা পড়ছে চারিদিক থেকে। ইয়াসিন তার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিলে একটা টাকা।

মনে হলো সে যেন তারই-দেওয়া সেই রুপোর টাকাটি ফেরত দিলে। তারপর ক্রমাগত সে ছুঁড়তে লাগল টাকা, আধুলি, সিকি, দুআনি। কত যে দিলে কে জানে। এত পয়সা সে পেলে কোথায় ?

তিন রাত্রি ঝুমুরের আসর বসল।

প্রতিটি রাত্রেই ইয়াসিনকে দেখা গেল ঠিক এক জায়গায় বসে। প্যালাও দিলে সেইরকম করে।

কিন্তু দিনের বেলা একদিনও সে সাপ খেলাতে এলো না।

তার পরের দিন বিশ্রাম। ক্লান্ত হয়ে সারাদিন পড়ে ঘুমোলো শিবানী। রাত্রে সেদিন কাজকর্ম কিছু নেই। পরের দিন সকালেই সেখানকার ডেরা তুলে অন্য জায়গায় চলে যেতে হবে। পান্না দাসী সন্ধ্যে থেকে তার মদের পাট নিয়ে বসল। কাজ যেদিন না থাকে, সেদিন সে প্রাণভরে মদ খায়, তারপর বেহুঁশ হয়ে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। মেয়েরা কেউ ও-সব খায় না। সকাল সকাল খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল সবাই। শিবানীর খাতির একটু বেশি। আলাদা ঘরে তার বিছানা। একজন দাসী আছে সেবা করবার জন্যে। কাজ যেদিন না থাকে, তার গা-হাত-পা টিপে দেয়। সেদিন কিন্তু দাসী আর এলো না। পান্না দাসীর কাছে সেও বোধ করি একটু প্রসাদ পেয়েছে।

খেয়েদেয়ে শিবানী যখন ঘরে খিল বন্ধ করে শুলো, রাত তখন মাত্র দশটা। রাত জাগা অভ্যেস, এত সকাল সকাল ঘুম আসবে কেন ? শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগল ইয়াসিনের কথা। লোকটা কি সত্যিই সাপুড়ে ? সাপুড়ে এত পয়সা পেলে কোথায় ?

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল কে জানে। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল একটা ঝাঁকানি খেয়ে। খোলা জানলার পথে জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছে বিছানায়। চোখ চেয়ে তাকিয়েই দেখে ইয়াসিন বসে আছে তার শিয়রের কাছে। ধড়মড় করে উঠে বসে চীৎকার করতে গেল শিবানী। ইয়াসিন বললে, চুপ।

—ঘরের খিল খুললে কেমন করে ? তুমি কি জন্যে এসেছ এখানে ?

ইয়াসিন বললে, খিল কেমন করে খুললাম সেসব জানবার তোমার দরকার নেই। আমি এসেছি তোমাকে নিতে। তুমি চল আমার সঙ্গে।

—তোমাকে জানি না চিনি না, তোমার সঙ্গে গিয়ে কি মরব?

—তাহলে কি তুমি চাও—আমি মরি?

—তুমি মরবে কেন?

ইয়াসিন বললে, তোমাকে ভালবেসে।

—তুমি আমাকে ভালবাসো?

—তোমার মনকে শুধোও।

শিবানী বললে, দূর! দূর! তুমি সাপুড়ে।

ইয়াসিন বললে, আমি সাপুড়ে নই। আমার জমি আছে, আমার বাড়ি আছে। তোমাকে এরকম করে ঘুরে বেড়াতে আমি দেবো না।

শিবানী বললে, আমি যদি না যাই?

ইয়াসিন বললে, আমি তোমাকে জোর করে নিয়ে যাব। আর বেশি কথা বলবার সময় নেই। তোমার কি আছে নেবে তো নাও সঙ্গে, আর না যদি নেবে তো এমনিই চল।

—কাউকে জানিয়ে যাব না?

—না। ইয়াসিন বললে, তুমি ছাড়া দল চলবে না। জানিয়ে গেলে ওই বুড়ী মাগী তোমাকে যেতে দেবে না। কান্নাকাটি করবে।

গয়নাগাঁটি শিবানীর গায়েই ছিল। বাক্স খুলে কয়েকখানা কাপড়-জামা আর টাকা-কড়ি নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল ইয়াসিনের সঙ্গে।

সেই যাওয়া তার শেষ যাওয়া।

ইয়াসিন শুধু সাপুড়ে ছিল না। সাপ খেলানো ছিল তার ছল। সাপের খেলা দেখাতে গিয়ে বড়মানুষের অন্দরমহলে ঢুকে আট-ঘাট সব জেনে আসত। তারপর সুবিধে বুঝে রাত্রে গিয়ে চুরি করত সেই বাড়িতে। চুরি-ডাকাতি রাহাজানিই ছিল তার পেশা। দু-দু'বার জেল খেটেছে ইয়াসিন।

জিজ্ঞাসা করলাম, এখনও কি সে চুরি ডাকাতি করে নাকি?

শিবানী বললে, না। আমাকে নিকে করে ঘর বাঁধবার পর ও-সব কাজ তার বন্ধ করে দিয়েছি। ওর ভাবনা কি? দশ বিঘে জমি আছে। নিজের হাতে চাষ করে। তারপর চাষের কাজ যখন থাকে না, তখন সাপের খেলা দেখায়।

কালীয় নাগের বিষ-দাঁত ভেঙে তখন তাকে ঝাঁপিতে পুরেছে ইয়াসিন।

সবাইকে চা আর ডিমসেদ্ধ খাইয়ে শিবানী বললে, দেখাও এবার তোমাদের সাপ।

সাপটা বোধ করি কাতর হয়ে পড়েছিল একটুখানি। ঝাঁপির ঢাকাটা খুলে ফেললে ইয়াসিন। সাপটা কুণ্ডলী পাকিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। কিছুতেই মুখ তুললে না।

বাবা বারকয়েক খোঁচা মারলেন হাত দিয়ে।

খোঁচা খেয়ে সে ফোঁস করে উঠে দাঁড়াল ফণা তুলে। বারকতক ছোবল মেরেই আবার সে ফণা গুটিয়ে ঢুকে পড়ল ঝাঁপির ভেতর।

বাবা বললেন, এখন ওর যন্ত্রণা হচ্ছে। চার পাঁচদিন ও ভাল করে মাথা তুলবে না।

শিবানী বললে, যদি এখানে থাকো তো আবার এসো।

বললাম, আসব।

বাইরে বেরিয়ে এসে বাবাকে বললাম, জঙ্গলের ওপারে যে ইস্কুলটা আছে, ওখানে আজ একবার যাবেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে?

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

—এইখানে পড়ব ভাবছি।

—রাণীগঞ্জে কি হলো?

জবাব দিতে পারলাম না। চুপ করে রইলাম।

বাবা বললেন, বুঝেছি। কিন্তু রোজ এতটা পথ জঙ্গল পার হয়ে যেতে-আসতে কষ্ট হবে না তোমার?

বললাম, না।

বারো

জঙ্গলটাকে এত ভাল করে দেখিনি কোনোদিন। যে পথ দিয়ে গ্রামে ঢুকেছিলাম, এ-পথ সে পথ নয়।

বাবার সঙ্গে যাচ্ছি নাকড়াকোন্দা স্কুলে। যদি দয়া করে হেড মাস্টারমশাই আমাকে ভর্তি করে নেন তাহলে এইখানেই পড়বো।

গ্রামের উত্তর দিকের সঙ্গে দক্ষিণ দিকের কোনও মিল নেই। এদিকের ঢেউ খেলানো মাটি শুধু উঠেছে আর নেমেছে; আবার উঠেছে, আবার নেমেছ। দক্ষিণের দিকচক্রবাল আড়াল করে শালের জঙ্গলটা সোজা চলে গেছে পশ্চিমদিকে। সাঁওতাল পরগণার ছোট বড় অনেকগুলো পাহাড়ের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। পাহাড়গুলো মনে হয় যেন আকাশের গায়ে আঁকা।

পথ চলতে চলতে ঘন-ঘন তাকাচ্ছিলাম সেইদিকে। বাবা বললেন, ওইদিকে বাবার মন্দিরে যেতে হয়।

বাবার মন্দির মানে বৈদ্যনাথ ধাম।

—হাঁটা পথে এখান থেকে ষোলো ক্রোশ।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি গেছেন কোনোদিন?

—না আমি যাইনি। আমার বাবা গিয়েছিলেন। তাঁরই মুখে শুনেছি। রাস্তা ভাল নয়। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হয়।

জিজ্ঞাসা করলাম, জঙ্গলে বাঘ আছে?

বাবা আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, এখানের জঙ্গলের নীচেটা পরিষ্কার। আগাছার ঝোঁপজঙ্গল নেই বললেই হয়। কাজেই এখানে বুনো জন্তু-জানোয়ার থাকতে পারে না। এক-আধটা বাঘ-ভাল্লুক যে আসে না তা নয়। বেশি আসে বুনো-শূয়োর। সাঁওতালেরা তাড়া করে। তাড়া খেয়ে পালিয়ে যায়।

এই বলে তিনি একটা ভারি মজার গল্প বলেছিলেন।

বলেছিলেন :

সেবছর তখন মহুয়া পাকবার সময়। গাছ থেকে পাকা মহুয়া টুপ্‌ টুপ্‌ করে মাটিতে পড়ে। সাঁওতালদের মেয়েরা কুড়িয়ে নিয়ে যায়। নিয়ে গিয়ে মদ তৈরি করে।

আমাদের গ্রামের একটা মুচিদের মেয়ে সুখী, একদিন গেল সেই মহুয়া কুড়োতে। সাঁওতালদের বস্তি যেখানে আছে, সেখানকার গাছের তলায় যাবার উপায় নেই। সাঁওতালদের চোখ এড়িয়ে সে লুকিয়ে চলে গেল বনের ভেতর। শাল মহুয়া আর হরীতকীর জঙ্গল। গাছের অভাব নেই। দূর থেকে পাকা মহুয়ার গন্ধই বুঝিয়ে দেয় কোথায় মহুয়ার গাছ।

মেয়েটা কিন্তু ভারি বিপদে পড়লো সেদিন। হামেশাই তারা এই জঙ্গলে যায়, কখনও শুকনো পাতা কুড়োতে, কখনও হরীতকী আনতে। বুনো কুল, পাকা বৈঁচি, পাকা পিয়াল, কুড়কুড়ি ছাতু, আর লাল চুকুই যখন পাওয়া যায় তখন দল বেঁধে আসে তারা। কিন্তু এমন বিপদে কেউ, কোনোদিন পড়ে না।

সাঁওতালদের কেউ পাছে দেখতে পায়, তাই পেছন ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল মেয়েটা। সবে তখন সকালবেলা, গাছের ফাঁকে ফাঁকে রোদ এসে পড়েছে গাছের তলায়; হঠাৎ কিসের যেন একটা শব্দ শুনে একবার চাইলে সেইদিকে, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলে না। মহুয়া গাছটা ছিল ঝোপ্‌-ঝোপ্‌ কয়েকটা শালগাছের আড়ালে। সেই জায়গাটা যেই সে পেরিয়েছে, আর অমনি এক বিকট চীৎকার করে দে ছুট্‌! পেছন ফিরে তখন আর তার তাকাবারও ভরসা নেই! মেয়েটা প্রাণপণে ছুটে একেবারে দম নিলে জঙ্গলের বাইরে এসে। ধারে-পাশে একটা লোক নেই যে তাকে বলবে। হাঁপাতে হাঁপাতে গ্রামে ফিরে এসে যাকে দেখে তাকেই বলে, একটা ভাল্লুক! হাত দশ-বারো দূরে সে প্রকাণ্ড একটা ভাল্লুককে দেখে এসেছে মহুয়া খেতে। আর-একটু হলেই আজ সে মরেছিল!

খবরটা সত্যিই অদ্ভুত!

বাবা বললেন, আমাদের এ-জঙ্গলে ছোট চিতাবাঘ দু'একটা এসেছে শুনেছি, বুনো-শূয়োর প্রায়ই আসে. কিন্তু হরিণ বা ভাল্লুক কখনও এসেছে শুনিনি। সুখীকে বললাম, চল্ সুখী, তোকে আর-একবার যেতে হবে।

সুখী কিছুতেই যেতে চাইলে না।

অনেক কষ্টে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সুখীকে রাজী করলাম। সুখী তার দাদাকে সঙ্গে নিলে। তার দাদা গোপাল মুচি। কালো কুচকুচে চেহারা। যেমন জোয়ান, তেমনি বলিষ্ঠ। পাকা একটি বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ালো। গ্রামে বন্দুক কারও নেই। খুব ধারালো একটি বল্লম আর একটি ছোরা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। কাউকে কিছু জানালাম না। জানালে যেতে দেবে না।

এদিকে তখন অনেকেই জেনে ফেলেছে। সুখীর কথাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে সারা গ্রামে। রাস্তার ধারে জটলা হচ্ছে। লোকজন বসে গেছে ভাল্লুকের গল্প করতে।

তাদের পাশ কাটিয়ে, ধরমতলার ধারে ধারে উঠলাম এসে বাঁধের পাড়ে। আমার সঙ্গে সুখী আর তার দাদা গোপাল। পেছনে ডাক শুনে তাকিয়ে দেখি তোমার ভালকাকা হরিদাস আসছে ছুটতে ছুটতে। তার হাতে একটা টাঙ্গি। বললাম, তুই আবার এলি কি জন্যে? হরিদাস সেকথার জবাব দিলে না। বললে, চল।

প্রথমে এলাম সাঁওতালদের এই বস্তিটাতে। জোয়ান-জোয়ান মানুষগুলো তখন কাজে চলে গেছে। পেলাম মাত্র পনেরো-ষোলো বছরের কয়েকজন ছোকরাকে, আর পেলাম জন দশ-বারো জোয়ান মেয়েকে। ধন্যি সাহস ওদের! সবাই বেরিয়ে এলো যে যা পেলে তাই হাতে নিয়ে।

হরিদাস বললে, থানায় খবর দিলে হতো না? দু'একটা বন্দুক পাওয়া যেতো।

—খবর দিলেও আসবে না ওরা। আয়।

গরু বাঁধবার লম্বা একটা দড়ির মুখে ফাঁস্ তৈরি করে

সাঁওতালদের একটা ছেলের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম, এইটে তুই নিয়ে আয় আমার সঙ্গে। চাইলে দিবি।

সাঁওতালদের মেয়েগুলো আসছে দেখে সুখীর সাহস বেড়ে গেল। সে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

কোনও শব্দ না করে পা টিপে টিপে যাচ্ছিলাম আমরা। চামড়ার খাপের ভেতর ছোরাটা দড়ি দিয়ে কোমরে বেঁধে নিয়েছি, বর্শাটা শক্ত করে ধরেছি হাত দিয়ে। গোপাল একটা ধারালো দা চেয়ে নিয়েছে সাঁওতাল-বস্তি থেকে। হরিদাসের হাতে টাঙ্গি। সাঁওতালদের একজন ছোকরার হাতে তীর-ধনুক, একজনের হাতে দড়ির ফাঁস, আর একজনের হাতে বাজাবার জন্যে ভাঙা একটা টিনের ক্যানেস্তারা।

কাউকে কোনও আওয়াজ করতে বারণ করে দিয়ে গাছের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ সুখী আঙুল বাড়িয়ে বলে উঠলো, ওই তো!

বলেই সে আমাদের পেছনে পালিয়ে গেল ভয়ে।

দিনের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলাম, প্রকাণ্ড একটা ভাল্লুক মহুয়া গাছের তলায় মুখ থুবড়ে শুয়ে শুয়ে থর থর করে কাঁপছে।

সবাই আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছি তখন। ভাবছি কি করে কি করা যায়। মুখটা এমনভাবে মাটিতে থুবড়ে আছে যে, ফাঁস্-দড়িটা ছোঁড়বারও উপায় নেই। পিছলে পড়ে যাবে। ফাঁস্ ছোঁড়া অভ্যেসটা আমার অনেকদিনের। অনেক বাঁদর ধরেছি আমি ওই ফাঁস্ ছুঁড়ে।

টুপ্ টুপ্ করে পাকা মহুয়া খসে খসে পড়ছে গাছ থেকে। কয়েকটা পড়লো ভাল্লুকটার গায়ের ওপর। সেদিকে ওর ভ্রুক্ষেপ নেই। তেমনি মুখ থুবড়ে পড়েই রইলো। ফাঁস লাগানো মুস্কিল। ছুটে গিয়ে বর্শাটা যদি তার বুকের ওপর বসিয়ে দিই, আর সবাই মিলে একসঙ্গে গিয়ে যদি তাকে আক্রমণ করি, তাহলে কেমন হয়? কিন্তু ভয় ওর ওই বড় বড় নখগুলোকে। ভাল্লুক কেমন করে 'চার্জ' করে জানি না। শুনেছি মানুষের মত

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছুটে এসে জাপটে ধরে। তাহলে ওকে উঠতে দেওয়াই ভালো। বুকটা সামনে পাওয়া যাবে।

এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই, সাঁওতাল-ছোঁড়াটা মুখে একরকম শব্দ করে—দিলে একটা তীর ছুঁড়ে! তীরটা ভাল্লুকটার গায়ে লাগলো না, একেবারে তার গা ঘেঁষে মাটিতে বিঁধে গেল। আবার আর-একটা তীর সে ছুঁড়তে যাচ্ছিল, হাতের ইশারায় বারণ করলাম। ভাল্লুকটা মাথা তুলেছে। শুয়ে শুয়েই মুখটা ওপরের দিকে তুলে হাঁ করে হাঁপাতে লাগলো। মনে হলো যেন হাঁ করে আছে—দু'চারটে মহুয়া তার মুখের ভেতরে পড়ুক এই আশায়।

আমিও ঠিক এই সময়টায় কাজ সেরে নিলাম। সাঁওতাল-ছেলেটার হাত থেকে দড়ির ফাঁসটা নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিলাম ছুঁড়ে। টুক্ করে দড়ির ফাঁসটা গিয়ে ভাল্লুকটার গলায় আটকে গেল। কিন্তু আল্‌গা ফাঁস, মাথাটা নামালেই গলে পড়ে যাবে। ভয়ে ভয়ে একটু টেনে ধরলাম। দড়ির ফাঁসটা তার গলায় ঠিক বসে গেল।

গলায় টান পড়তেই ভাল্লুকটা উঠলো। গলায় কেমন যেন ঘড় ঘড় শব্দ করতে লাগলো।

মনে হলো এবার সে আক্রমণ করবে।

আমিও চট্ করে আমার হাতের দড়িটা সাঁওতাল ছেলেদের হাতে দিয়ে বললাম, ছাড়বি না কিছুতেই। পেছন দিকে টেনে ওকে চিৎ করে ফেল্‌বি। আমি ওর বুকে বর্শাটা বসিয়ে দেবো।

হরিদাস বললে, ঠিক আছে। আমি ওকে বলিদান করে দিচ্ছি ভাখো।

গোপাল মুখে কিছুই বললে না। চট্ করে মাটিতে শুধু তার হাত দুটো ঘষে নিলে।

সাঁওতালদের সব ছেলেগুলোই ধরলে দড়িটা।

কিন্তু সর্বনাশ, দড়িতে যেই টান পড়েছে,—ভাল্লুকটা উঠে দাঁড়ালো। ঠিক মানুষ যেমন করে দাঁড়ায় তেমনি করে। মেয়েগুলো চেঁচিয়ে উঠলো। ছেলেগুলো প্রাণের ভয়ে দড়িটা

দিলে ছেড়ে। আমাদের আর অপেক্ষা করবার সময় নেই। এই উপযুক্ত সুযোগ।

একেবারে মুখোমুখি। আমি আমার বর্শাটা তখন দু'হাত দিয়ে তুলে ধরেছি। হঠাৎ আমাদের পেছনে একটা মাদল বেজে উঠলো। সাঁওতালদের একটা ছেলে খবর পেয়ে মাদল বাজাতে বাজাতে ছুটে আসছে। আমাদের কিন্তু পেছনে তাকাবার অবসর নেই, চেঁচিয়ে যে তাকে বারণ করবো তারও উপায় নেই। মাত্র এক সেকেণ্ড! আর এক সেকেণ্ড যদি দেরি হতো তাহলে কী যে কাণ্ড ঘটে যেতো কে-জানে। আমিই হয়ত সবার আগে বর্শাটা বসিয়ে দিতাম ভাল্লুকটার বুকে। কিন্তু ভাল্লুকটি নিজেই তার ব্যবস্থা করে নিলে। মাদলের আওয়াজ শুনেই সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাচতে আরম্ভ করে দিলে।

নাচে আর ঝুম ঝুম্ করে আওয়াজ হতে থাকে। দেখলাম, তার পেছনের দুটো পায়ে ঘুঙুর বাঁধা রয়েছে। কালো কালো বড় বড় লোমে ঢাকা ছিল বলে এতক্ষণ আমরা দেখতে পাইনি। বাঁদর ভাল্লুক নিয়ে যারা নাচ দেখিয়ে রোজগার করে, তাদেরই কারও পোষা ভাল্লুক হয়ত কোনোরকমে পালিয়ে এসেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কি হলো?

বাবা বললেন, কি আর হবে। দড়ি ধরে গাঁয়ে নিয়ে গেলাম, ভাত খাওয়ালাম, ডুগডুগি বাজিয়ে নাচালাম, ইচ্ছে ছিল রেখে দেবো বাড়িতে, কিন্তু বাবা কিছুতেই রাখতে দিলেন না। বললেন, বনের পশু, ওদের অত বেশি বিশ্বাস কোরো না।

—তারপর?

—সন্ধ্যেবেলা নিয়ে গেলাম সাঁওতাল পাড়ায়। কাজ থেকে সবাই তখন ফিরেছে দেখলাম। তারা রাখলে। বড় একটা শালের গাছে বেঁধে দিয়ে গেলাম। রোজ বিকেলে একবার করে দেখতে আসতাম। প্রথম প্রথম কুকুরগুলো খুব বিরক্ত করতো ওকে। তারপর দিন-চার পাঁচ পরে একদিন গিয়ে দেখি,—সাঁওতাল-পাড়া খুব সরগরম। যে-যেখানে ছিল সাঁওতালেরা সব জড়ো হয়েছে একজায়গায়। গাছের তলায়

বিরাট মজলিশ। মদ খাচ্ছে, মাদল বাজাচ্ছে আর হাসির হুল্লোড় চলছে। দেখলাম, ভাল্লুকটা একপাশে শুয়ে শুয়ে কাঁপছে। গলার দড়িটা পর্যন্ত খুলে দেওয়া হয়েছে। কি ব্যাপার? ব্যাটা যাচ্ছে না কিছুতেই। শুনলাম, মাড়-ভাত ছাড়া সে নাকি কিছু খায় না। একদিন খানিকটা মাংস দেওয়া হয়েছিল, শুঁকে সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আধসের চালের মাড়-ভাতে ওর পেট ভরে না। আবার খেতে চায়। রোজ রোজ কে আর ওকে খেতে দেবে? দিন-দুই আগে এক-পেট ভাত খাইয়ে অনেক দূরে গভীর জঙ্গলের ভেতর ভাল্লুকটাকে ওরা ছেড়ে দিয়ে এসেছিল। আজ নাকি আবার সে ফিরে এসেছে। দুপুরে সবাই যখন কাজে বেরিয়ে গেছে, সর্দার মাঝি বললে, সেই সময় ডুলন্ মাঝির ঘরে চুপিচুপি এসে ঢুকেছে ভাল্লুকটা। মহুয়া সেদ্ধ ছিল একবাটি—সেটা খেয়েছে। মাটির একটা হাঁড়িতে ছিল আধহাঁড়ি মহুয়ার মদ, ছুঁচলো মুখটা হাঁড়ির ভেতর ঢুকিয়ে সেটাও সাবাড় করেছে। তারপর মদ খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে ব্যাটা আজ সারাদিন কি করছে ছাখ্! এই বলে একটা ছেলেকে ইশারা করতেই ছেলেটা একটা লাঠি দিয়ে ভাল্লুকটাকে খোঁচা মারলে। গাঁক্ গাঁক্ করে ভাল্লুকটা উঠে বসলো। তারপর যেই মাদল বাজালো, টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে রুম্‌ঝুম্ করে তার সে কী নাচ! নেশায় টলে টলে পড়ছে বারবার, তবু তার নাচ থামে না। শেষে বসে বসেই নাচতে লাগলো ঘুরে ঘুরে।

দিনকতক পরে গিয়ে শুনলাম, ভাল্লুকের মালিক অনেক খোঁজ করে সাঁওতাল-পাড়ায় এসে একদিন তাকে নিয়ে গেছে সাঁওতালদের পাঁচটি টাকা দিয়ে।

ভাল্লুক শিকারের গল্প শুনতে শুনতে জঙ্গল পেরিয়ে আমরা নাকড়াকোন্দা ইস্কুলের কাছে এসে পড়লাম। ইস্কুলের তখন ছুটি হয়ে গেছে। গ্রাম থেকে একটুখানি দূরে ফাঁকা একটি কাঁকর পাথরের ডাঙ্গার ওপর ছোট্ট ইস্কুল। শুনেছি ইস্কুলের অবস্থা তেমন ভাল নয়। না হলেও পরিবেশটি বড় মনোরম।

পড়ন্ত সূর্যের আলো এসে পড়েছিল খড়ে-ছাওয়া সারি সারি কয়েকটি ঘরের ওপর। বাবা বললেন, এইটি বোর্ডিং-হাউস।

ছেলেদের সাড়াশব্দ পেলাম না। ধুপ্-ধাপ্ আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখি—সুমুখের মাঠে তারা ফুটবল খেলছে।

আপিস-ঘরের সামনে ছোট একটি শুকনো বাগান। আর সেই বাগানের একটেরে একগাদা কাগজপত্র নিয়ে যিনি বসেছিলেন, বাবা বললেন, উনিই হেডমাস্টার।

বললাম, আপনি চেনেন ওঁকে?

—খুব চিনি।

কিন্তু তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বলে উঠলেন, কে? কি চাই?

বাবা বললেন, নমস্কার। চিনতে পারছেন না আমাকে?

—আজ্ঞে না। বলেই তিনি চোখ নামিয়ে আবার তাঁর কাজে মন দিলেন। তাঁর হাতে একটা লাল-নীল পেন্সিল। ছেলেদের খাতা দেখছিলেন বোধ হয়।

বাবা তাঁর নিজের পরিচয় নিজেই দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তা আর দিতে হলো না। আপিস-ঘর থেকে মোটামত এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বাবাকে দেখেই বলে উঠলেন, মুখুজ্যেমশাই, কি মনে করে? বসুন, বসুন। ওরে বংশী, খানকতক চেয়ার বের করে দে বাবা।

বংশী চেয়ার বের করতে লাগলো একটি একটি করে।

হেডমাস্টার মশাই আবার মুখ তুলে তাকালেন। বাবার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, বসুন।

অর্থাৎ হরেনবাবুর যখন পরিচিত ব্যক্তি, তখন বসতে না বলাটা অভদ্রতা।

বাবা কিন্তু বসলেন না। হরেনবাবুকে বললেন, হেডমাস্টার মশাই আমাকে কিন্তু চিনতে পারেন নি।

তাই নাকি? বলে বাবাকে জোর করে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে তিনি নিজেও বসলেন। তারপর মাস্টার-মশাইকে বললেন, বলি হ্যাঁ মশাই, থানায় সেদিন ওঁর দুটো হাতে হাত-কড়া পরিয়ে

দিয়ে হাজতে ঢুকিয়ে রাখলেন। উনি হাত কড়া খুলে হাজত থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে হাতকড়াটি আপনার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে নমস্কার করলেন। সে-সব কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলেন ?

হেডমাস্টারমশাই তখন হাতের খাতা পেন্সিল ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসেছেন।—আরে আরে আপনিই মিস্টার মুখার্জি—that great magician! আপনার সে পাগড়ী নেই, সে পোষাক নেই, চিনতে পারিনি, কিছু মনে করবেন না। ওরে ও বংশী, চট্ করে মুখুজ্যেমশাইকে চা খাইয়ে দে !

বলেই তিনি তাঁর পকেট থেকে সিগারেট বের করে একটি বাবার হাতে দিলেন, একটি নিজে নিলেন। তারপর দিয়াশলাই জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিতে দিতে বললেন, দেখুন আমি কিরকম একটা অপদার্থ মানুষ। তাছাড়া চোখ দুটো আমার একেবারে গেছে। আপনাকে চিনতে পারলাম না !

বাবা বললেন, আমিও কম অপদার্থ নই। এই দেখুন, সিগ্রেট আমি খেতে পারি না, কাপড়-চোপড় পুড়িয়ে ফেলি।

বলতে বলতে সত্যি-সত্যিই বাবার হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা পড়ে গেল। পড়ে গেল একেবারে হেডমাস্টারমশাই-এর কাপড়ের কোঁচায়। সঙ্গে সঙ্গে বাবা ঝুঁকে পড়ে কোঁচার কাপড়টা বাঁহাত দিয়ে তুলে ধরলেন। ডান হাতে নিলেন জ্বলন্ত সিগারেটটা। হেডমাস্টার হাঁ হাঁ করে' হাত বাড়ালেন কাপড়ের আগুনটা নিবিয়ে ফেলবার জন্যে। বাবা দিলেন না নেবাতে। বললেন, দাঁড়ান, সব ঠিক করে দিচ্ছি।

এই বলে ডান-হাতে-ধরা সিগ্রেটের আগুনটা আরও ভাল করে কাপড়ের ওপর দিয়ে কাপড়টা পোড়াতে আরম্ভ করলেন।

দিশী ধুতিটা চোখের সামনে পুড়ছে। হেডমাস্টারের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুচ্ছে না।

হরেনবাবু বললেন, ঠিক আর কোথায় করছেন ? কাপড়টা ভাল করে পোড়াচ্ছেন তো !

বাবা বললেন, এব্ড়ো-খেব্ড়ে হয়ে পুড়ে একটা বিশ্রী রকমের

ফুটো হয়ে থাকবে, তাই এই জায়গাটা ভাল করে পুড়িয়ে বেশ গোলমত করে দিচ্ছি।—এই নিন্, বেশ ভাল গোল হয়েছে। ধরুন এবার।

এই বলে আগুনটা হাত দিয়ে টিপে নিবিয়ে, মাস্টারের কাপড় মাস্টারের হাতেই মুঠো করে ধরিয়ে দিলেন বাবা। বললেন, বেশ করে চেপে ধরে থাকুন।—এইবার আমি কয়েকটা কথা বলবো আপনাকে। শুনুন।

হেডমাস্টারমশাই বললেন, বলুন।

বাবা বলতে লাগলেন, কাপড়টা পুড়ে যাওয়ায় আপনার মনে খুব দুঃখু হয়েছে আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু যা হয়েছে, তা হয়েছে আমার দোষে। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। যে মুহূর্তে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, দেখবেন সেই মুহূর্তে আপনার মনে আর দুঃখের লেশমাত্র থাকবে না।

হেডমাস্টার বললেন, ক্ষমা করলাম।

বাবা বললেন, আপনি ভাবছেন আমি বুঝি ম্যাজিক দেখাচ্ছি, তাই সঙ্গে সঙ্গে বলে বসলেন, ক্ষমা করলাম। ক্ষমা করা অত সহজ নয়। আপনি চোখ বুজে সত্যি সত্যি নিজেকে সেই অবস্থায় নিয়ে যান। ক্ষমাসুন্দর মুখ আমি দেখলেই বুঝতে পারবো।

সত্যিই চোখ বুজলেন তিনি। হাসতে হাসতে বললেন, ক্ষমা করেছি।

বাবা বললেন, এবার তাহলে দেখুন আপনার কাপড় কতখানি পুড়েছে।

দেখা গেল কাপড়ে বিন্দুমাত্র পোড়ার দাগ পর্যন্ত নেই। কাপড়টা পুড়েছিল বলে মনে হলো না।

হরেনবাবু বলে উঠলেন, আরও কিছু দেখান।

হেডমাস্টারমশাইও বলে বসলেন, দেখান, দেখান। ভারি সুন্দর ম্যাজিক আপনার। আপনি এই সব দেখিয়ে অনেক টাকা পয়সা রোজগার করতে পারতেন। কেন করেন না কে জানে!

বাবা বললেন, করি তো!

—কোথায় করেন? শুনেছি তো আপনি কোথাও একটি পয়সাও নেন না।

বাবা বললেন, এই যে আপনাদের মনে আনন্দ দিতে পারছি—এই তো আমার রোজগার! শুনুন তবে। একবার বেড়াতে বেড়াতে একটা কারখানায় গিয়ে পড়েছিলাম। গিয়ে দেখি দু'জন লোক খুব ঝগড়া আরম্ভ করেছে। ভাষা নিয়ে ঝগড়া। একজন হিন্দুস্থানী, একজন বাঙালী। আগে থেকে শুনিনি, গিয়ে যখন পড়লাম, তখন দেখি, বাঙালী ছোকরাটি একদম কোন্‌-ঠাসা হয়ে পড়েছে। হিন্দুস্থানী ছোকরাটি বলছে, "থামো থামো, তোমরা আর হিন্দী ভাষার নিন্দে করো না। তোমরা জল পান কর না, জল খাও। ধূম পান কর না। বিড়ি খাও, সিগ্রেট খাও।" বাঙালীর নিন্দে সহ্য করতে পারলাম না। বললাম, দাও একটা সিগ্রেট, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে হিন্দুস্থানী ছোকরাটির কাছ থেকে একটি সিগ্রেট চেয়ে নিলাম।

কাপড়-পোড়ার ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে বাবার হাতে যে সিগারেটটা ছিল সেটা তখন নিবে গিয়েছিল। নেবানো সিগ্রেটটা তুলে নিয়ে বাবা দেশলাই চেয়ে নিয়ে ধরালেন। ধরিয়ে সেটা টানতে টানতে বললেন, আমরা যে সত্যিই সিগ্রেট খাই সেটা দেখিয়ে তাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিলাম। কেমন করে সিগ্রেট খেলাম সেইটে দেখাচ্ছি। আমি আর কথা বলবো না। আপনারা শুধু দেখে যান।

এই বলে বাবা উঠে দাঁড়ালেন। পোড়া সিগারেটটা টানতে টানতে হঠাৎ একসময় সেই আগুনসুদ্ধ জ্বলন্ত সিগ্রেট জিব দিয়ে মুখের ভেতর ঢুকিয়ে কোঁৎ করে গিলে ফেললেন। তারপর জামার পকেটে খালি হাতটা ঢুকিয়ে বের করে আনলেন ঠিক তেমনি একটি জ্বলন্ত সিগ্রেট। সেটাও বারকতক টেনে গিলে ফেললেন। এবার হাত ঢোকালেন হেডমাস্টার মশাই-এর পকেটে। সেখান থেকেও বেরিয়ে এলো একটা জ্বলন্ত সিগারেট। এমনি করে ক্রমাগত সিগ্রেট টানেন, গিলে ফেলেন, আবার জ্বলন্ত সিগারেট বের করেন যেখান-সেখান থেকে।

হেডমাস্টার, হরেনবাবু—ত্ব'জনেই অবাক!

আমিও কম অবাক হচ্ছি না। কিন্তু যে-জন্যে এলাম এখানে, সেকথা এখনও বলা হলো না, বাবা ম্যাজিক দেখাতে আরম্ভ করলেন। এদিকে সন্ধ্যে হয়ে আসছে, জঙ্গল পেরিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে।

তবে ভরসা এই যে, বাবা আছেন সঙ্গে।

বংশী চা নিয়ে এলো। সিগ্রেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাবা এসে বসলেন চেয়ারে।

চা খেতে খেতে বললেন, এবার আসল কথাটা বলি। কেন আমি এখানে এসেছি, শুনুন।

হেডমাস্টার শুনলেন সব কথা। শুনে বললেন, বিপদে ফেললেন।

তারপর কি যেন ভাবলেন। ভেবে বললেন, মাইনেও দিতে পারবেন না?

বাবা বললেন, আজ্ঞে না।

হেডমাস্টার হরেনবাবুর দিকে তাকালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কি করি বলুন দেখি?

হরেনবাবু বললেন, ছেলে যদি ভাল হয় তো নিয়ে নিন। পাশ করতে পারলে পারসেণ্টেজ বাড়বে।

হেডমাস্টারমশাই আমার দিকে তাকালেন।

—কি গো, ভাল করে পাশ করতে পারবে তো? পরীক্ষার আর খুব বেশি দিন নেই।

বললাম, চেষ্টা করবো।

—চেষ্টা করব নয়। হেডমাস্টারমশাই বাবার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, আমি একটু পরীক্ষা করে দেখবো আপনার ছেলেকে। যদি বুঝি ছেলে আপনার ভাল করে পাশ করতে পারবে, আমি ভর্তি করে নেবো।

পরীক্ষার নাম শুনে আমার তখন মনে হচ্ছে—যদিই-বা কিছু আশা-ভরসা ছিল তাও গেল। প্রায় ত্ব'মাস হতে চললো ইস্কুলের বই-এর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।

হেডমাস্টারমশাই আমাকে কাছে ডেকে বসালেন। এক গাদা খাতা তাঁর হাতের কাছেই নামানো ছিল। তাই থেকে কয়েকটা সাদা পাতা ছিঁড়ে আমার হাতে দিলেন। বললেন, এই পেন্সিল দিয়ে লেখো আমি যা বলছি।

মুখে মুখে তিনি বলে গেলেন, আমি লিখলাম।

লেখা শেষ হলে বললেন, ইংরেজিতে তর্জমা কর।

ভয়ে ভয়ে অনুবাদ করে কাগজগুলি তাঁর হাতে তুলে দিতেই তিনি আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, হাতের লেখাটি তো বেশ! হলো কেমন করে?

বললাম, লিখে লিখে।

তারপরেই আমার অনুবাদটি দেখলেন তিনি। বেশ ভাল করেই দেখলেন। দেখেই কাগজদুটি হরেনবাবুর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, দেখুন তো হরেনবাবু!

হরেনবাবু আমার অনুবাদটি দেখে আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, মন্দ হয়নি।

বলেই তিনি হেডমাস্টারকে বললেন, মুখুজ্যেমশাই বলছেন যখন, তখন নিন্ ভর্তি করে। সেদিন বলছিলাম না আপনাকে, শহরের ছেলেরা ইংরেজিটা ভাল শেখে। তাছাড়া ইস্কুলটা ভাল।

হেডমাস্টারমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বাড়ি থেকে রোজ আসা-যাওয়া করবে?

বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—একে যদি আমি প্রথম থেকে পেতাম! হেডমাস্টারমশাই যেন আপনমনেই বললেন, বোর্ডিংয়ে রাখতে পারলে ভাল হতো।

জিজ্ঞাসা করলাম, বোর্ডিং-এ কত দিতে হয়?

হরেনবাবু বললেন, দিতে তো হয় বারো টাকা, কিন্তু তোমার বাবা তো বলছেন মাইনে পর্যন্ত দিতে পারবেন না!

বললাম, চেষ্টা করবো।

হেডমাস্টারমশাই বলে দিলেন, কাল থেকেই তুমি আসতে আরম্ভ কর। ভাল করে পাশ করতে হবে।

হ্যাঁ। বলে মাথা নেড়ে দিয়ে চলে তো এলাম সেখান থেকে, কিন্তু বইগুলো সব পড়ে আছে রাণীগঞ্জে।

বই আনতে হবে রাণীগঞ্জ থেকে, ট্র্যান্সফার সার্টিফিকেট আনতে হবে, আর আনতে হবে, কিছু টাকা।

নজরুলের চিঠি আসবে অণ্ডালের ঠিকানায়। সেখানেও একটিবার যেতে হবে।

বাবাকে বললাম, আমি একবার রাণীগঞ্জ থেকে ফিরে আসি।

বাবা বোধহয় রাগ করলেন। বললেন, বাস্, হয়ে গেল? ইস্কুলটা পছন্দ হলো না বুঝি?

বললাম, ট্র্যান্সফার সার্টিফিকেট আনতে হবে তো!

বই-এর কথাটা বলতেই পারলাম না। যুদ্ধে চলে যাচ্ছি, কাজেই বই-এর সঙ্গে সম্পর্ক একরকম চুকিয়েই দিয়েছিলাম। কে জানতো যে, আবার এসে আমাকে ইস্কুলে ভর্তি হতে হবে!

বাবা বললেন, চিঠি লিখে দাও, দাদামশাই লোক দিয়ে সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দেবেন।

রাণীগঞ্জে যাওয়া হলো না। চিঠি লিখলাম রাণীগঞ্জে।

পরের দিন ইস্কুলে যাবার জন্যে সকাল-সকাল খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। সঙ্গে নিলাম সাদা একটি খাতা আর একটি পেন্সিল। বই নেই তো কি করব?

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ। একাই চলেছি ভাবতে ভাবতে। কিন্তু শুধু একখানা খাতা আর পেন্সিল হাতে নিয়ে ইস্কুলে যাওয়া কি উচিত? খুব চমৎকার দক্ষিণের হাওয়া বইছে শালের জঙ্গলে। একটা গাছের তলায় সবুজ কচি ঘাস গজিয়েছিল। বসলাম সেইখানে। বসে বসে নজরুলকে একখানি চিঠি লিখলাম।

চিঠিখানি যখন শেষ হলো, ইস্কুলে তখন ছুটির ঘণ্টা পড়ছে।

হঠাৎ সেদিন আবিষ্কার করে ফেললাম—ইস্কুল যাওয়ার চেয়ে মহুয়া গাছের তলায় বসে বসে নজরুলকে চিঠি লেখা ঢের বেশি আরামের।

পরের দিন পোস্টাপিসে গিয়ে চিঠিখানা ডাকে দিয়ে একবার

ভাবলাম যাই ইস্কুলে। কিন্তু শুধু একখানা সাদা খাতা আর একটা পেন্সিল হাতে নিয়ে ইস্কুলে যেতে কেমন যেন মন সরলো না। ভাবলাম, বইগুলো আসুক রাণীগঞ্জ থেকে, তারপর ভাল করেই যাব। চিঠি লিখেছি রাণীগঞ্জে—বই-এর সঙ্গে কিছু টাকা যদি আসে তো বোর্ডিং-এ গিয়ে থাকবো।

আমাদের বাড়িটার কথা আগেই বলেছি। বহু পরিবারের বিরাট এক একান্নবর্তী সংসার। বাপ্-জ্যেঠা-কাকারা সবাই আপন-আপন শিল্পকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। সবাই দেখি আনন্দে মশগুল।

প্রথম প্রথম এসে এই বিচিত্র সংসারটির লীলাবৈচিত্র্য আমার খুব ভাল লেগেছিল। এরা সকলেই আমার আপনজন, এদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক। মনে-মনে গর্ব অনুভব করেছিলাম। ভেবেছিলাম—এদের এই আনন্দ বুঝি নিরবছিন্ন। কিন্তু মানুষের সঙ্গে জীবন-বিধাতার রসিকতার বুঝি অন্ত নেই। একটানা আনন্দের একঘেয়েমি থেকে ধীরে-ধীরে তাদের তিনি মুক্তি দিতে লাগলেন।

বড় আগুন দপ্‌ করে জ্বেলে ওঠে। এক মুহূর্তেই পুড়িয়ে সব ছারখার করে দিয়ে চলে যায়। কিন্তু ছোট আগুন জ্বলে ধিকি ধিকি করে।

বিধাতা বোধকরি বড় আগুন জ্বালাতে সাহস পেলেন না। কারণ বিধাতার রসিকতার জবাব দিতে তারা জানে। এরা আনন্দে মশগুল, আবার দুঃখেও নির্বিকার। তাই চুপিচুপি টিকের আগুন ধরিয়ে দিলেন। নিববে না সহজে, অথচ সাদা ছাই-এর তলায় তলায় আগুন ঠিক এগিয়ে যাবে।

বুড়ো কর্তাগিন্নি বেঁচে রয়েছেন। ছেলেদের বিয়ে-থা হয়ে গেছে। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা সংসার। খাওয়াটাই শুধু এজ্‌মালি। সংসারে অভাব-অনটন একেবারে নেই বললে ভুল বলা হবে। কিন্তু ছেলেরা প্রত্যেকেই কি যেন এক অদ্ভুত ধাতুতে গড়া। কোনও অভাবকেই কোনোদিন আমল দিতে চায় না।

অথচ বৌয়েরা এসেছে বাইরে থেকে। তারাই দেয় সব

গোলমাল করে। বলে, এত কিসের যে আনন্দ তোমাদের কে জানে! আসলে তোমরা হচ্ছ গিয়ে কুঁড়ের বাদশা।

কিন্তু তাই-বা বলি কেমন করে? বাঙ্গালীর সংসার। রোজ মাছ না হলে চলে না। নিজেদের ছোট-বড় কয়েকটা পুকুর আছে। পুকুরে মাছ আছে। কিন্তু গ্রামে মাছ ধরবার জালও নেই, জেলেও নেই। ভাইদের ভেতর এক ভাই সে-অভাব মিটিয়ে দিয়েছে। নিজের হাতে জাল বুনেছে, ছোট বড় নানারকমের ছিপ তৈরি করেছে। কখন যে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়, কখন যে সে মাছ এনে রান্নাঘরে ফেলে দেয়—কেউ কিছু বুঝতে পারে না।

ক্ষেতে কাজ করতে হবে, বাড়ীর মুনিষ-জন অন্য কাজে লেগেছে, বাড়তি লোক পাওয়া যাচ্ছে না। যে-ভাই বেহালা বাজায়, আর যে-ভাই বাটালি নিয়ে কাঠের কাজ করে, বেহালা আর বাটালি ফেলে দিয়ে কোদাল হাতে নিয়ে কোমর বেঁধে তারা ছুটেছে মাঠের দিকে।

মাঠে ধান পেকেছে। জঙ্গলের ধারে বিঘে-পাঁচেক জমির ধান তাড়াতাড়ি কেটে না আনলে সে-ধান আর ঘরে ঢুকবে না। সে-বছর বুনো-শূয়োরের উপদ্রব একটু বেড়েছে। রাত্রির অন্ধকারে দলে দলে বুনো-শূয়োর এসে মাঠের ধান দিচ্ছে নষ্ট করে।

আমার বাবাকে আমি নিজে দেখেছি—কাস্তে নিয়ে মাঠে চলে গেছেন। আরও দু' ভাই গেছে তাঁকে সাহায্য করতে। দিনের পর দিন বাবা নিজের হাতে ধান কেটেছেন, এক ভাই আঁটি বেঁধেছে, আর-এক ভাই গরুর গাড়ী বোঝাই করে পাকা ধান খামারে এনে তুলেছে।

যাক্‌গে সে-কথা। এখন নিজের কথা বলি।

ইস্কুলের বোর্ডিং-হাউসে থাকতে পারলেই বেশ ভাল হয়। তার জন্ম টাকার দরকার। বইগুলো পড়ে আছে, রাণীগঞ্জে। নজরুলের চিঠি আসবে অণ্ডালের ঠিকানায়।

দাদামশাইকে চিঠি লিখেছিলাম। তখনও তার কোনও জবাব এলো না। নিজেই চলে গেলাম অণ্ডালে।

যাবামাত্র দিদিমার কাছ থেকে পেলাম নীলরঙের চমৎকার একখানি খামের চিঠি। নজরুল লিখেছে। নৌশেরা থেকে তারা এসেছে করাচিতে। চমৎকার জায়গা। খুব দুঃখু করে জানিয়েছে—তুমি যদি সঙ্গে থাকতে! বড় বড় চার পাতা জোড়া বিরাট চিঠি।

অবনীকে বললাম, চিঠিখানা আমাকে পাঠিয়ে দিসনি কেন?

অবনী বললে, আমার বয়ে গেছে! তুই বাপের বাড়ীতে গিয়ে বসে থাকবি, আর আমি তোর চিঠি পাঠিয়ে দেব সেইখানে!

বুঝলাম, রাগ করেছে। বললাম, আমার বইগুলো রাণীগঞ্জ থেকে এনে দিবি? আমি নাকড়াকোন্দা ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছি। বই নেই, পড়াশোনা একদম হচ্ছে না, ভারি বিপদে পড়েছি ভাই।

অবনী আমার সম্পর্কে মামা। কিন্তু 'মামা' বলে জীবনে কোনোদিনই ডাকিনি তাকে। মাস পাঁচ-ছয় আগে-পিছে জন্মেছি একই বাড়ীতে, মানুষ হয়েছি এক সঙ্গে, একরকমের জামাজুতো পরেছি, একসঙ্গে খেয়েছি, শুয়েছি, একই ইস্কুলে একই ক্লাসে পড়েছি; ঝগড়া করেছি মারামারি করেছি—আবার কেউ কাউকে না দেখে থাকতে পারিনি।

অনেক করে বললাম অবনীকে —'দে না ভাই বইগুলো এনে।'

অবনী বললে, সে যেতেও পারবে না, বইও আনতে পারবে না।

আমাকেও নিষেধ করলে। বললে, তুইও যাসনি। রায় সাহেব খুব রেগেছে আমাদের ওপর।

জিজ্ঞাসা করলাম, তোর ওপর রাগবে কেন?

অবনী বললে, আমিও তো রাণীগঞ্জ থেকে পালিয়ে এসেছি। আর যাইনি।

বললাম, এখানে বসে বসে ইস্কুল কামাই করছিস? পাশ করতে পারবি না যে!

অবনী বললে, ভেবেছি আর পড়বো না।

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এও মনে হলো যেন আমারই অপরাধ।

লেখাপড়ায় অবনী বিশেষ ভাল কোনোদিনই ছিল না। ইস্কুল

না যেতে পারলেই যেন বাঁচতো। তবু আমি থাকলে হয়ত-বা সে এমন করে' পড়া ছেড়ে দিতে চাইতো না।

রায় সাহেব খুব রাগ করেছেন সেকথা দেখলাম সবাই জানে। রাণীগঞ্জ যেতে ভরসা হলো না।

দিদিমা বললে, নাকড়াকোন্দা ইস্কুলে ভর্তিই যদি হয়েছিস তো এখানে বসে রয়েছিস কেন?

বললাম, কিছু টাকা পেলে ভাল হতো। বোর্ডিং-এ থাকতাম।

দিদিমা বললে, আমার কাছে এই তিরিশটে টাকা আছে। নিয়ে যা।

তিরিশটি টাকা নিয়ে চলে আসছিলাম. অবনী বললে, পড়ে কি হবে রে?

কি হবে তা কি ছাই আমিই জানি!

অবনী বললে, আমার এই খান-চারেক্ বই আছে, দরকার হয় তো নিয়ে যা। আমার দরকার হলে তোর বইগুলো নেবো।

অবনীকে ছেড়ে আসতে কষ্ট হচ্ছিল, তবু চলে এলাম।

তের

কোন্‌দিক দিয়ে কি যে হলো কিছুই বুঝতে পারলাম না। সারা পৃথিবীটা কেমন যেন বিস্বাদ হয়ে গেল।

নজরুলের চিঠিখানা কতবার যে পড়লাম তার ইয়ত্তা নেই। সেও লিখেছে তার ভাল লাগছে না।

বোর্ডিং-হাউসে থাকবার জন্য টাকা নিয়ে এলাম, কিন্তু বোর্ডিং-এ না গিয়ে আবার সেই ইস্কুলে যাবার পথে শালের জঙ্গলে গিয়ে থমকে থামলাম। মহুয়া গাছের তলায় গিয়ে বসলাম চিঠি লিখতে। চিঠি লিখলাম নজরুলকে। চিঠি লিখলাম অবনীকে। চিঠি লিখলাম যতীনকে। অনেকদিন পরে দিদিকে মনে পড়লো। মনে হলো যেন দিদির কাছে গিয়ে দু'দিন থেকে আসি। অশান্ত মন যেন একটুখানি আশ্রয় খুঁজছে।

সাপুড়ে ইয়াসিনের বৌ শিবানীও তো যেতে বলেছিল!

রবিবার ইস্কুলের ছুটি। ভাবলাম শিবানীর কাছেই যাব। কিন্তু কোঁথাও গেলাম না।

গেলাম যেখানে--সেখানে যেন না গেলেই ভাল হতো।

আমার বিমাতার বাপের বাড়ি থেকে একখানা চিঠি এসেছিল—তার খুড়তুতো ভাই-এর পৈতে হবে, যেতে লিখেছে।

মা'র যাবার খুব ইচ্ছে, কিন্তু বাবা বললেন, তিনি নিয়ে যেতে পারবেন না। এখানে তাঁর অনেক কাজ।

মা তখন আমার শরণাপন্ন হলো। বললে, যাবি আমাকে নিয়ে? বোলপুরে আমাকে পৌঁছে দিয়ে রবি ঠাকুরের শান্তিনিকেতন দেখে ফিরে আসবি।

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন!

বললাম, যাব।

মা'র বাপের বাড়ি যেতে হলে বোলপুর হয়ে যেতে হয়। বোলপুরে তাদের মস্ত বড় চালের গদি-বাড়ি। সেখান থেকে অনেক

দূরের এক গ্রাম—বীরভূমের একেবারে শেষ প্রান্তে, দিগন্তবিস্তৃত সবুজ ধানের মাঠের মাঝখান দিয়ে অফুরন্ত সেই পথ! গরুর গাড়ি চড়ে একবার গিয়েছিলাম। তখন আমি অনেক ছোট। এখনও মনে আছে। তখন বর্ষাকাল। একসঙ্গে দশ পনেরো জোড়া গরুর গাড়ি চলেছে সারি দিয়ে। গরুর গলার ঘণ্টা বাজছে। কখন বেরিয়েছি মনে নেই, কখন পৌঁছোবো জানি না। সে এক ভারি মজার অভিজ্ঞতা।

আমার সেই কিশোর কালের বিচিত্র অভিজ্ঞতা—সেই রহস্যময় স্বপ্নময় বৈচিত্র্যের আস্বাদ আর-একবার পাবার জন্য মন আমার সত্যিই ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

মাকে নিয়ে গেলাম বোলপুর। সঙ্গী জুটলো দুর্গামামা। আমারই সঙ্গে সেবছর সেও দেবে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা। শান্তিনিকেতন দেখে চলে গেলাম সেই গ্রামে।

গ্রাম থেকে ফিরে এলাম পুরো একটি মাস পরে। নিয়ে এলাম প্রচুর আনন্দ আর তার সঙ্গে উপরি পাওনার মত—ম্যালেরিয়া।

ম্যালেরিয়ার নামই শুনেছিলাম। সে যে কেমন বস্তু, কতখানি তার পরাক্রম, কিছুই আমার জানা ছিল না। এব্যর জানলাম বেশ ভাল করে। পুরো একটি বৎসর সে আমার সঙ্গী হয়ে রইলো। মাসের মধ্যে অন্ততঃ দশটা দিন বিছানায় পড়ে থাকতে হয়।

ম্যালেরিয়া নিয়েই টেস্ট পরীক্ষা দিলাম। সিউড়িতে গিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে এলাম।

পরীক্ষা দিয়ে পালিয়ে গেলাম অণ্ডালে।

ভেবেছিলাম ম্যালেরিয়া বোধহয় এবার আমাকে পরিত্যাগ করবে। কিন্তু পরিত্যাগ করা দূরে থাক, এবার সে আমাকে এমন জোরে চেপে ধরলো যে, জীবনের আশাই আমাকে পরিত্যাগ করতে হলো।

সেইরকম অবস্থাতেই খবর পেলাম আমি পাশ করেছি।

পাশ করতে পারব সে আশা আমি করিনি। বোধকরি সেই আনন্দেই জ্বর ছেড়ে গেল। ভাবলাম, ভাল হয়ে গেছি। নজরুলকে

খবরটা দিয়েই ছুটলাম কলকাতায়। কলেজে ভর্তি হলাম। বই কিনলাম।

তখনও একটি মাস বোধহয় পার হয়নি। শরৎচন্দ্রের একখানি বই আর এককপি ভারতবর্ষ (মাসিক পত্রিকা) কিনে এনেছিলাম। আরাম করে পড়ব বলে যেই বসেছি, সর্বাঙ্গ শির্ শির্ করে উঠলো। শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলাম। বুঝতে দেরি হলো না— শরীরের প্রতিটি শিরায় শিরায় কার আগমনবার্তা ঘোষিত হলো।

সারাটা রাত কেমন করে কোন্‌দিক দিয়ে কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। সকালের দিকে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল। শরীর অত্যন্ত দুর্বল। কঙ্কালসার চেহারা।

মামা এসেছিলেন কলকাতায়। বললেন, পড়তে হবে না তোকে। বাড়ি যা।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবার ফিরে গেলাম অণ্ডালে।

দেখলাম, নজরুলের চিঠি এসেছে। আমার পাশের খবর পেয়ে আনন্দিত হয়ে লিখেছে, "তোমাকেও একটা আনন্দের খবর দিই। এখান থেকে কলকাতার কয়েকটা কাগজে গল্প পাঠিয়েছিলাম। একটাও ফিরে আসেনি। সব ছাপা হয়ে গেছে। 49th Regiment-এর একজন বাঙালী সৈনিক করাচি ক্যান্টন্‌মেণ্ট থেকে লেখা পাঠাচ্ছে দেখে বোধহয় ভয়েই ছেপে ফেলেছে। এন্তার লিখছি এখানে বসে বসে।"

কিছুদিন পরে 'মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' নামে একখানি ত্রৈমাসিক সাহিত্য-পত্রিকা নজরুল আমাকে পাঠিয়ে দিলে। দেখলাম, নজরুলের একটি গল্প ছাপা হয়েছে। চিঠিতে লিখেছে, 'আমি 'লান্স নায়েক' হয়েছি।'

আরও কিছুদিন পরে জানালে, 'এখন আমি হাবিলদার।'

আমি লিখলাম, 'বহুৎ বহুৎ সালাম হাবিলদার-সাহেব! এবার চুটিয়ে একটা কবিতা লিখে কাগজে পাঠিয়ে দাও। গল্প আর লিখো না।'

জবাবে নজরুল জানালে, 'কবিতাও লিখেছি দু'একটা। কিন্তু পাঠাতে ভরসা হয় না। আমার কবিতা বোধহয় ছাপবে না।'

আমার নিজের তখন ইচ্ছে করছে—গল্প লিখি।

কিন্তু লিখবে কে? ঠিক নিয়ম করে একদিন পরে পরে জ্বর আসছে। পেট-জোড়া পিলে, মাথার চুলগুলো সব উঠে গেছে।

কলকাতা যাবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করছি। কিন্তু কেউ আমাকে যেতে দিচ্ছে না। জ্বর ঠিক নিয়মিত আসছে বটে, কিন্তু জ্বরের জোরটা তখন কমে এসেছে।

মামা বলছে, জ্বরের জোর কমেনি, তোমার জীবনীশক্তি কমেছে।

রায়-সাহেবের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ রাখছি না ভয়ে। তিনিও বোধকরি কোনও খোঁজ-খবর নিচ্ছেন না বিতৃষ্ণায়।

নজরুল লিখলে, এবার দিনকতকের ছুটি পেতে পারি। কিন্তু যাব কোথায়? তুমি যদি কলকাতায় থাকতে তোমার কাছে গিয়েই উঠতাম। আমাদের গ্রামে গিয়ে দু'একদিনের বেশি থাকতে পারব না। অণ্ডালে যদি থাকো তো অণ্ডালেই যাব। ঠেঙিয়ে তোমার ম্যালেরিয়ার ভূতকে আমি ভাগিয়ে দিয়ে আসব।

এই চিঠি পাবার পর ডাক্তার দেখাবার ছুতো করে চলে গেলাম উখরায়। মামা থাকতেন সেখানে। জোর করে তাঁকে ধরে বসলাম—আমি কলকাতায় যাব।

মামা বললেন, মিছেমিছি যাবে। এবছর কলেজে তোমার পার্সেন্টেজ্ থাকবে না। তার ওপর তোমার এই শরীর।—বাড়াবাড়ি হলে দেখবে কে?

বললাম, কালীমামাকে লিখে দাও। (প্রখ্যাত কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত—মামার অকৃত্রিম সুহৃদ। তখন মেডিকেল কলেজের কৃতী ছাত্র)।

মামা বললেন, কলকাতা বুঝি তোর খুব ভাল লেগেছে?

মুখ ফুটে সেকথা বলবার প্রয়োজন হলো না। বলবার যা প্রয়োজন হলো—তা অন্য কথা।

রায়-সাহেবের সংসারে তখন একটা অপ্রীতিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। স্বার্থান্ধ মানুষের চিরন্তন সমস্যা। সে সব কথা এখানে অবান্তর।

বললাম, চুপচাপ বসে না থেকে এই সময়টায় একটা কিছু শিখে নিতে চাই।

—কি শিখবি?

শেখবার ইচ্ছে তো অনেক-কিছু। চেয়েছিলাম ডাক্তারী শিখতে। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়। বললাম, তাড়াতাড়ি শিখতে হলে একমাত্র শর্টহ্যাণ্ড-টাইপরাইটিং শিখে ফেলতে পারি।

উখরা-এস্টেটের ম্যানেজার ৺কুঞ্জবিহারী দত্ত মশাই-এর ছোট ভাই বিনোদ তখন কলকাতায় টেলারিং শিখছে। বাগবাজারে কাশিমবাজারের মহারাজার বিরাট পলিটেক্‌নিক্‌ ইন্‌স্‌টিটিউট্‌। বৃদ্ধ পিটাভেল সায়েব তার প্রিন্সিপ্যাল। শর্টহ্যাণ্ড-টাইপ্‌রাইটিং শেখবার ব্যবস্থা আছে সেখানে।

মামা নিজে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সেইখানে ভর্তি করে দিলেন। বিরাট তিনতলা বাড়ি। প্রিন্সিপ্যাল সায়েব থাকেন তিনতলায়। দোতলায় ছেলেদের বোর্ডিং। নীচের তলায় ক্লাস বসে।

ব্যবস্থা মন্দ হলো না। একবাড়িতেই সব-কিছু। বিনোদ থাকে পাশের সিটে। মামা বলে দিয়ে গেলেন, একে একটু দেখো। ওর শরীর ভাল নয়।

আমাকে বললেন, কালীকিঙ্করকে বলে দিয়ে গেলাম। নিয়মিত টনিক খাবে। টাকার দরকার হলে চিঠি লিখবে।

বিনোদ হলো আমার গার্জেন। টেলারিং শিখতে তখন তার ভাল লাগছে না। সব কাজ গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ফুটইঞ্চি মাপবার ফিতেটা কাঁধে ফেলে, মস্ত বড় একটা কাঁচি দিয়ে পুরনো খবরের কাগজ কাটতে কাটতে হাত বেঁকে গেলেই কাঁচিটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বলে, কাগজ কেটে টেলারিং শেখা যায় না, কাপড় কাটতে হয়।

কিছু একটা না বললে চলে না। বলি, কাপড় কাটার খরচ আছে।

বিনোদ বলে, ধেৎ তেরি খরচ! এক ভাই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, এক ভাই সার্কেল অফিসার, আর আমি হব কিনা দর্জি! তার চেয়ে গরম চা খাওয়া যাক একপেয়ালা।

চাকরকে দু'পেয়ালা চা আনতে দিলাম।

বিনোদ বললে, খালি পেটে চা খাবে না। বিস্কুট আনতে দাও।

বললাম, খরচ বেশি হয়ে যাবে যে!

বিনোদ বললে, হয় হবে। দেখা যাবে মাসের শেষে।

একজন দাদার ভাই, একজন মামার ভাগ্নে।

বিনোদ আমাকে নানারকম উপদেশ দেয়। বলে, কী ছাইভস্ম লিখছ দিনরাত! অত লিখো না। চোখ খারাপ হয়ে যাবে। তবে কলকাতা শহর, ভাববার কিছু নেই। আমার চেনা একজন চোখের ডাক্তার আছে। চোখ দেখিয়ে দেবো, পয়সা লাগবে না।

তবু আমার লেখা বন্ধ হলো না দেখে আবার বললে, চোখ যদি ভাল রাখতে চাও তো লেখাপড়া বন্ধ রেখে চোখ বুজে শুয়ে থাকো। ঘুমোতে যদি পার তো শরীরও ভাল থাকবে।

বিনোদের ঘুম দেখে ঘুমোতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পারি না ঘুমোতে।

তবে একটা বড় বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। এত ঘুমিয়েও বিনোদ তার চোখদুটিকে রক্ষা করতে পারলে না। তারই চোখ আগে খারাপ হলো। ডাক্তার দেখিয়ে চশমা নিলে।

বাগবাজার স্ট্রীটের ওপর তখন রেলের লাইন পাতা। মালগাড়ি চলে তার ওপর দিয়ে। বিনোদ আমাকে সাবধান করে দিলে। বললে, দু'দিকে তাকিয়ে রাস্তা চলবে। ট্রেনের তলায় ছাগল কাটা পড়ছে হরদম।

লাইন ধরে পশ্চিমদিকে গেলেই গঙ্গা। রোজ সকালে উঠে গঙ্গায় স্নান করতে আরম্ভ করলাম। বিনোদ একেবারে হৈ হৈ করে উঠলো।

—সর্বনাশ করলে তুমি। ম্যালেরিয়ার রুগী, ঠাণ্ডা লাগলেই নিমোনিয়া। দাঁড়াও, তোমার মামাকে একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি।

চিঠি অবশ্য সে লেখেনি। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, গঙ্গাস্নান করেই কিনা জানি না, আমার ম্যালেরিয়া সেরে গেল। পালা জর

বন্ধ হলো। শরীরের ওজন বাড়লো। মাসখানেকের ভেতরেই যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলাম।

সবই তো হলো। কিন্তু যার জন্যে কলকাতায় এলাম, সে কোথায় ?

নজরুল জানে আমি কলকাতায় এসেছি। বাগবাজারের ঠিকানায় চিঠির জবাবও পেয়েছি। তারপর প্রায় মাসখানেক তার কোনও চিঠিপত্র না পেয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় দেখি, একটা রিক্‌সায় চড়ে নজরুল এসে হাজির! চমৎকার চেহারা হয়েছে নজরুলের। মাথায় চুল রেখেছে, বুকের ছাতি হয়েছে চওড়া, পায়ে বুট জুতো, খাঁকি প্যাণ্ট, খাঁকি সার্ট, —মানিয়েছে সুন্দর। পাশ বালিশের মত একটা ব্যাগ কাঁধে নিয়ে দোতলায় উঠে এলো।

সাতদিনের মাত্র ছুটি। তিনদিন থাকবে কলকাতায়। তারপর যাবে চুরুলিয়া। ওই পথেই চলে যাবে করাচি। এখানে আর ফিরে আসবে না।

কতদিন পরে দেখা। কথা আর আমাদের শেষ হতেই চায় না!

কত কথা শুনলাম। কত কথা বললাম। একসঙ্গে গঙ্গায় স্নান করলাম। পাশের বাড়ি থেকে একটা হারমোনিয়াম চেয়ে এনে তার গান শুনলাম। ট্রামে চড়ে সারা কলকাতা চষে বেড়ালাম। তখনকার দিনের চার আনার টিকিটে বায়োস্কোপ দেখলাম। টিকিটের দাম বেশি বলে থিয়েটারটা আর দেখা হলো না। গেলাম ৩২, কলেজ স্ট্রীটের দোতলায়, মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার আপিসে। এই পত্রিকাটি নজরুল আমাকে আগেই পাঠিয়েছিল আর লিখেছিল—জনাব মুজাফ্‌ফর আহ্‌মদের কথা। তিনিই নাকি সবার আগে তার লেখা সাগ্রহে ছেপেছেন। চিঠি-পত্রে তাঁর সঙ্গে নজরুলের পরিচয়ও হয়েছে ঘনিষ্ঠ। ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করবার আগ্রহ আমারও বড় কম ছিল না।

গিয়ে দেখলাম—অপূর্ব সুন্দর একটি মানুষ। গৌরবর্ণ

শীর্ণকায় সংযতবাক যে যুবকটিকে সেদিন আমি দেখেছিলাম, আজও তিনি আমার স্মৃতিপটে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। সেদিন তাঁরও বিশেষ কিছুই আমি জানতাম না। আমিও ছিলাম এক পরিচয়হীন আগন্তুক মাত্র। নজরুল ইসলামের একজন সহপাঠী বন্ধু। কথা যা হয়েছিল নজরুলের সঙ্গেই হয়েছিল। আমি ছিলাম তার নীরব শ্রোতা।

নজরুলের প্রতি তাঁর সেই সহৃদয় ব্যবহার, তাঁর সেই উদার দাক্ষিণ্য, তাঁর মুখের শুধু তুটি-চারটি কথা, প্রসন্ন প্রফুল্ল মুখচ্ছবি আর একটি অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব আমাকে সত্যই সেদিন মুগ্ধ করেছিল।

নজরুল চলে যাবার পর, একটি দিনেব এই একটি বিশেষ মুহূর্তের কথা আমি অনেকবার ভেবেছি। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছি এই ব্যক্তিটিকে। তখন কতই-বা আমার বয়স। আর ক'টি মানুষকেই-বা এমন করে দেখেছি।

নজরুলকে যে ভালবাসে, সে আমারও প্রিয়—এই কথা ভেবেই জীবনের পাতাটা সেদিন উল্টে রেখেছিলাম। কিন্তু পরবর্তী জীবনে সে-পাতা আমাকে আবার খুলতে হয়েছে। লাল কালির দাগ দিয়ে এই বিশেষ দিনটিকে সবিশেষ করে রেখেছি। আজ আমার জীবন-সায়াহ্নে এসে দেখছি—সে-দাগ এখনও তেমনি অম্লান হয়ে রয়েছে।

তিনটি মাত্র দিন দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল।

হাওড়া স্টেশনে তুলে দিয়ে এলাম নজরুলকে। আবার কতদিন পরে দেখা হবে কে জানে।

সেখানে গিয়ে চিঠি দেবে বলেছিল—দিলে না। পুরো একটি মাস পরে বেগুনীরঙের কালিতে লেখা একখানি চিঠি পেলাম। নজরুল লিখেছে, তাদের উনপঞ্চাশ বায়ুগ্রস্ত বাঙালী পল্টন ভেঙে দেবার কথা চলছে। ভেঙেই যদি দেয় তো—'বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা?' আমার সেই পাশ বালিশটা ঘাড়ে তুলে নিয়ে সোজা উঠব গিয়ে তোমার আস্তানায়। তারপর যা থাকে কপালে!

নজরুল আসবে জেনে আনন্দও যেমন হলো, তার ভবিষ্যৎ কল্পনা করে রাত্রে ভাল ঘুমও হলো না। সত্যিই তো! কি করবে সে? কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে? হঠাৎ আমার চোখের সুমুখে ভেসে উঠলো—বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের দোতলার সেই ঘরখানি। মুজাফ্ফর আহ্‌মদ-সাহেব বলেছিলেন, চলে তো আসুন এইখানে। তারপর দেখা যাবে।

ছোটখাটো মানুষটি, কিন্তু তাঁর হৃদয় যে এত বড়, তখন সেকথা ভাবতে পারিনি। তাই তাঁর কথাটাকে তেমন আমল দিইনি। নজরুলের জন্য ভেবেই মরেছিলাম শুধু।

আমাদের পলিটেকনিকের কমার্স ডিপার্টমেন্ট আর বোর্ডিং হাউস সে-বাড়ি থেকে উঠে এলো রামকান্ত বোস স্ট্রীটে। (সেই পুরনো বাড়িটা ভেঙে এখন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ হয়েছে)

নজরুলকে নতুন বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে চিঠি লিখলাম। ভুপেন্দ্র বোস এ্যাভিনিউ তখন হয়নি। ট্রাম থেকে নেমে কোনদিক দিয়ে কেমন করে আসতে হবে তাও জানিয়ে দিলাম।

শেষ পর্য্যন্ত এলো নজরুল। পল্টন ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আর সে ফিরে যাবে না। চেহারা তার আরও ভাল হয়েছে। হো হো করে হাসির জোর যেন আরও বেড়েছে।

আমাদের হোস্টেলে 'অতিথি' হয়ে থাকার কোনও আপত্তি ছিল না। গেস্ট চার্জ মাসের শেষে দিতে হয়। তার ওপর একখানা ফাঁকা সিটও পাওয়া গেছে আমাদের সিটের পাশেই। আনন্দের হাট বসে গেল আমাদের 'রুমে'। নজরুলের সেই মন-মাতানো অফুরন্ত হাসি আর গান, যৌবনোচ্ছল প্রাণের প্রাচুর্য একে একে টেনে আনলে সবাইকে। প্রথমে এলো আমার সেখানকার সহপাঠী বন্ধুরা, তারপর এলেন বয়স্ক শিক্ষকেরা।

তিন চারটে দিন আমরা হোস্টেল ছেড়ে কোথাও গেলাম না। যাবার সময়ই বা কোথায়? গঙ্গায় স্নান আমার তখন বন্ধ হয়ে গেছে। ম্যালেরিয়ার কথা ভুলেই গেছি।

একদিন রাত্রে পাশাপাশি সিটে আমরা শুয়ে পড়েছি। ঘরের

আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। গল্প করছি শুয়ে শুয়ে। নজরুল চুপি চুপি বললে, একটা চাকরি বোধহয় পাওয়া যাবে।

কথাটা প্রথমে বুঝতে পারিনি। জিজ্ঞাসা করলাম, কিসের চাকরি ?

নজরুল বললে, পল্টনে যারা একটু নাম-টাম করেছে, গভর্নমেণ্ট তাদের কিছু কাজকর্ম দেবে।

বললাম, তোমাকে কি কাজ দেবে ? তুমি তো ম্যাট্রিকুলেশনও পাশ করলে না!

—নাই-বা করলাম! কত কাজ আছে।

—তুমি নেবে সেই কাজ ?

—না নিলে খাব কি ?

বলেছিলাম, ভিক্ষে করে খাবে।

নজরুল হো হো করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, ঠিক বলেছ। একটা হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে রাস্তায় রাস্তায় যদি গান গেয়ে বেড়াই তো মন্দ রোজগার হবে না।

—সঙ্গে যদি একটা সুন্দরী মেয়ে থাকে তো রোজগার আরও বেশি হবে।

—সেটা আর পাচ্ছি কোথায় ?

—তোমার হাসির চোটে পাশের বাড়ির জানলাটানলাগুলো যেরকম খুলে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন জুটতে দেরি হবে না।

বয়সের ধর্মে কথার ধারাটা সেদিন অন্যদিকে গড়িয়ে গিয়েছিল।

তার পরের দিনই বোধহয় নজরুল আমাকে হঠাৎ বলে বসলো, তুমি মরতে এ-সব শিখতে এলে কেন ? চাকরি করবে নাকি ?

চিঠিতে তাকে কিছু-কিছু জানিয়েছিলাম, তবু আবার জিজ্ঞাসা করলে কেন, বুঝতে পারলাম না। বললাম, জানো তো সবই।

নজরুল বললে, এই জন্যেই বড়লোকগুলোকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

বললাম, এরা বড় মানুষ নয়, বড় অ-মানুষ।

নজরুল হো হো করে হেসে উঠলো। বললে, মদের মাতাল যেমন, তেমনি এরা টাকার মাতাল।

সেইদিনই একটা কাণ্ড ঘটলো। নীচে ছিল খাবার ঘর। আমরা নীচে না গিয়ে খাবারটা ওপরের ঘরে আনিয়ে নিতাম। খাওয়াদাওয়ার পর বসে বসে গল্প করছি, হোস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, কিছু মনে কোরো না।

বললাম, বলুন।

তিনি বললেন, তোমার এই বন্ধুটি কতদিন থাকবেন এখানে?

—কেন বলুন তো?

কথাটা বলতে বোধকরি তিনি সঙ্কোচ বোধ করছিলেন। বললেন, এখানেও তো তোমাকে গেস্ট্ চার্জ দিতে হবে, তার চেয়ে ওঁকে যদি বাইরের কোনও হোটেলে খাইয়ে আনো তাহলে বোধহয় তোমার খরচ কম পড়বে, ওঁর খাওয়াটাও ভাল হবে।

বলবার উদ্দেশ্য কিছুটা বুঝতে পারলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, মুসলমান বলে কি কোনও কথা উঠেছে?

তিনি বললেন, না তেমন কিছু নয়। চাকরটা শুনেছে উনি মুসলমান। তাই ওঁর এঁটো বাসন ধুতে চাচ্ছে না।

আমি ধুয়ে দিচ্ছি। বলে চলে এলাম ওঁর ঘর থেকে।

আমাদের ঘরে এসে দেখলাম, আমাদের দু'জনের এঁটো বাসন তখনও তোলা হয়নি। বিনোদ চলে গেছে ক্লাস করতে। নজরুল একা একটা সিটের ওপর পাশ ফিরে শুয়ে আছে। বোধকরি ঘুমিয়ে পড়েছে। কোনও শব্দ না করে চুপিচুপি জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেললাম।

দুপুরে ঘণ্টা-দুই-এর জন্যে আমাদের একটা ক্লাস বসতো। জামাটা গায়ে দিয়ে খাতা-পেন্সিল নিয়ে নীচে নেমে যাবার আগে বললাম, ঘুমোলে নাকি? আমি ক্লাসে যাচ্ছি।

চোখ বুজে তেমনি শুয়ে শুয়েই নজরুল বললে, যাও।

ক্লাসে সেদিন কোনও কাজই করতে পারলাম না। ঠিক করলাম নজরুলকে নিয়ে আমিও আজ চলে যাব এখান থেকে।

কুড়ি নম্বর বাদুড়বাগান রো'তে (আজকাল ১, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট) রায়-সাহেব বাড়ি কিনেছেন একখানা। বাড়িটা খালিই পড়ে আছে। নীচের একখানা ঘরে মাত্র একজন দরোয়ান থাকে। সেইখানেই গিয়ে উঠবো।

ক্লাসের ছুটির পর ওপরের ঘরে গিয়ে দেখি, নজরুল তার জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করে বসে আছে।

যা ভয় করেছিলাম তাই হয়েছে। নজরুল নিশ্চয়ই ঘুমোয়নি, জেগে জেগে দেখেছে—আমি তার এঁটো থালা বাটি তুলে নিয়ে গেছি। ভালই হয়েছে। বললাম, দাঁড়াও, আমার বিছানাটা বেঁধে নিই। দু'জনে বাদুড়বাগানের বাড়িতে গিয়ে উঠবো।

নজরুল বললে, না। দু'জনের একসঙ্গে যাওয়া উচিত হবে না। তুমি পরে একদিন যেয়ো। আমি আজ কলেজ স্ট্রীটে যাই।

৩২, কলেজ স্ট্রীটে মুজাফ্ফর আহ্‌মদ-সাহেব মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন নজরুলকে। তিনি যেন তারই প্রতীক্ষায় বসেছিলেন।

জীবনে এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটে, কেন ঘটলো ভাবতে গেলেই অবাক হয়ে যেতে হয়।

নজরুলকে কলেজ স্ট্রীটে রেখে বাগবাজারে ফিরে আসছি। ট্রাম ধরতে হলে রাস্তাটা পেরিয়ে মেডিকেল কলেজের ফুটে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। কেন জানি না, রাস্তাটা আর পেরোলাম না। গোলদীঘির ফুটপাথ ধরেই এগিয়ে আসছি। কলেজ স্ট্রীট মার্কেট তখনও হয়নি। হ্যারিসন রোডটা সবে পেরিয়েছি, হঠাৎ আমার পিঠের ওপর কে যেন একটা কিল মারলে। থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকিয়েই দেখি—যতীন। হাসতে হাসতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, বেশ ছেলে বাবা! কোথায় ছিলি এতদিন?

বললাম, যেখানেই থাকি, তুই কি করছিস, কোথায় আছিস তাই বল।

যতীন বললে, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে আপাততঃ শ্রীরামপুর কলেজে পড়ছি। আর তুই?

বললাম, আমি পড়ছি না।

কথাটা সে বিশ্বাস করলে না।

জিজ্ঞাসা করলাম, দিদি কেমন আছে?

যতীন বললে, বলবো না। দিদি তোর ওপর খুব রাগ করেছে।

বললাম, আমি যে সারা পৃথিবীটার ওপর রাগ করে বসে আছি, সে খবর রাখিস?

আমি কোনও কথা বললেই যতীন হাসে, এইটেই তার চিরকালের স্বভাব। এমনি-সব হাসি-রহস্যের কথা কইতে কইতে যতীনকে টেনে নিয়ে এলাম আমার বাগবাজারের হোস্টেলে।

যতীন সবই দেখলে, সবই শুনলে। তারপর হঠাৎ একসময় উঠে দাঁড়ালো। বললে, চলি। আমাকে অনেকদূর যেতে হবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, আজ রাত্রেই কি তুই শ্রীরামপুর চলে যাবি?

যতীন বললে, না। কাল যাব।

—আবার কবে দেখা হবে তোর সঙ্গে?

যতীন হাসতে হাসতে বললে, জীবনে আর কোনোদিন দেখা হয়ত নাও হতে পারে।

এই বলে সে আর মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা করলে না। সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে চলে গেল।

তার ব্যবহারে আমি বিন্দুমাত্র বিস্মিত হলাম না। কারণ আমি জানি—যতীন এমনিই।

সে যে আবার আসবে তাও আমি জানি।

কিন্তু সে যে এমনি করে আসবে—সেই কথাটাই শুধু ভাবতে পারিনি।

সাতদিন কি তার চেয়ে কিছু বেশিই হবে, যতীনের দেখা না পেয়ে শ্রীরামপুর কলেজ-হোস্টেলে একখানা চিঠি লিখব কিনা ভাবছিলাম।

সেদিন দুপুরের ক্লাসে তখন সবেমাত্র গিয়ে বসেছি, দেখি সুমুখের বড় জানলাটার কাছে যতীন দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে হাসছে। কাছে যেতেই বললে, এখানে ছাত্র কোথায় ভর্তি করে?

—কেন?

—নতুন একটি ছাত্র ভর্তি হবে।

—কোথায় সে?

—আছে এইখানে।

যতীনকে নিয়ে গেলাম আপিস-ঘরে। কত মাইনে, ক'বছরের কোর্স, ভর্তি হতে কত লাগবে—এই সব কথা জিজ্ঞাসা করে সে ভর্তি হবার একটা ফর্ম চেয়ে নিলে। তারপর নিজেই চর চর করে লিখতে বসলো। লিখে, টাকা জমা দিয়ে, রসিদ নিয়ে আপিস-ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি হলো শুনি?

যতীন হেসে বললে, হবে আবার কি? ভর্তি হলাম।

বললাম, তোর শ্রীরামপুরের কলেজ?

যতীন বললে, ছেড়ে দিলাম।

—অন্যায় করলি। এখানকার কোনও কলেজে ভর্তি হলেই পারতিস। তোর বাবা ভাববেন হয়ত আমার জন্যেই তুই কলেজ ছাড়লি।

যতীন বললে, না, কেউ কিছু ভাববে না। বাবা মারা গেছে।

শুনে কিছুক্ষণ কোনও কথাই বলতে পারলাম না।

জিজ্ঞাসা করলাম, কলকাতায় কোথায় থাকবি ঠিক করেছিস?

—যেখানেই থাকি, তোদের এই হোস্টেলে থাকবো না।

বললাম, এখানে তোকে রাখবেই না। তুই খৃস্টান।

যতীন বললে, যদি না জানাই, সে-কথা জানবে কে? আমার গায়ে তো লেখা নেই! আমার উপাধি তো ঘোষ।

এই বলে সে হাসতে হাসতে বললে, তোদের সবাইকার জাত আমি মেরে দিতে পারি। তা জানিস?

বললাম, সে সুযোগ তুই পাবি না। টাকা এলেই আমি এ হোস্টেল ছেড়ে চলে যাব বাদুড়বাগান রো'তে।

যতীন বললে, ভালই হবে। একসঙ্গে আসব যাব।

এই বলে আমাকে সেদিন আর ক্লাস করতে দিলে না। বললে, চল আমার থাকবার জায়গাটা তোকে দেখিয়ে দিয়ে নজরুলের কাছে যাব।

যতীনের থাকবার জায়গাটা দেখতে গেলাম।

বড় রাস্তার ওপর ছোট্ট একখানি দোতলা বাড়ি।

জিজ্ঞাসা করলাম, কার বাড়ি রে? কে থাকে এখানে?

—আমার একজন আপনার লোক। বলেই যতীন আমাকে টানতে টানতে দোতলায় নিয়ে গেল। বললে, চা খাবার সময় হয়েছে। চা খেতে হবে তো!

সোফা-সেট্ দিয়ে সাজানো চমৎকার একটি ঢাকা বারান্দা। সেইখানেই বসতে যাচ্ছিলাম। যতীন আমাকে বসতে দিলে না। টেনে একেবারে একটা ঘরের ভেতর নিয়ে গেল।

একটা ইজিচেয়ারের ওপর পেছন ফিরে বসে কে একটি মেয়ে যেন কি-একটা বই পড়ছিল। যতীন বললে, ছাখো কাকে ধরে এনেছি।

চট্ করে মেয়েটি উঠে বসলো। মুখ ফেরাতেই দেখি—যতীনের দিদি। প্রসাদপুরের সেই দিদি।

ভাবতেও পারিনি—এতদিন পরে, এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দিদির দেখা পাব।

হাসতে হাসতে দিদি উঠে এলো। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি! সেই অপরূপসুন্দর লীলায়িত ভঙ্গী!

দিদি আমার হাতে ধরে নিয়ে গিয়ে বসালে খাটের ওপর। নিজেও বসলো আমার পাশে। আমার একখানা হাত চেপে ধরে আমার মুখের দিকে তাকিয়েই রইলো।

মুখ তুলে আমি চাইতে পর্যন্ত পারছি না!

দিদি বললে, তোর এমন সুন্দর চুলগুলো গেল কোথায়?

বললাম, যে ম্যালেরিয়া ধরেছিল!

—শুনেছি যতীনের কাছে। কই দেখি!

বলেই দিদি আমার চোখের নীচেটা টেনে দেখলে, তারপর হাতের আঙুলের ডগাগুলো টিপে টিপে দেখতে লাগলো।

যতীন তখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

দিদি বললে, তুই যুদ্ধে চলে গেছিস শুনে কি কান্নাই না কেঁদেছিলুম!—তারপর যতীন বললে তুই ফিরে এসেছিস।

বললাম, তুমি তখন কোথায়? প্রসাদপুরে?

—সেখানকার পাট অনেকদিন চুকিয়ে দিয়েছি।

দিদি নামলো খাট থেকে। বললে, মেয়েটা বাঁচলো, না মরলো একটা খবরও নিলি না তো!

চুপ করে বসে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না।

দেয়ালে-টাঙানো বড় আরশিটার সুমুখে দাঁড়িয়ে দিদি তার মাথার চুলটা ঠিক করে নিয়ে বললে, তোরা সত্যিই ভারি নিষ্ঠুর!

প্রসঙ্গটা সেদিন চাপা দিতে চেয়েছিলাম।

বলেছিলাম, যতীনকে কলেজ ছেড়ে শর্টহ্যাণ্ড শিখতে কে বললে?

—কলেজে পড়ে বলেছে বুঝি?

দিদি একটু হেসে বলেছিল, তোর সঙ্গে রসিকতা করেছে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে থেকে খালি টোঁ টোঁ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারছে না। বাবা মারা যাবার পর ওর ধারণা হয়েছে ওর পড়ার খরচ আমি বুঝি চালাতে পারব না।

বলেছিলাম, সত্যিই তো, তুমি চালাবে কেমন করে?

দিদি শুধু ম্লান একটুখানি হেসে কি যেন বলতে চেয়েছিল, কিন্তু বলতে পারেনি।

যতীন এসে ঘরে ঢুকেছিল চাকরকে সঙ্গে নিয়ে। চাকরের হাতে ছিল ট্রের ওপর চায়ের সরঞ্জাম, টোস্ট, মাখন, আর বিলিতী বিস্কুটের টিন।

সেই সব খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম নজরুলের কাছে যাব বলে। রাস্তায় যতীন বলেছিল—দিদি ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করেছে, এবার প্র্যাক্‌টিস করবে।

সেদিন তার কোনও কথাই আমি বিশ্বাস করিনি।

তারপর একদিন নিজের চোখেই দেখেছি লেডি-ডাক্তার অরুণা

ঘোষের প্রসার প্রতিপত্তি। দেখেছি তার দেহ মনের অতুল ঐশ্বর্য, দেখেছি তার সেবাব্রতে নিষ্ঠা। দেখেছি, পরমাসুন্দরী এই রহস্যময়ী নারীর একটুখানি হাসির দাক্ষিণ্য, তার হাতের স্পর্শের প্রসাদ পেয়ে ধন্য হয়ে যাবার মত, কৃতার্থ হয়ে অবলুণ্ঠিত হবার মত পুরুষের হীনমন্যতা। আর সেই সঙ্গে দেখেছি জীবন-সত্যের মর্যাদা রক্ষার জন্য অপরূপ রূপ-লাবণ্যবতী ক্ষীণতনু-সেই উদ্দাম-যৌবনার আত্মনির্যাতনের অত্যাশ্চর্য মহিমা।

অতৃপ্ত ছিল লেডি-ডাক্তার অরুণা ঘোষের অন্তরাত্মা। পৃথিবী তাকে সবই দিয়েছিল, দেয়নি শুধু সেই অমৃতের প্রসাদ—যা পেলে ভাগ্যবিড়ম্বিতা একটি মেয়ের জীবনে আসে পরমা শান্তি।

সে সংবাদ পেয়েছিল মাত্র দু'জন আগন্তুক। একজন বিপত্নীক ডাক্তার রুদ্র। পার্থিব ঐশ্বর্য ছিল তার প্রচুর। আর-একজন নিঃস্ব নিঃসম্বল প্রিয়দর্শন ক্রিশ্চান যুবক, অবনী সান্যাল। ডাক্তারী ডিপ্লোমা ছিল তার। বিলেতের ডিপ্লোমা। কিন্তু প্র্যাক্টিস করতো না। বেকার। অরুণা ঘোষের সযত্ন-লালিত সেই হৃদয়-তৃষ্ণাকে অভিনন্দিত করবার জন্য দু'জনে হাত বাড়িয়েছিল একই সঙ্গে। ঋতুচক্রের আবর্তনে মাত্র দুটি ঋতু পার হয়েছিল তাদের জীবনে। কতটুকুই-বা সময়। তবু এই অত্যল্প সময়—যে-ইতিকথা রচনা করেছিল অরুণা ঘোষের রক্তে-মাংসে, সে এক অনন্যসাধারণ প্রেমের কাহিনী।

সুযোগ পেলে শোনাব সে-কথা।